সপ্তম গোস্বামী

শক্তিপদ রাজগুরু

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৩৬৬

প্রচ্ছদপট
ইন্দ্রনীল ঘোষ

শব্দগ্রন্থন :
পি. বি. প্রিন্টার্স, ৭২/১ শিশির ভাদুড়ি সরণী, কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩, শিশির ভাদুড়ী সরণী,
কলিকাতা - ৭০০ ০০৬ হইতে প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

ব্রহ্মচারিণী বেলা মা
পরমশ্রদ্ধাস্পদাসু

বাংলার এক শস্যশ্যামল বনসমাকীর্ণ সবুজ পরিবেশের মধ্যে উলাগ্রাম, বর্ধিষ্ণু জনবসত। এখানের মাটিতে ওঠে প্রাণের সাড়া—জীবনের সুর। শান্ত ছায়াঘন নদীতীর, অদূরেই চূর্ণী নদী বয়ে গেছে। কাজলকালো গভীর জলধারা বয়ে চলে ওর বুক দিয়ে, নৌকায় মালপত্র নিয়ে ভাটিয়ালী সুরে গান গেয়ে যায় মাঝি, নদীর বুকে সূর্যের আলো দিনান্তের আবীর রংয়ের আভাস আনে।

ঘরে ফেরে পথচলতি মানুষ, আকাশ ভরে ওঠে পাখীর কলকাকলিতে। দিন ফুরিয়ে আসে রাত্রির তমসাঘনার, মাঠ প্রান্তর ছেয়ে সন্ধ্যা নামে। সেগুনবনে বনস্পতির মাথায় বাসায় ফেরা পাখীদের কলরব শান্ত হয়ে আসে।

তখন গঞ্জের বাজারে রেড়ির তেলের বাতি জ্বলে, পথে-ঘাটে-চত্বরে তখনও লোকজনের আনাগোনা—দোকানেও খদ্দেরদের ভিড় রয়েছে।

গ্রামের বাইরে গোলকদাসের আশ্রম। তার আশ্রমের চারিপাশে গাছগাছালির ভিড়, উঠানে কিছু গাঁদা রজনীগন্ধা জবার গাছ। খড়ের চালের ঠাকুরঘর।

গোলকবিহারী দলবল নিয়ে খোল-কর্তাল না হয় গুপীযন্ত্র বাজিয়ে দেহতত্ত্বের গান গাইছে, সঙ্গে বেশ কয়েকজন সাধনসঙ্গী।

ওদের অনেকেই তরুণী, দেহে অগাধ যৌবনের জোয়ার। তিলকও রয়েছে অনেকের, কারও গেরুয়া—কেউ সাদা থান পরা। এদের কুলশীলের ঠিকানা নেই।

বাবাজীদের সঙ্গিনী এরা। বলে—সাধনসঙ্গিনী। অবশ্য সাধনার কোন্ মার্গে সিদ্ধিলাভ করেছে এরা তা জানা যায়নি। ঘরসংসারের বাঁধন এদের নেই।

মনের মানুষই তাদের উপাস্য, সেই মনের মানুষের সন্ধানে এরা বহু মানুষেরই ভোগ্যপণ্য করে তুলেছে নিজেদের।

সহজ সাধনার পথে গিয়ে জীবনকে জটিলতার আবর্তে হারিয়ে ফেলেছে। তবু ওরা গায়—

সহজ জানিতে সাধ জাগে চিতে
সহজ বিষম বড়।
আপনা বুঝিয়া সুজন দেখিয়া
পীরিতি করিছ দড়॥

ওই আদি ধ্বংসের বন্যাতেই তারা ঈশ্বর-চিন্তাকে প্রবাহিত করে চলেছে।

ওদিকে কোন আখড়ায় তখন বিশাল আয়োজন চলেছে ভোগরাগের। এরা নিজেদের বলে বৈষ্ণব, নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্যের নামে হুঙ্কার দেয় আর নিজেদের সেবাতেই মত্ত। দেশের লোকের কাছে এরা পরম সাধকরূপে গণ্য—তাদের ভগবানের নাম নিয়ে প্রতারণা করে নিজেদের হাতে এসেছে প্রচুর জমি—জায়গা—ধনসম্পদ।

আর জাতিচ্যুত ধর্মচ্যুত কুলত্যাগিনী বেশ কিছু মেয়েকে ভক্তিমতী করে তোলার নামে নিজেদের ভোগলালসা মেটায় আর হুঙ্কার করে—জয় নিত্যানন্দ জয় গৌরাঙ্গ!

গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন সেদিন থেকে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর আগে—নিকটবর্তী গঙ্গাতীরে নবদ্বীপের পুণ্য মৃত্তিকায়। তিনি ছিলেন প্রচ্ছন্ন অবতার।

এর আগে সত্য ত্রেতা দ্বাপর এই তিন যুগেই শ্রীকৃষ্ণ জীবউদ্ধারের জন্য, মানবকল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন আর সেদিন তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন নি, ঘোষণা করেছিলেন

তিনিই শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং, তিনি মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন স্বয়ং ভগবান রূপে, সেই ভাবেই লীলা প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু কলিযুগে তিনি এসেছিলেন ধরণীর ধূলিতে মর্ত্যের মৃত্তিকায় মানবী শরীর নিয়ে মানুষের মধ্যে। নিজেকে কখনও সেই কৃষ্ণেরই অবতাররূপে প্রতিষ্ঠিত করেন নি।

জীবকল্যাণে, কলিযুগের নিপীড়িত মানবকুলকে উদ্ধারের জন্য নামপ্রচার করে গেছেন। আচণ্ডাল মানুষকে কোলে টেনেছেন, সারা মানবজাতিব সামগ্রিক কল্যাণ করে গেছেন, রেখে গেছেন এই কলিযুগে তাপসন্তপ্ত মানুষের উদ্ধারের মূল মন্ত্র।

চৈতন্যদেব অপ্রকট হবার পরও কিছুকাল তাঁর প্রবর্তিত মত পথ এবং ধর্ম যথাযথ অনুসরিত হয়েছিল, ষড় গোস্বামী—অন্য ভক্তসমাজও তাঁদের লেখায় / বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁর শ্রীচৈতন্যভাগবত, রূপ সনাতন গোস্বামীদের বিবিধ ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে সেদিন শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মমত—তার অবদানের কথা স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়েছিল। এসেছিল চৈতন্যযুগ—উত্তর চৈতন্যযুগ। সেদিনের জনমানসে এক নবচেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, সেদিনের মানবসমাজ পেয়েছিল এক অমূল্য সম্পদ যা যুগযুগান্তের দেশদেশান্তরের তাপসন্তপ্ত মানুষকে মুক্তির পথসন্ধান দিয়েছিল।

কিন্তু বিধির বিধান ছিল অন্যরূপ, এ যেন ঈশ্বরেরই নির্দেশ। মানুষ যুগ যুগ ধরে মায়ার ঘোরেই বাস করতে অভ্যস্ত, বার বার তারা ঈশ্বরের দূতকে, জীবনের অধিদেবতাকে ব্যর্থ নমস্কারে ফিরিয়ে দিয়ে নিজেরা আবার অন্ধকার ভোগের সাগরে নিমজ্জিত হয়েছে। নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে এনেছে।

তাই এবারও সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটলো। চৈতন্যদেবের অপ্রকট হবার বেশ কিছুদিন পর ভোগাসক্ত মানুষ তাঁকে ভুলে যেতে শুরু করল। প্রকৃত বৈষ্ণবতত্ত্বকে তারা শিকেয় তুলে, ত্যাগ-প্রেমের পথ ভুলে আবার ভোগ, স্বার্থপরতা আর দেহসর্বস্বতার মধ্যেই ডুবে গেল।

প্রকৃতিও সহায় হল তাদের। গঙ্গার প্রবাহে চৈতন্য-জন্মস্থান সেই পুণ্যভূমি তলিয়ে নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত হয়ে গেল। সেই সঙ্গে কালের প্রবাহে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেল অমূল্য বৈষ্ণব গ্রন্থগুলিও।

তখন ছাপাখানাও ছিল না। হাতে-লেখা পুঁথির, গ্রন্থের নকলের প্রচলন ছিল সামান্য। আগ্রহী পণ্ডিত ভক্তরা সেই সব নকল সংগ্রহ করতেন, তারপর সেই আগ্রহও কমে গেল, ফলে বৈষ্ণবধর্মের মূল তত্ত্ব অজানাই রয়ে গেল সাধারণ মানুষের কাছে, হারিয়ে গেল সেই সম্পদ।

কিন্তু সমাজের বুকে শূন্যতা কোথাও থাকে না। ভারতের মানুষের মনে ধর্ম সম্বন্ধে আগ্রহ চিরন্তন। তাই একটা স্বার্থপর শ্রেণী গড়ে উঠলো, যারা সেই বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে বিকৃত করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি আর মানুষকে ঠকিয়ে ধর্মের ভেক নিয়ে নিজের ভোগপ্রতিষ্ঠাকে কায়েম করে তুলতো। চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মকে বিকৃত করে তারা সেই বিকৃত বৈষ্ণবরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠা বিস্তার করে নিজেদের ভোগলালসা চরিতার্থ করার পথই করে নিল।

এদের থেকেই শুরু হল এক এক সম্প্রদায়। ন্যাড়ানেড়ি, কর্তাভজা ইত্যাদি নানা মতের পথের প্রবর্তন করলেন অনেকে। সমাজের বুক থেকে বৈষ্ণবধর্মের মূল সত্তাটি হারিয়ে গিয়ে বিকৃত রূপ নিয়েই সমাজের বুকে কোনমতে টিকে রইল মাত্র।

ফলে সমাজের উচ্চকোটির মানুষ বৈষ্ণবধর্ম থেকে সরে গেলেন। শুধু বৈষ্ণবধর্ম থেকেই নয়, সনাতন হিন্দুধর্ম থেকেও সরে যেতে লাগলেন।

ধর্মের বিকৃত চেহারাটা সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে বিভিন্ন রূপে প্রচলিত, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। আর উচ্চকোটির শিক্ষিত সম্প্রদায় মূল হিন্দুধর্ম থেকে সরে যেতে শুরু করলেন।

কারণ ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন তখন সুরু হয়ে গেছে, সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষরা অনেকে তখন পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মহিমায় নিজেদের গীতা-শ্রীমদ্‌ভাগবতকেও ভুলে গেলেন। এসব তাঁদের কাছে সেকেলেপনা হয়ে উঠলো।

রামমোহন রায় তখন ওইসব ধর্মগ্রন্থকে কঠিন ভাষায় সমালোচনা করছেন—শুরু হয়ে গেছে ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা, অনেক শিক্ষিত মানুষ সেই ব্রাহ্মধর্মকে অবলম্বন করেছেন, আর কিছু ধনীসমাজ ডুবেছেন ভোগের জগতে।

সমাজের দিকে দিকে সেই ছবিটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বর্ধিষ্ণু এই উলাগ্রামেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এখানে নেড়ানেড়ি কর্তাভজা সম্প্রদায়ের আখড়াও রয়েছে আর রয়েছে তান্ত্রিক ব্রহ্মচারীর আশ্রমও। সেটা গ্রামের বাইরে নদীর ধারে। ওদিকে গ্রামের শ্মশান। গঙ্গাতীর এখান থেকে দূরে—শান্তিপুরের ঘাটেও অনেকে শব নিয়ে যায় গঙ্গাতীরে সৎকারের জন্য। সেটা ব্যয়সাপেক্ষ। তাই সাধারণের শেষ সদ্‌গতি গতি করা হয় এই শ্মশানে।

তান্ত্রিকেরও ভক্ত চেলার অভাব নেই। সমাজের মধ্যে অনেকেই আছে যারা শক্তিসাধনায় বিশ্বাসী। নবদ্বীপেও তাই কালী মহাকালী সাধকের অভাব নেই। মদ মাংস পঞ্চমকারের সাধনায় তারা উল্লাস পায়।

এখানেও তার ব্যতিক্রম নেই। তান্ত্রিক সন্ধ্যার পর অমারাত্রির অন্ধকারে তন্ত্রসাধনায় বসে। সামনে মড়ার খুলি। কারণবারি পান করে হুঙ্কার ছাড়ে। ওই খুলিতে দুধ গঙ্গাজল দিলে নাকি সেই মড়ার মাথার খুলিও খল্ খল্ করে হাসে।

মুগ্ধ ভীত সাধারণ মানুষ তান্ত্রিকের তন্ত্রশক্তিতে বিশ্বাস করে। নানা রোগ জ্বরজ্বালায় তারা এখানে আসে।

সন্ধ্যা থেকেই তাদের ভিড় শুরু হয়। মড়ার মাথার নির্দেশেই তান্ত্রিক তাদের জড়িবুটি নানা ওষুধ দেয়, আর তার বিনিময়ে প্রণামীও পড়ে। হুঙ্কার দেয় তান্ত্রিক—জয় মা কালী—মহাকালী! মদ মাংস সহকারে সমারোহে পূজা হয়, বলি হয়। আর সেই মাংস তাদের ভোগে লাগে। নিজেদের ভোগের জন্যই বলির ব্যবস্থা।

গ্রামজীবনের এই জীবনযাত্রার পাশে রয়েছে আর একটি ধারা। উলাগ্রামের জমিদার ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রমুস্তাফির নাচমহলে রাতের অন্ধকার মুছে গেছে দামী বেলজিয়ান রেলোয়ারি ঝাড়ের রোশনীতে। সারেঙ্গীর সুর ওঠে—সঙ্গে ওঠে তবলার বোল, সেই তালে তালে নাচছে কোন শহরের থেকে আসা বাঈজী। কোন কোন দিন ঈশ্বর মুস্তাফির গানমহলে কোন ওস্তাদ আসেন—রাতের অন্ধকারে ওঠে দরবারী কানাড়ার সুর।

মিত্রমুস্তাফি মশায় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিশেষ সমঝদার, তাই তিনি এইসব নামীদামী সঙ্গীত-নৃত্যশিল্পীদের বিশেষ সম্মান দেন। দু'হাতে টাকা ছড়ান, ইনাম দেন তাদের।

তাঁর মোসাহেব নন্দ বোস, বিধু গোস্বামীরাও তারিফ করে—না, মুস্তাফি মশায়ের দিল আছে। রাত ভোর হয় যোগিয়ার করুণ রাগিণীতে—

পিয়া সনে মিলন কি আশ
সখি রে—

বৈভবের প্রাচুর্য নিয়ে দিন কাটে মুস্তাফি মশায়ের। সদর নায়েব হরষিত ঘোষ অবশ্য খাতায় লিখে রাখে আজকের রাতের খরচের অঙ্কটা। তার সঙ্গে নিজের পকেটস্থ করা টাকাটাও যোগ দিয়ে দেয়। অঙ্কটা বেশ মোটা রকমেরই। তা হোক, মুস্তাফি মশাই এসব ছোট ব্যাপারে নাক

গলান না।

হিসাবপত্র অবশ্য দেখার চেষ্টা করেন মুস্তাফি মশায়ের বড় ছেলে, এ বাড়ির ছোটবাবু। তাঁর বাবার হিসাবের খাতায় তিনি বিশেষ মন্তব্য করেন না। হরষিত ঘোষ তাই নীরবে এই বাড়ির সেবা করে চলে এইভাবে।

তার বড় সাধ চিরকাল নায়েবীই করবে না সে, জমিদারী চালিয়েই যাবে না, নিজেও এককালে জমিদার হবে। তবে সবুরে মেওয়া ফলে, তাই হরষিত ঘোষ ধীরেসুস্থেই পা ফেলে চলেছে সাবধানী ভঙ্গীতে।

রাত নামে। সারা গ্রাম নিশুতি।

জমিদারবাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই সাজানো বাগান, একদিকে আম, লিচু, কাঁঠাল এসবের গাছ। সেখানে অন্ধকার জমাট বাঁধে—জোনাকি জ্বলে। সামনের দিকে ফুলের কেয়ারি করা বাগান, রাতের হিমেল বাতাস ফুলের গন্ধে আমন্থর হয়ে ওঠে।

অন্ধকারে দেউড়িতে রয়েছে ন্যাপা সর্দার, তার দলবল। সজাগ অতন্দ্র প্রহরী সে এ বাড়ির। সারা প্রাসাদের চারিদিকে তার সাবধানী নজর।

ডাকাতদলের অভাব এদিকে নেই। নদীপথে—না হয় রণপায়ে চড়ে আসে ডাকাতদল। মশাল জ্বেলে রামদা তালোয়ার সড়কি নিয়ে হানা দেয় তারা ধনীর প্রাসাদে, গৃহস্থের ঘরে। সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়।

তাই এই সাবধানতা। ন্যাপা সর্দার তাই দলবল নিয়ে পাহারা দেয়।

ওদিকে ঘোড়াশালে ঘোড়া, জুড়িগাড়ির ঘোড়া ছাড়াও রয়েছে ছোট কুমারের সখের ঘোড়া। আর ওদিকে রাতের অন্ধকারে হাতিশালায় দেখা যায় মুস্তাফি মশায়ের প্রিয় হাতি শিবচন্দ্র তখনও শুঁড় নাড়াচ্ছে।

ভোর হয়।

ঘুমন্ত গ্রামের বুক থেকে কুয়াশার আবরণ মুছে মুছে যাচ্ছে। শোনা যায় একক কণ্ঠের নামগান। খঞ্জনী বাজিয়ে প্রভাতী সুরে গান গেয়ে চলেছে সুপ্তপ্রায় গ্রামের পথে জগন্নাথ দাস, শীতের জন্য মাথায় একটা ফেট্টি জড়ানো, গায়ে চাদর। এই গ্রামের বুকে শোনায় জাগরণী গান—

কহ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে,
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥

একক নিঃসঙ্গ ওই সুর গ্রামের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

জগন্নাথ মুস্তাফি মশাইয়ের কাছারিতে খাতা মুহুরীর কাজ করে। এই গ্রামেরই একটা খড়ের ঘরে তার আস্তানা, নিজের হাতে সামনের জায়গায় কিছু ফুল-আনাজপত্রের চাষ করে। কাছারিতে এক কোণে বসে জাবেদা খাতায় জমাখরচের হিসাব, রোকড় পড়চা সেরেস্তার বয়ানের নকল রাখে। আর সকালসন্ধা নামগান করে। নিরামিষ আহার করে। পরনে অতি সাধারণ পোশাক। আর একপাকে যা হয় ফুটিয়ে নেয়। নিজের খরচ সামান্যই—যা বাঁচে সে গৌরাঙ্গের ভোগে নিবেদন করে তা গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দেয়।

সেরেস্তার অন্য কর্মচারীরা প্রজাদের কাছ থেকে নগদ অর্থ ধান-চাল-ঘি নানা কিছু মোচড় দিয়ে আদায় করে আড়ালে। কিন্তু জগন্নাথ ওসবে নেই। তাই সেরেস্তার অন্য কর্মচারীরা ওকে বলে জগা পাগলা।

হাসে জগন্নাথ—পাগলা হওয়া কি মুখের কথা গো? তা আর হতে পারলাম কই

সেরেস্তাদারবাবু?

সেরেস্তাদারবাবু ততক্ষণে কোন প্রজার খাজনার রসিদ দেবার জন্য নগদ আটগণ্ডা পয়সা চাদরের নীচে ফতুয়ার পকেটে পুরতে পুরতে বলে, এবার হবি। ব্যাটা গৌরের নাম নিয়ে একটা ডবকা সেবাদাসী খুঁজে নে, মালাচন্দন করে আখড়া কর, অনেক কামাই হবে।

হাসে জগন্নাথ—জয় গৌর, জয় নিতাই। ওসব কথা বলেন না গো। গৌরাঙ্গদেব তো স্বয়ং ভগবান গো।

—থাম তো! ব্যাটা পণ্ডিত এলো। আমাকে ধর্ম শেখাস না! ওসব আউলবাউল কর্তাভজা নেড়ানেড়ি—তোর তন্ত্রমন্ত্র সব গুলে খেয়েছি, বুঝলি? ভোগ করে যা। প্রাণপাখী কবে আছে কবে নেই! জয় কালী!

পরক্ষণেই কোন প্রজাকে দেখে বলে, এবার বাকী করের নালিশ করছি তোর নামে—তিন সন খাজনা বাকী।

লোকটা কোঁচড় থেকে একটা নগদ টাকা বের করে সেরেস্তাদারবাবুর পায়ের কাছে রেখে প্রণাম করতে সেরেস্তাদারবাবু টাকাটা খপ্ করে তুলে ফতুয়ার পকেটে চালান করে বলে—বোস। দেখি নালিশ ঠেকানো যায় কিনা।

জগন্নাথ দেখে মাত্র। ওই বাবুদের চেনে সে। ওরা শোষণই করে মাত্র এই ভাবে।

মিত্রমুস্তাফি মশায়ের ছেলে তখন সকালের মিষ্টি রোদে ঘোড়সওয়ার হয়ে মাঠপ্রান্তর দাবড়ে ছুটছেন। দুলকি, কদম সব চালেই ঘোড়াটা নিপুণ। ছোটবাবু ঘোড়াটাকে সখ করে প্রচুর টাকা দিয়ে কিনেছেন। রোজ সকালে বিকেলে ওকে নিয়ে বের হন।

গ্রামের মধ্যে মিত্রমুস্তাফি মশায়কে সকলেই সমীহ করে। এমনিতে রাশভারী মানুষ। সকালেই কাছারিতে বসেন। তখন আসে বহু মানুষ নানা প্রার্থনা নিয়ে। কারও কন্যাদায়, কারও খাজনা মাপ করতে হবে, কোন গরীব ছাত্র এসেছে সাহায্যের আশায়।

মুস্তাফি মশায় তাদের ফেরান না। সাধ্যমত দান করেন—নায়েবমশাই, একে পাঁচশো টাকা দেন। কাউকে দুশো।

নায়েব হরষিত ঘোষ দু-তিন জন সাহায্যকারীর জায়গায় আরও দু'একজনের নাম লিখে সেই টাকাটা নিজের পকেটে পোরে।

তারপর বলে নায়েব—কর্তাবাবু, চিকিৎসালয়ের প্রধান বৈদ্য বলছিলেন কিছু স্বর্ণরৌপ্য সর্পবিষ এসব ওষুধ তৈরীর জন্য কিনতে হবে। জড়িবুটিও লাগবে—আর শিক্ষার্থীদের থাকা-খাওয়ার খরচা—

তখনও অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার এত বিস্তৃত প্রসার ঘটে নি, তাই পল্লীঅঞ্চলে আয়ুর্বেদ চিকিৎসারই প্রচলন ছিল বেশী।

মিত্রমুস্তাফি মশায়ের দানে সেদিন উলাগ্রামে আয়ুর্বেদ চিকিৎসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। বেশ কিছু প্রবীণ কবিরাজও রেখেছিলেন তিনি। তাঁরা স্বর্ণভস্ম, রৌপ্যভস্ম মকরধ্বজ—নানা কিছু পাচন, অরিষ্ট বটিকা তৈরী করেন।

ছাত্রও রয়েছে বেশ কিছু। জমিদারের খরচায় তারা এখানে থেকে খেয়ে কবিরাজী চিকিৎসা শেখে, ওষুধ তৈরী করে।

সাধারণ মানুষদেরও এই বৈদ্যশালায় চিকিৎসা করা হয়। গ্রামের মানুষদের জন্য মিত্রমুস্তাফি মশায় সদাব্রত, দাতব্য চিকিৎসালয়, অতিথিশালা এসবও করেছেন।

সেদিন কাছারিবাড়িতে খাসকামরায় বসে রোকড়পত্র দেখছেন মিত্রমুস্তাফি মশায়। নায়েব

হরষিত ঘোষ হুজুরকে বিভিন্ন মহালের জমাবন্দী হিসাব দেখাচ্ছেন।

মুস্তাফিমশায় বলেন—নায়েবমশাই, এসব মহলে আদায়পত্র তেমন হচ্ছে না কেন?

নায়েবমশাই অবশ্য আদায়পত্রের পুরো হিসাব ঠিকমত রাখে না, আগেই তার থেকে বেশ কিছু সরিয়ে তারপর বাকিটা দেখায়। বলে সে—আজ্ঞে অজন্মা গেছে পরপর দু'সাল।

মুস্তাফিমশায় বলেন—তাহলে আর খাজনা দেবে কি করে? দ্যাখো তবু যাদের আছে তারা যেন দেয়।

এমন সময় অন্দর থেকে এ বাড়ির কাজের মেয়ে শিবু এসে জানায়—বাবু, গিন্নীমা আপনাকে খবর দিতে বললেন—জগৎ-এর শরীর ভালো নাই, বেদনা জানিয়েছে।

জগৎমোহিনী মুস্তাফি মশায়ের মেয়ে, ওই এক ছেলে আর মেয়ে নিয়েই তাঁর সংসার। জগৎমোহিনীর বিয়ে দেন তিনি ঘটাপটা করে কলকাতার হাটখোলার বিখ্যাত দত্ত পরিবারের অন্যতম শরিক রাজবল্লভ দত্তমশায়ের ছেলে আনন্দমোহন দত্তের সঙ্গে।

হাটখোলার দত্ত পরিবার কলকাতায় খুবই সুপরিচিত, বনেদী পরিবার। এদের অন্যতম শাখাই আন্দুল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শিক্ষা-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এদের অবদানও কম নয়।

সেই বংশের সন্তান রাজবল্লভ দত্ত, তখন ওঁদের জমিদারীর আয়পয় ভালোই ছিল। রাজবল্লভ দত্ত খুবই সৌখীন প্রকৃতির মানুষ, দুহাতে পয়সা ওড়ান। তাঁর ছেলে আনন্দমোহন। দেখতে খুবই সুপুরুষ, কলকাতার সমাজে তিনিও পরিচিত, তাই মুস্তাফি মশায়ও মেয়ের জন্য তাঁকেই পছন্দ করেন।

এর মধ্যে আনন্দের দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, এবার জগৎমোহিনী তৃতীয়বার সন্তানসম্ভবা।

এদিকে রাজবল্লভ দত্তও তাঁর ওই দুহাতে খরচা করার জন্যই বেশ দেনদার হয়ে পড়ে কিছু মহাল বিক্রী করতে বাধ্য হন। আনন্দমোহন তাঁর প্রথম পক্ষের সন্তান, প্রথমা স্ত্রীবিয়োগ হবার পর রাজবল্লভ দত্তমশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন।

উড়িষ্যার কটক জেলায় ছোট গোবিন্দপুরে তাঁদের কিছু মহাল ছিল—ওইদিকেই তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রীরও কিছু মহাল তিনি পান।

কলকাতা ছেড়ে রাজবল্লভ দত্ত তাই উড়িষ্যার দূর গ্রাম ওই ছোট গোবিন্দপুরেই রয়েছেন। বর্তমানে তিনি অন্য মানুষ। ভোগবিলাসে এতদিন ডুবে থাকার পর এবার তিনি গৃহী হয়েও সর্বত্যাগীর মতই থাকেন—ধর্মকর্ম, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, জ্যোতিষচর্চা এই সব নিয়েই আছেন।

গ্রামেই তাঁর মহালে তিনি বেশ কিছু জমি দেবোত্তর করে একটা মন্দির অতিথিশালাও করেছেন আর জপধ্যান নিয়েই থাকেন।

ছেলে আনন্দমোহনই এখানে থেকে জমিদারীর কাজ দেখাশোনা করে। কিন্তু তেমন বড় জমিদারী এ নয়, আদায়পত্রও ঠিকমত হয় না। হাজাশুখার উৎপাতও আছে।

আনন্দমোহনও বুঝেছে এখানে পড়ে থাকলে তার চলবে না। নিজের রোজগারের পথ দেখতে হবে।

এককালে তাদের অনেকই ছিল। এখন আনন্দমোহনও চিন্তায় পড়েছে, স্ত্রীপুত্রদের রেখে এসেছে উলায় তার শ্বশুরবাড়িতে।

মুস্তাফিমশায়ের নামডাক ঠাটবাট রয়েছে। সেখানে ওরা পরম সমাদরেই আছে। তবু মনে চিন্তার ছায়া নামে আনন্দমোহনের, দূর প্রবাসে থেকে স্ত্রীপুত্রদের কথা মনে পড়ে।

অবশ্য জগৎমোহিনী বাবামায়ের আদরের মেয়ে, তার সমাদরের কোন ত্রুটিই হয় না। তার দাদা এবাড়ির ছোটবাবুও বোন-ভাগ্নেদের খুবই স্নেহ করে।

॥ ২ ॥

১৮৩৮ সাল ২রা সেপ্টেম্বর শনিবার কোন শুভলগ্নের সমাহার ছিল কিনা কেউ খবর রাখেনি, ওই দিন জগৎমোহিনীর তৃতীয় পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হল।

সেদিন মিত্রমুস্তাফির প্রাসাদে শাঁখ বেজেছিল—এই বড় বাড়ির পুরনারীর দল শঙ্খধ্বনির মধ্য দিয়ে নবজাতককে বরণ করেছিল। উত্তরকালে এই নবজাতক সারা বাংলা—পরবর্তীকালে পৃথিবীর বহুস্থানে একটি বরণীয় স্মরণীয় নামে পরিণত হয়েছিলেন।

সেদিন উলাগ্রামের কেউ, স্বয়ং মিত্রমুস্তাফি মশায়ও ভাবতে পারেন নি যে তাঁর বংশে এমনি এক কালজয়ী মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটলো, যিনি স্বয়ং চৈতন্যদেবের কৃপায় বরণীয় হয়ে ওঠেন তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। সে এক মহাজীবনের অমর কাব্যকথা, ভক্তিরসে আপ্লুত এক জীবনবেদ। কিন্তু এই রহস্য সেদিন কারও গোচরে ছিল না।

এ বাড়িতে ওই নবাগত অতিথিকে সহজভাবেই মেনে নিল সকলে। আর দুই ভাইয়ের সঙ্গে বড় হতে থাকে সেই শিশু।

দিদিমা শিবের ভক্ত। সেই মহাদেবের নাম নিয়েই শিশুর নাম করেন কেদারনাথ।

এই বড় বাড়িতে মুস্তাফি মশায়ের দারোয়ান পাইক বরকন্দাজ মশালচী সহিস মাহুত সেরেস্তার গোমস্তা খাতানবীশ সরকার এরা ছাড়াও অন্দরের বহু আশ্রিত অসহায় স্ত্রীলোকও থাকতো।

এ ছাড়াও ছিল বেশ কিছু কাজের লোক। রাঁধুনী খাস ঝি ইত্যাদি। তাদের মধ্যে শিবুই ছিল বেশী কাজের।

এই গ্রামের একদিকে তার বাড়ি—নিজের ছেলেমেয়েও আছে। কিন্তু শিবু এই বাড়ির ছেলেদেরও নিজের ছেলের মতই দেখে।

জগৎমোহিনী বড়ঘরের মেয়ে, ছেলেপুলের এত ধকল সইবার সাধ্য তার নেই। তাই শিবুই সেই ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। সে-ই ছেলেদের নাওয়া-খাওয়ার ব্যবস্থা করে আর শিশু কেদারকে নিয়ে ট্যাঁকে করে ঘোরে।

কেদারও শিবুকে ছাড়বে না। তার হেপাজতেই মানুষ হয়। শিবুও বাড়িঘর, নিজের ছেলেদের ভুলে এই ভুবনমোহন শিশুর প্রতি স্নেহে নিজেকে ভরিয়ে রাখে। সব আবদার তার কাছেই। জগৎমোহিনী বলে—পারিসও তুই শিবুদি!

শিবু হাসে। বলে সেই সাধারণ মেয়েটি—দিদি, এ ছেলে তোমার দিকপাল হবে গো। কি মায়ায় জগৎকে বশ করবে আমার কেদার।

কেদার তখন দু'বছরের। আধো আধো বোল ফুটেছে। শিবু ওকে ছড়া বলে, গান গেয়ে ঘুম পাড়ায়। সেই কথা সুরের যাদু ওই শিশুর মনেও যেন এক বিচিত্র সুর আনে।

শিশু আনমনে কথার পর কথা বলে। সেদিন দাওয়ায় বসে শিশু কেদার তেমনি ছড়া কাটে আপনমনে একটা কাককে দেখে।

কাক কালো ঝিঙে ফুল।
নড়ে বসো—বাবা আসবে।

শিবু খুশীতে ভরে ওঠে। বলে সে জগৎমোহিনীকে—দেখো দিদি, খোকনের কথা সত্যি হবেই। অনেকদিন জামাইবাবু আসেন নি, এবার ঠিকই আসবেন।

জগৎমোহিনী বাপের বাড়িতে থাকলেও স্বামীর কথা প্রায়ই ভাবে। প্রবাসে রয়েছেন স্বামী। তাই শিবুর কথায় মনে মনে খুশী হলেও বলে—তুই কি করে জানলি শিবুদি?

শিবু খোকনকে কোলে তুলে নিয়ে বলে—শিশু নারায়ণ গো। ঠাকুর তাদের মুখ দিয়েই সত্যি খবর দেন। তোমার ছেলের কথা মিছে হবে না দেখো।

আরও আশ্চর্য হয় সকলে, ক'দিন পরই উড়িষ্যা থেকে আনন্দমোহন চলে আসেন এইখানে। খুশী হয় জগৎমোহিনী—তার মা'ও। মেয়েকে খুশী দেখে সেও খুশী হয়। শিশু কেদারও বাবাকে পেয়ে ছোট্ট দু'হাত বাড়িয়ে আঁকড়ে ধরে। আপনজনকে ফিরে পেয়েছে সে।

আনন্দমোহন ভাগ্যঅন্বেষণেই এসেছেন উড়িষ্যা থেকে এখানে। বাবার জমিদারীর সামান্য আয়ে তার সংসার চলবে না। সৎমায়ের সঙ্গে থাকতেও তার ইচ্ছা তেমন নেই।

তাই নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্যই এখানে এসেছেন তিনি। জগৎমোহিনীও স্বামীর মনের অবস্থা বোঝে। এমনিতে বুদ্ধিমতী ধীরস্থির সে। স্বামীকে বলে—এত ভাবছ কেন? দেখবে ঠিক একটা ব্যবস্থা হবেই। এত তাড়াতাড়ি কিছু না করে ভেবেচিন্তে যা হয় করা যাবে। কিছুদিন থাকো এখানে, তারপর দেখবে পথ একটা হবেই।

তখন গ্রামজীবনে অভাবের ছায়াটা নগ্ন হয়ে ওঠে নি। উলাগ্রামেও সাধারণ মানুষের চাহিদা কম ছিল, অল্পেই খুশী থাকতো তারা, তাই জমির আয় থেকেই মোটা ভাতকাপড় জুটে যেত, তাতেই খুশী থাকতো তারা।

গ্রামের যাত্রার আসর বসে। লোকজন কীর্তন বাউল গানের আসরও জমে। পাড়ায় পাড়ায় তখন যাত্রার আসর, কবিগান, হাফ আখড়াই গানেরও প্রচলন ছিল।

সেই পরিবেশে মানুষের দিন কাটে কিছুটা নিশ্চিন্ততার মধ্যে। অভাব থাকলেও সেটা সহনীয় ছিল।

এমনি পরিবেশে এসে শ্বশুরবাড়ির প্রাচুর্য ঠাটবাটের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হলেন আনন্দমোহন।

নিজের শালা ছোটবাবুও আগের মতই সৌখীন, তাঁর নিজস্ব বৈঠকখানাতে আসেন গ্রামের অনেকেই। গানবাজনা হয়, তাসপাশাও চলে। আনন্দমোহনও বসেন সেখানে। গ্রামের বিশু মুখুয্যের সঙ্গে এখানেই পরিচয় হয় আনন্দমোহনের। বিশু মুখুয্যে গ্রামের জোতদারদের অন্যতম। সামান্য আয় তবু তার চালচলন বেশ জাঁকজমকপূর্ণ, কথাবার্তাও বেশ ধারালো। সহজেই মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

কলকাতা তখন স্বপ্নের নগরী, যাতায়াত করা কষ্টকর। নৌকাযোগেই যাতায়াত করতে হয়।

বিশু মুখুয্যের মুখে কলকাতার নানা গল্প। আর সবাই আগ্রহ নিয়ে শোনে। ইংরেজের কুঠিতে তার কে কাজ করে, সেখানের নানা গল্প—মায় কাশিমবাজার মুর্শিদাবাদের কুঠিয়ালদের গল্প করে সে।

আনন্দমোহন ভাবেন কিছু একটা করতেই হবে তাঁকে। তাঁর এখন দিন কাটে ওই আড্ডায়, সন্ধ্যারতির পালা শেষ হয় মন্দিরে। এবাড়ির সকলেই সন্ধ্যার সময় মন্দিরে যান।

আনন্দমোহনও মন্দিরের আরতির পর নিজের ঘরে আসেন, তাঁর তিন ছেলেকে পড়াশোনা করান। কেদার তখন কয়েক বছরের। তারপরও একটি ভাই এসেছে—হরিদাস—সেও কয়েক বছরের। আনন্দমোহন স্ত্রী ছেলেদের নিয়ে নিজের একটি ছোট্ট ঘরের স্বপ্ন দেখেন।

স্বপ্ন দেখে শিশু কেদারও। এর মধ্যে এই বড় বাড়ির সঙ্গে, এর আশপাশের জগৎ, গাছাগাছালি, পাখী—কিছু মানুষের সঙ্গেও তার পরিচয় ঘটেছে।

এ তার নিজস্ব কল্পনার জগৎ।

ফুলের রাজ্যে মৌমাছি রঙীন প্রজাপতি ডানা মেলে শূন্যে নিক্ষিপ্ত রঙীন ফুলের মত ওড়ে,

কেদার অবাক হয়ে দেখে সেই জগৎকে।

শিশু ঘোরে এই বড় বাড়ির ওদিকে, দারোয়ানদের ঘরের আশপাশে।

—আও খোকাবাবু! ডাকে দারোয়ান শীতল তেওয়ারি।

শীতল তেওয়ারি স্নান সেরে কপালে চন্দনের ফোঁটা কেটে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছিল সুর করে। সীতামায়ের বনবাসের কাহিনী, কোনদিন পড়ে হনুমানের বীরত্বের ভক্তির কথা।

কেদার এসে বসে। শীতল তার কপালে ফোঁটা পরিয়ে দেয়। কেদার বলে—হনুমানের কথা পড়ছ?

—হ্যাঁ। বহুৎ বড়ো ভক্ত হনুমানজী, সীতামা রামচন্দ্রের কথা শুনবে?

কেদার বসে পড়ে। শীতলও এমন একজন অনুগত মুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে তন্ময় হয়ে রামায়ণ পড়তে থাকে। শিশুমনে রামচন্দ্র সীতা হনুমানের বিচিত্র কাহিনী কি সাড়া আনে—আনে এক নতুন জগতের সন্ধান।

কেদার এদিকে প্রায়ই আসে।

বড়বাড়ির পিছনে বাগানের ছায়ায় দারোয়ান-পাইকদের কেউ লুকিয়ে ভাং-মদও গেলে, হৈচৈ করে, ঢোলক বাজিয়ে আদিরসের গান গায়।

কেদারের কেন জানি না ওদের আদৌ ভালো লাগে না। ওরা ডাকে—আ যাও খোকারাজা!

কেদার ওই হৈহুল্লোড় পছন্দ করে না। সে চলে আসে শীতল তেওয়ারির ওখানে, বসে পড়ে তার রামায়ণকথা শুনতে।

কোন কোন দিন ন্যাপা সর্দারের ওখানেও যায়। ন্যাপা সর্দার থাকে এদেব ঘরগুলো থেকে একটু ওদিকে।

সে এই বড় বাড়ির যত পাহারাদার আছে তাদের সর্দার। তার পদমর্যাদা কিছু বেশী। আর কেদার দেখেছে যে ন্যাপা সর্দারই তার দাদুর কাছে যাবার যোগ্যতা রাখে, দারোয়ান-পাইকদের আর কেউ দাদুর খাসকামরায় যায় না। দাদুও ন্যাপা সর্দারকে স্নেহ করেন।

ন্যাপার ইয়া লম্বাচওড়া চেহারা, গোলমত মুখ—বিশাল বিড়ালের ল্যাজের মত একজোড়া গোঁফ, তেমনি লাল চোখ আর কাঁধে পড়েছে বাবরি চুল। গলার আওয়াজও তেমনি গুরুগম্ভীর মার্কা।

ন্যাপাকে অন্য ছেলেরা এড়িয়ে যায়, বলে—ডাকাত! যাসনে ওর কাছে।

এ বাড়ির ছেলেদের সর্দার কালীপ্রসন্ন, কেদারের মেজ দাদা। বেশ কিছু জ্ঞাতিদের ছেলেদের নিয়ে তার বাহিনী। বাগানের গাছে গাছে এখান ওখানে তাদের স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তারাই এড়িয়ে যান ন্যাপা সর্দারকে। ন্যাপাও ধমক দেয় তাদের, তাড়া করে গাছ থেকে নামায়। কিন্তু কেদারের ভালো লাগে ন্যাপাকে। সে দেখেছে কাজের পর ধড়াচূড়া, পাগড়ী, আচকান চাপরাশ খুলে ন্যাপা সর্দারও শীতল তেওয়ারির মত ধুতি পরে ঠাকুরের মূর্তির সামনে চোখ বুজে হরিনাম করে।

কেদারকে দেখে বলে—এসো খোকাবাবু!

কেদার ঢোকে, দেখে ধূপ প্রদীপ জ্বেলে ন্যাপা সর্দার কৃষ্ণ পূজা করছে। হরিনাম করে। ওই নামগান শিশু কেদারের মনে কি এক সাড়া আনে।

বড় মন্দিরে বিরাট রাধাকৃষ্ণের মূর্তি দেখেছে। সেখানে আলো জ্বলে, কীর্তন হয়। লোকজন আসে। থাকে প্রসাদের প্রাচুর্য। এখানে তা নেই। তবু সেই নাম গান হয়। কেদার শুধোয়—তুমি পূজো করো বড় মন্দিরের পূজারীর মত!

হাসে ন্যাপা সর্দার—না গো, ওসব জানবো কোথা থেকে? আমি তো বামুনও নই, ভদ্দরঘরের কেউ নই। ছিলাম ডাকাত—

চমকে ওঠে কেদার। তার শিশু-মনে ডাকাতদের কাহিনীর রূপও একটা আছে, ন্যাপা সর্দারকে তারা অনেকেই ডাকাতই বলে।

সেই ন্যাপাই বলে—ডাকাতি করতাম, মানুষও খুন করেছি। আর শেষবেলায় ভুল করে নিজের গুরুকেই খুন করে ধরা দিলাম। জেল হয়ে গেল। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে দেখলাম এত বড় দুনিয়ায় আমার জন্য কোন ঠাঁই নাই। পথে পথে ঘুরি—খাবার নাই, মাথার উপর একটু আশ্রয়ও নাই। এমনি দিনে বড় হুজুর আমাকে ডেকে এখানে কাজ দিলেন। আহার আশ্রয় সবই পেয়ে আবার নতুন করে বাঁচলাম ওই ঠাকুরের দয়ায়।

শিশু কেদার তন্ময় হয়ে শুনছে ওই কাহিনী। নৃশংস খুনী ডাকাত ওই ঠাকুরের দয়াতেই আজ সম্পূর্ণ নতুন মানুষে পরিণত হয়েছে, কেদার তবু যেন এটা ভাবতে পারে না। শুধোয় সে—ঠাকুরের দয়ায় এসব হয়?

ন্যাপা বলে—হ্যাঁগো। তাঁর দয়ায় সবই হয়। তিনিই তো এই সারা জগতের মালিক। তিনিই সব, তাই তাঁর নামগান করি—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ—

শিশু কেদারের মনে হয় কৃষ্ণই বিশ্বনিয়ন্তা—তাঁর দয়াতেই সব হয়। এই জগৎসংসার মায় ন্যাপা সর্দার—সকলেই তাঁর নিয়ন্ত্রণেই চলে।

অবাক হয়ে শিশু কেদার দেখছে ওই মূর্তিটা। তার মনে কি আলোড়ন জাগে। অনেক কিছুই যেন জানছে সে।

সন্ধ্যায় বাবার কাছে কেদার শোনায় রামায়ণের কথা। শীতল তেওয়ারির কাছে শোনা সীতা-হনুমানের কথা। আনন্দবাবুও ছেলেকে শোনান রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনী। আরও দেখেন আনন্দবাবু কেদার অন্য ছেলেদের চেয়েও মেধাবী। এর মধ্যে বর্ণপরিচয়ও হয়েছে মায়ের কাছে। বাবা তাকে ইংরাজী বর্ণপরিচয় করিয়ে দেন।

কালীপ্রসন্ন—মেজছেলেরও এত বুদ্ধি নেই, গুরুদাস তো গোঁয়ার, ও মাথা গোঁজ করে বসে থাকে দু-এক চড় খেয়ে। পড়ায় মন তার তেমন নেই।

ভোরবেলাটা খুবই সুন্দর এখানে।

প্রথম আলো বাগানের গাছাগাছালিতে ঝল্‌মল্‌ করে। পাখীদের সুর ওঠে।

ভোরে সেদিন ঘুম ভেঙেছে, কেদারের কানে আসে ওই পাখীর ডাকের সঙ্গে কার মিষ্টি গলার গান। খঞ্জনী বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে কে।

কেদার ওই গান শুনে উঠে পড়ে; পায়ে পায়ে সদ্য জেগে ওঠা বাড়ির দোতলা থেকে নীচে নেমে সোজা ফটকের ধারে আসে।

কহ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে,
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে॥

ওই সুর, ওই গৌরাঙ্গের নাম যেন তার শিশুমনে কি সাড়া আনে। গৌরাঙ্গের নাম সে প্রথম শুনলে ওই গানে।

গান গেয়ে চলেছে জগন্নাথ দাস। লোকটাকে কেদার দেখেছে তাদের কাছারিতে। ওখানেই সে কাজ করে। দেখেছে কেদার তাকে, কিন্তু ভোরবেলায় এমনি গান গায় তা জানত না। ওর কাছেই গৌরাঙ্গ কে তা জানতে হবে। কেন তার নাম নেয় এটাও জানতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তখন আর যাবার উপায় নেই, বন্ধ ফটকের এপারে দাঁড়িয়ে ওই সুর শোনে কেদার।

ওদিকে সকালেই বাগানে কালীপ্রসন্ন দলবল নিয়ে কোন্ গাছে কি ফল আছে, কোথায় পাখীর

বাসা আছে, তারই সন্ধান শুরু করেছে। কেদারকেও তাদের সঙ্গে যেতে হয়। গাছের এ ডাল থেকে ও ডালে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে তারা। ফলও পাড়ে—কেদারও ভাগ পায়।

কোন লোকজন আসার আগেই তারা সরে পড়ে। সাবধান করে কালীপ্রসন্ন কেদারকে—কাউকে এসব কথা বলবি না! কাল নদীর ধারে নিয়ে যাবো তোকে, সেখানের বাগানে অনেক পেয়ারা আছে।

কেদার অবশ্য এসব কথা বলে না বাড়িতে।

সেদিন সন্ধ্যায় বাবাকে শুধোয়—গৌরাঙ্গ কে?

আনন্দমোহন ছেলের কথায় শুধোন—গৌরাঙ্গ?

—হ্যাঁ গো। ওই যে কাছারির জগাদা গান গায় গৌরাঙ্গের নামে!

এবার আনন্দবাবু ব্যাপারটা বোঝেন।

জগন্নাথকে তিনিও চেনেন। তাই বলেন—ওই জগা পাগলা? ও ওই বোষ্টমদের ঠাকুর, ওরা কেত্তনটেত্তন গায় খোলকত্তাল বাজিয়ে।

খুব একটা গুরুত্ব দেন না তিনি, কিন্তু শিশু কেদারের কৌতূহল বেড়েই যায়। সেই সুর—সেই গানে কি যেন একটা আর্ত কামনা রয়ে গেছে। রয়েছে যাদু।

আনন্দমোহন বলেন—ওসব দারোয়ান পাইক পাগলদের মধ্যে না ঘুরে কাল থেকে পাঠশালে যাবি সদরে।

জগৎমোহিনীও বলে—তাই যাক। দিনরাত এখানে ওখানে ঘুরছে, পাঠশালেই যাক দাদাদের সঙ্গে।

ছোটবাবু অর্থাৎ কেদারের মামাও কেদারের খুব কাছের মানুষ। কেদার দেখেছে দাদুকে, এই বড় বাড়ির কর্তা। সৌম্যদর্শন প্রবীণ মানুষটিকে দূর থেকেই দেখে সে।

কাছারির খাস কামরায় বসে থাকেন গদিতে তাকিয়া হেলান দিয়ে, আলবোলার নলটা ধরা—তাতে টান দেন মাঝে মাঝে, চাকর বিশাল একটা পাখা নিয়ে বাতাস করে।

লোকজন, নায়েব, গোমস্তারা সন্ত্রস্ত হয়ে আনাগোনা করে। সকালে সেরেস্তায় গিয়ে দাদুকে প্রণাম করে কেদার।

—কি রে?

দাদুর গম্ভীর মুখে হাসির রেখা ফুটে ওঠে।

কেদার বলে—পাঠশালে যাচ্ছি। তাই—

—তাই আশীর্বাদ চাই?

কেদারের পরনে ছোট ধুতি, গায়ে ফতুয়া, বগলে হলুদ ন্যাকড়ায় বাঁধা বইয়ের দপ্তর, একটা মাঠির দোয়াত হাতে। ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে শিবু—ওদের গার্জেন। শিবুই বলে—হ্যাঁগো বড় বাবা।

ঈশ্বর মিত্রমুস্তাফি কেদারকে দেখছেন। আয়ত বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি। সুন্দর নিষ্পাপ এক শিশু। ওকে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন—আশীর্বাদ করি মস্ত বড় পণ্ডিত হ' ভাই। দেশবিদেশের লোক তোকে চিনুক। তুই বড় হ।

কেদার ওই স্পর্শে যেন সাহস পায়।

ওদিকে ছোট্টবাবু তখন সকালে বের হয়ে ফিরে এসেছে। ছোটবাবুর অভ্যাস সকালেই তার প্রিয় ঘোড়ায় চড়ে বেশ খানিকটা চক্কর দিয়ে আসা। এতে ভালো ব্যায়াম হয়।

মামাকেও ভালো লাগে কেদারের। কেদারকে দেখে মামাবাবু কাছে টেনে নেন।

—কি রে, পাঠশালে যাচ্ছিস?

চাইল কেদার। মামা বলেন—মস্ত পণ্ডিত হতে হবে কিন্তু, যাতে লোকে বলে অমুকের ভাগ্নে—বুঝলি! বড় হলে তোকেও একটা আরবি টাট্টু কিনে দেব। কেষ্টনগরে বড় ইস্কুলে গে পড়বি। তারপর কলকাতায়।

কেদারও স্বপ্ন দেখে সে বৃহত্তর জগতে পা দিয়েছে, অনেক বই পড়বে। বিশু মুখুয্যের কাছে কলকাতা, সাহেবদের কুঠির গল্প শুনেছে। সেও মস্ত পণ্ডিত হবে। সেসব জায়গায় যাবে। আর সেই আশ্বাস দিয়েছেন মামাবাবুও।

কেদার খুশী হয়—সত্যি!

মামাবাবু বলেন—হ্যাঁরে, তোকে আমিই মস্ত পণ্ডিত বানাবো। সারা দেশের লোক চিনবে তোকে। যা, মন দিয়ে পড়বি কিন্তু পাঠশালায়।

মামামাবু ঘোড়ায় উঠে বের হয়ে যান। কেদার দেখছে ওই অপস্রিয়মাণ মূর্তিকে। অমনি করে সেও দূরে—বহুদূরে উলা গ্রামের সীমা ছাড়িয়ে বের হয়ে যাবে একদিন।

ওদিকে আস্তাবলের সহিস তখন বড় গামলা থেকে রাশ রাশ ভিজে ছোলা চটের বস্তায় পুরে ঘোড়াগুলোর কাঁধে ঝুলিয়ে দেয়, ঘোড়াগুলো বস্তায় মুখ ঢুকিয়ে ছোলার দানা খাচ্ছে।

শিবু তাড়া দেয়—চলো, পাঠশালায় চলো!

কেদার এই প্রথম পাঠ নিতে পাঠশালায় চলেছে। শিবুর হাতে কালির দোয়াত আর কলাপাতার বাণ্ডিল, ওতেই প্রথম শিক্ষার্থীদের অ আ লিখতে হয়।

পাঠশালার সম্বন্ধে ধারণা বিশেষ ছিল না কেদারের। এর মধ্যে দূর থেকে দেখেছে ওই সদরের বারান্দায় অনেক ছেলে সুর করে অ আ—বানান—দিনের শেষে নামতা পড়ে। এবার সেও চলেছে সেখানে।

হঠাৎ দৃশ্যটা দেখে থমকে দাঁড়ায়। একটা কালো মোটা মত ছেলে, বেশ বড়সড়ই—তার হাতে একটা খেজুরগাছের পাতা ছাড়ানো ডাল, ওই ছড়ি দিয়ে সে এক-একজন ছেলের হাতে মারছে।

—তুই তিন নম্বর, তিন ঘা।

তুই চার—চার ঘা।

ওদিক থেকে একটা ভাঙা চেয়ারে বসে আছে ইয়া গোমড়ামুখো একজন। তিনিই এই পাঠশালার পণ্ডিত কার্তিক সরকার। অবেলাতেই নিদ্রামগ্ন ছিল, এ সময় কেউ ঘুমোতে পারে জানা ছিল না কেদারের।

ওদিকে দাদা কালীপ্রসন্ন একটু উপরে পড়ে। সে তালপাতায় লেখার যোগ্যতা অর্জন করেছে। হরিদাস এসেছে পাঁচ নম্বরে। পণ্ডিতের এবার নিদ্রাভঙ্গ হয়। চোখ দুটো লাল। গর্জন করে—অ্যাই মেধো, জোরে জোরে মার! শব্দ হচ্ছে না!

শিরপড়ুয়া মাধবের হাতেই পাঠশালার আইনশৃঙ্খলার ভার ন্যস্ত। সে এবার পণ্ডিতমশাইয়ের নির্দেশমতই হরিদাসের হাতে সশব্দে পাঁচ ঘা ছড়ি মারে। বেদনায় রাগে হরিদাস গর্জে ওঠে, —অ্যাই, মারবি না!

হরিদাস এমনিতে গোঁয়ার আর বেশ বলিষ্ঠই। তার গর্জনে পণ্ডিত এবার ছাত্রবিদ্রোহের গন্ধ পেয়ে গর্জে ওঠে। —কি বললি! মারবে না? দেরী করে এলে শাস্তি পেতেই হবে। ফের কথা বললে আবার পাঁচ ঘা পড়বে। যা।

হরিদাস মুখ বুজে গিয়ে বসলো।

কেদার তখন কোনমতে ঘা-তিনেক বেত খেয়ে কলার পাতায় অ আ লিখতে শুরু করে। তার কাছে ওই শাস্তিটা খুবই আতঙ্কের। যেভাবে হোক পণ্ডিতমশায়কে খুশী রাখতেই হবে।

পাঠশালায় কলরব—পড়া চলে। শেষে শুরু হয় নামতা। একজন ছেলে নামতা পড়ে—বাকীরা সুর করে পড়ে।

একুশ গণ্ডা—এক কাহন এক গণ্ডা।
বাইশ গণ্ডা—এক কাহন দু গণ্ডা।

কেদার দেখে, বেশ কিছু ছেলে প্রথমদিকে চুপ করে থেকে শেষে একত্রে বিকট গর্জন করে—আণ্ডা—আ—

গণ্ডার শেষে শুধু আণ্ডা যোগ করেই তারা নামতা পড়ছে, আর কার্তিক পণ্ডিত তখন সুখনিদ্রায় মগ্ন।

এবার ছুটির পালা।

পণ্ডিতমশায়ের নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে। এবার বলে সে ছাত্রদের—তোরা সবাই বাড়ি থেকে কিছু কিছু আনবি রোজ!

অবশ্য কেদার দেখেছিল আগেই, ছাত্ররা পাঠশালে আসার সময় অনেকেই অনেক কিছু আনে। কেউ ঘটিতে করে দুধ, কেউ নতুন খেজুরগুড়, কেউ আখ, কেউ গাছের লাউ ইত্যাদি। আর যারা ওসব ভেট আনে তাদের ছড়ি খেতে হয় না। যারা আনে না তাদের বেলাতেই হাজিরার এত বড় কড়াকড়ি।

পণ্ডিত তাই নতুন ছাত্রদেরও স্মরণ করিয়ে দেয়—কাল যে যা পারিস আনবি!

তারপর ছুটি। কলরব করে বের হয় ছাত্রের দল। হরিদাস গজগজ করে—ছাই আনবো! মারুক না কত মারবে ওই পণ্ডিত, এর শোধ একদিন নেবই। মজা দেখাবো পণ্ডিতকে।

আনন্দমোহন এবার একটু অসুবিধায় পড়েছেন। উনিই বড় বাড়ির জামাই, এখানের সবাই জানে তিনি নিজে উড়িষ্যার কোন জায়গার জমিদার। কিন্তু সেখানের জমিদারী দেখেন বাবা আর বাকী মহাল সব সৎমায়ের নামে। আনন্দমোহন সেখানে থেকে কিছুই নেন না।

এর মধ্যে বিশু মুখার্জি হঠাৎ বিপদে পড়ে এসে আনন্দমোহনকেই বলে—দত্তমশায়, আমার সমূহ বিপদ। এই বিপদ থেকে একমাত্র আপনিই উদ্ধার করতে পারেন, তাই আপনার কাছে এসেছি বাধ্য হয়ে, বাঁচাতেই হবে।

—কি বিপদ? প্রশ্ন করেন আনন্দমোহন।

বিশু মুখুজ্যের সামান্য জমিদারী—শরিকান সম্পত্তি এখন ভাগ হতে হতে তলানিতে ঠেকেছে। বিশু মুখার্জির কিছু টাকার দরকার পড়েছিল, বীরনগরের বাজারের কোন মহাজনের কাছে কিছু টাকা নিয়েছিল।

কিন্তু সময়মত সেই টাকা শোধও করতে পারেনি সে। তাই মহাজন এবার জানায় যে সুদ সমেত মায় আড়াই হাজার টাকা হয়েছে তার পাওনা আর সেই টাকা মায় সুদ সাত দিনের মধ্যে মিটিয়ে না দিলে সে আদালতের ডিক্রী নিয়ে বিশু মুখুজ্যের বাড়ি জমি সব কিছুর দখল নেবে।

বিশু মুখুয্যে বলে—টাকাটা যে ভাবে হোক আপনাকে দিতেই হবে দত্তমশায়। এ যাত্রা আমার মানসম্মান রক্ষা করতেই হবে, না হলে সর্বস্বান্ত হয়ে স্ত্রী পরিবার নিয়ে পথে বসতে হবে আমাকে।

আড়াই হাজার টাকার সে যুগে মূল্য অনেক। চালের দর তখন একআনা সের। ঘি টাকায় দেড় সের অবধিও মেলে।

সেই বাজারে আড়াই হাজার টাকা যোগাড় করাও কঠিন। দত্তমশায়ের নামই আছে, কিন্তু সে প্রায় নামেই তালপুকুর, ঘটি না ডোবার মত অবস্থাই। আনন্দমোহন জানেন তাঁর শ্বশুরমশাই এমনিতে দানধ্যান অনেক করেন। তাঁকে বিপদের কথা জানালে এ টাকা পেয়ে যাবেন মুখুয্যেমশায়। তাই বলেন তিনি—শ্বশুরমশাইকে জানালেই আপনার বিপদে তিনি সাহায্য করবেনই।

কিন্তু বিশু মুখুয্যের মানসম্মানের প্রশ্ন এতে জড়িত। গ্রামীণ সমাজে তার এই ঋণের কথা প্রকাশ পেলে অনেকেই তার প্রকৃত অবস্থাটা জেনে যাবে। সেটা জানাতে রাজী নয়। তাই বলে—দত্তমশায়, এতেও মানইজ্জত সবই যাবে। সবাই জেনে যাবে কথাটা। তাই আপনার কাছেই এসেছি, আপনি উদ্ধার না করলে পথে দাঁড়াবো। এটুকু সাহায্যে আপনাকে করতেই হবে। ধান উঠলেই দিয়ে দেব টাকাটা।

ভদ্রলোকের মহা বিপদ। এদিকে আনন্দমোহনও নিজের প্রকৃত অবস্থার কথা জানাতে পারেন না। স্ত্রীকেই জানান সব ব্যাপারটা। বলেন—আমার নিজের অবস্থা এই, এত টাকা দেব কি করে? অথচ এমনভাবে ধরেছেন ভদ্রলোক—কি যে করি?

জগৎমোহিনী দেখছে তার স্বামীকে। তারও উপায় থাকলে তিনি দিতেন। এ যেন তাঁর অক্ষমতারই পরিচয়।

জগৎমোহিনী সব বুঝে বলে—টাকাটা বিশু মুখুজ্যে কবে ফেরত দেবেন?

—ধান উঠলেই দেবেন বললেন।

জগৎমোহিনীর বাবার দেওয়া আর নিজের বেশ কিছু টাকা ছিল। সে স্বামীর মান রাখার জন্যই বলে—তা যদি দেন তুমি দিও ওকে টাকাটা।

অবাক হন আনন্দমোহন। তাঁর স্ত্রী যে তাঁর মানসম্মান বাঁচাবার জন্য এইভাবে এগিয়ে আসবে তা ভাবতেও পারেন নি। তাই স্ত্রীর কথায় বলেন তিনি—তুমি টাকা দেবে? বাবা যেন এসব না জানতে পারেন!

হাসে জগৎমোহিনী। বলে সে—কেউ জানবে না।

বিশু মুখুজ্যেও যেন কৃতজ্ঞতায় গলে যায়। হাতে টাকাটা পেয়ে বলে সে আনন্দমোহনকে—জানতাম আপনি দেবেনই। কত বড় বংশ আপনাদের। আপনার হাত ঝাড়লেই পর্বত। খুব বাঁচালেন মশাই। ব্যাটা চামার মহাজনের নাকের উপর ঝমাঝম্ টাকা ফেলে দলিল নিয়ে আসছি।

আনন্দমোহন বলেন—আমার কিন্তু টাকাটা ফেরত চাই ধান উঠলেই।

বিশু মুখুজ্যে বলে—সে ভাবতে হবে না। মুখুজ্যেবাড়ির ছেলে আমি। এক বাত আমার। ধান উঠলেই আগে আপনার টাকা দিয়ে তবে অন্য কাজ—দেখবেন। চলি।

টাকা নিয়ে সদর্পে মহাজনের নাক-বরাবর ছুঁড়ে মারার জন্য চলে গেল সে।

পাঠশালা চলছে। ভীতত্রস্ত কেদার। পড়া করে নিয়ে পাঠশালে যাবার চেষ্টা করে সকলের আগে। প্রথম গেলে মাত্র এক ঘা, কিন্তু সবদিন তা হয় না। ফলে দু'চার ঘা তো জোটে কপালে। তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই সেদিন কেদারও পণ্ডিতের কাছে ভেট দিতে চায়।

দেখেছে পুণ্যাহের দিন জমিদারবাবু অর্থাৎ তার দাদু মিত্রমুস্তাফি মশায় কাছারিতে চুনোট করা ধুতি, গরদের পাঞ্জাবি পরে বসেন, সামনে বিরাট একটা রূপোর থালা নামানো থাকে, বিভিন্ন মহালের প্রজা গোমস্তারা এসে সেদিন জমিদার বাবুকে রাজমান্য হিসাবে রূপার টাকা—নানা কিছু নজরানা দেয়।

কেদারের মনে হয়, এই পণ্ডিতমশাইয়ের দরবারেও তেমনি নজরানা দিতে হবে। কিন্তু কিই

বা দেবে! হঠাৎ কেদারের নজরে পড়ে রান্নাঘরের দাওয়ায় রাখা আছে বাগান থেকে আনা অসময়ের একটা এঁচড়, এখানে এঁচড়-কাঠালের অভাব নেই, সে অবশ্য এঁচড়ের সময়। প্রচুর কাঁঠালগাছ এদিকে।

কিন্তু এটি দু'ফলা গাছের অতি দুষ্প্রাপ্য একটি এঁচড়—অসময়ের ফল। বাগান থেকে মালি সংগ্রহ করে এনে রেখে গেছে। বড় হুজুর এর তরকারি খুবই ভালবাসেন।

এদিকে লোকজন কেউ নেই। কেদারও ভাবে অসময়ের এই এঁচড় পেলে পণ্ডিমশাইও খুবই খুশী হবেন। ছেলেদের অনেকেই গাছের লাউ, কুমড়ো, শশা আনে—এহেন দুর্লভ বস্তু কেউ আনতে পারে না। সেই-ই নিয়ে যাবে।

তাই এঁচড়টা তুলে নিয়ে কেদার সটান চাদরের নীচে চালান করে দিয়ে একেবারে পাঠশালে এসে হাজির হয়।

পণ্ডিতমশাই তো অসময়ের এহেন দেবদুর্লভ বস্তু দেখে খুবই খুশী। বেশ জমবে আজ এর তরকারি। যোগ্য ছাত্র কেদারকে আশীর্বাদ করে।

—নাহ্ তোর হবে কেদার, তোর হবে। যা—বসগে।

ওদিকে ছাত্ররা আসতে শুরু করেছে আর শিরপোড়ো মেধোও তখন ছড়ি নিয়ে ছাত্রদের নাম্বার ধরে বেত মেরে ক্লাসে ঢোকাচ্ছে।

হরিদাস আজ বেশী দেরীই করে ফেলেছে, কারণ কোন গাছে টিয়াপাখীর বাসার সন্ধানেই ব্যস্ত ছিল সে। টিয়াপাখীর বাচ্চা পেলে পুষবে, কিন্তু ঠিক সন্ধান করাও হল না, পাঠশালারও দেরী হয়ে গেছে।

বলে সে—পেটব্যথা করছিল পোনশাই।

—চোপ্! পণ্ডিতের রাগ ওর ওপর রয়েছে, হরিদাস নিজে কোনদিন কিছু আনে না, বরং সবাইকে আনতেও নিষেধ করে। এহেন বেয়াদব ছাত্রকে এবার পণ্ডিত নিজেই বেশ কয়েক ঘা বেতই মেরে গর্জায়—বেয়াদবি করলে বড় হুজুরকেই বলে দেব। যা।

চুপ করে গিয়ে পাঠশালে ঢোকে হরিদাস।

এদিকে রাঁধুনী তখন অন্দরমহলে হৈচৈ তুলেছে। এখানেই এঁচড়টা ছিল—নেই। কোথায় গেল? কে নিল? বড় হুজুরের মুখের জিনিস কোথায় গেল?

এই নিয়ে হৈচৈ শুরু হয়।

গিন্নীমাও এসে পড়েন। জগৎমোহিনীও বলে—তাই তো, গেল কোথায় এঁড়েটা? বাড়িতে কি চোর-ডাকাত ঢুকেছিল?

গাঁয়ের মেয়ে শিবুর নজর সবদিকেই।

সে একনজর দেখেছিল কেদারকে এইদিক হয়ে পাঠশালে যেতে। আর কেউ তেমন আসে নি, শিবু জানে ওই কার্তিক পণ্ডিতের নজরানার খবর, সে নিজে দেখে এসেছে ছাত্রদের নানা কিছু আনতে হয়।

কি ভেবে শিবু বাড়ি থেকে বের হয়ে সটান পাঠশালায় এসে হাজির হয়। পণ্ডিতের জন্য আনা ছাত্রদের কলা মূলো লাউ দুধ গুড় ইত্যাদি নজরানার দ্রব্য তখনও ওদিকে জমছে, তার মাঝে সেই অসময়ের এঁচড়ও শোভা পাচ্ছে।

শিবু এবার হাতেনাতে ধরেছে পণ্ডিতকে—এসব কি। অ্যাঁ, বড় হুজুরের মুখের এঁচড় লাগবে তোমার মত পোঙা পণ্ডিতের ভোগে? এটা কোথায় পেলে? বাবুর বাগানের এঁচড়—অ্যাঁ, কে এনেছে?

ছাত্র গুরুদাস নীরব থাকে। অন্য ছেলেরাও। কেদারই বলে—আমি।

শিবু রাজবাড়ির খাস ঝি, আর তার চোটপাটও কম নয়, এবার ওই এঁচড়টা তুলে নিয়ে পণ্ডিতকে বলে—ছাত্রদের এইসব শেখাচ্ছো! চুরি বিদ্যে! যাই বলিগে কর্তাবাবুকে।

কার্তিক সরকার বিপদে পড়ে। জানে শিবুর গতিবিধি সেখানেও অবাধ। তাই বলে পণ্ডিত—এসব আর হবে না, এ নিয়ে তুমি আর গোল করো না।

শিবু শাসায়—ঠিক আছে, এবার চুপ করেই যাচ্ছি। তবে কথাটা যেন মনে থাকে পণ্ডিত।

কেদার তো স্তব্ধ।

পাঠশালার কাজ শুরু হয়। কেদারের মনে হয় তার জন্য শিবু মাসী এসে পণ্ডিত মশাইকে বকেছে, তার চোট পড়বে তারই উপর, তাই ভয়ে-ভয়েই থাকে।

ছুটির সময় পণ্ডিতমশাই বলে কেদারকে একান্তে—বড় বড় জিনিস আনবি না। ছোটখাটো জিনিস আনবি। ভালো তামাক—না হয় অন্য কিছু। তোর দাদু তো গড়গড়ায় অম্বরী তামাক খায়!

অর্থাৎ অন্য কিছু আনলেই হবে।

কেদার তাই তামাকের সন্ধানও করে, কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পারে, ওটা থাকে কাছারিবাড়ির হুঁকাবরদারের নিজস্ব হেপাজতে একটা কাঠের বাক্সে।

সেখানেও গোপনে হানা দেয় কেদার, তামাক পেলে পণ্ডিতমশাই খুশী হবেন, কিন্তু দেখে কাঠের বাক্সে ঝুলছে ইয়া একটা তালা। আর তার চাবি ওই হুঁকাবরদারের কোঁচড়ে। সুতরাং তামাক সংগ্রহ করা হল না। তবে কি নিয়ে যাবে? ছোট জিনিস আর কি পেতে পারে নাগালের মধ্যে! শেষ অবধি নজর পড়ে কেদারের আস্তাবলের বিরাট মাটির গামলার দিকে। ঘোড়াদের খাবার জন্য তাতে ছোলা ভিজোনো থাকে।

আর সেদিকে বিশেষ কারও নজরও নেই। ভিজোনো ছোলাগুলো গামলাতেই রয়েছে। কেদার শেষ অবধি একটা ঠোঙায় বেশ কিছু ভিজে ছোলা সংগ্রহ করেই সেদিন পাঠশালে যায়।

পণ্ডিতমশায় বলেন—ছোলা ভিজে, তা মন্দ নয়! লঙ্কা দিয়ে ঘুঘনিই হবে, তরকারিতেও খাওয়া যাবে।

কেদার তারপর আস্তাবল থেকে ঘোড়াদের ছোলাতেই থাবা বসাতে থাকে পণ্ডিতের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য।

পাঠশালে যেতে হয়, যায় সে। কলাপাতা থেকে তালপাতায় লেখার প্রমোশন মিলেছে তার। এখন সে একাই বের হয় গ্রামের পথে।

এই দিকটায় তাদের দাদুরই প্রাসাদ, ঠাকুর মন্দির—নাটমন্দির। তারপর তো আর-আর শরিকানদের বাড়ি। এদিকটার ওপাশের পল্লীর রূপ আলাদা।

ওপাশে জমিদার পাড়া। তাদের চকমিলানো বাড়িদেউড়ি—ওদিকে হাতিশালা, ঘোড়াশালা তারপর বাগান—তাতে পাথরের পরীর মূর্তি বসানো।

প্রাচুর্যের আভাস সেখানে। বিরাট কাছারিবাড়ির সারবন্দী ঘর—সেখানে আমলা, ফৈলা, গোমস্তা পাইক, প্রজাদের আনাগোনা, ভিড়।

তার তুলনায় এদিকটা অনেক শান্ত। মাটির বাড়ি—খড়ের ছাউনি। তাও বেশ ছিমছাম, ওদিকে বাচস্পতি মশায়ের বাড়ি। সামনে তাঁর ছোট মন্দির। জমিদারবাবুদের টোলের অধ্যাপক এই বাচস্পতি মশায়। বাইরের চাতালে বসে তিনি নানা গ্রন্থ পাঠ করেন। সৌম্য শান্ত চেহারা। তাঁর স্তোত্রপাঠও শোনে স্তব্ধ হয়ে ওই কেদারনাথ।

বাচস্পতি মশায় মিত্রমুস্তাফি মশায়ের ওখানে প্রায়ই যান, তাই তাঁর নাতিকেও চেনেন। ওকে দেখে ডাকেন—এসো!

কেদার পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। বাচস্পতি মশায় বলেন,—পাঠশালে যাও?

মাথা নাড়ে কেদার।

—বাঃ! খুব মন দিয়ে পড়বে।

কেদার দেখছে ওঁর গ্রন্থ পুঁথিগুলো, শুধোয় সে—আপনি এত সব পড়েছেন?

—হ্যাঁ, বড় হলে তুমিও পড়বে। নাও প্রসাদ।

বাতাসা কদমা আর কলা। কেদার মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখছে ওই গ্রন্থসম্ভার। কি সব লেখা আছে ওতে জানে না। কেদার শুধোয়—গৌরাঙ্গকে জানেন?

একটু অবাক হন বাচস্পতি মশায়—গৌরাঙ্গ!

—ওই যে কাছারির জগন্নাথদা গান গায় সকালে, গৌরাঙ্গের গান!

এবার নিষ্ঠাবান পণ্ডিত বাচস্পতি মশায় দেখেন ওকে। বলেন—তিনি বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান প্রবক্তা গো। সাড়ে তিনশো বছর আগে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। নিমাই পণ্ডিত বলতো সবাই তাঁকে।

—নিমাই পণ্ডিত! কেদার ঈষৎ যেন হতাশই হয়। কারণ একজন পণ্ডিতকে সে চেনে, সে ওই পাঠশালার কার্তিক পণ্ডিতই। সেই রকম পণ্ডিত যদি হয়েছিলেন নিমাই পণ্ডিত, তাহলে তো ভাবনার কথা! সেই ছবিটার সঙ্গে তার কল্পনার গৌরাঙ্গের ছবি আদৌ মেলে না।

তাই শুধোয়—তবে এতদিন পরও লোকে তাঁর নামগান গায় কেন?

বাচস্পতি মশায় সব কথা ওই শিশুকে ঠিকমত বলতেও পারেন না। সেদিনের বৈষ্ণবতত্ত্ব তার মূলধারা থেকে আজ অনেক দূরে সরে গেছে, এখন তা বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমিত। দেহবাদী—মায়াবাদী—স্বার্থান্ধ কিছু মানুষ তার বিকৃত রূপটাকে নিয়েই সমাজে ভোগ আর বেসাতি শুরু করেছে।

তাই নীরবই থাকেন তিনি।

কেদার সরে আসে প্রসাদ নিয়ে। তার প্রশ্নের ঠিক উত্তর সে পায় নি। হয়তো জগন্নাথদাই দিতে পারে।

॥ ৪ ॥

চলেছে সে গ্রামের পথে। গ্রামের চত্বরে—কোন পাড়ার চণ্ডীমণ্ডপে তখন গানের আসর বসেছে। কে কালোয়াতি গান গাইছে গলা ফুলিয়ে। সে গর্জন করে করে তানা-না করে চলেছে, অন্যজন পাখোয়াজে উদ্দাম গতিতে ঘা মারছে, বাকী শ্রোতারাও মাথা নাড়ছে তার চেয়ে জোরে, কেউ বা হাতও ছুঁড়ছে, যেন শূন্যপথে কি খামচে ধরতে চায়।

কেদারের পথ চলা থামে না। বিরাট গ্রাম—অনেকগুলো পাড়া—বহু মানুষের বাস। বিভিন্ন জাতের মানুষদের নিয়ে গড়ে উঠেছে এক-একটা পাড়া।

ওদিকে কোন চত্বরে তখন বয়স্কদের পাশা খেলার আসর বসেছে। তাদের পাশা খেলার দৃশ্য দেখে কেদারের মনে পড়ে মহাভারতের সেই কৌরবসভার পাশা খেলার কথা।

—কচ্চে বারো!

কে দু'হাতে পাশার গুটি কচলে হুঙ্কার ছাড়ে।—বারো পাঞ্জা সতেরো!

কোন মুরুব্বী আবার পাশার দান ফেলাতেই নাকি কারচুপি করেছে। শুরু হয় বাকযুদ্ধ।

—দান ঠিকমত ফ্যালো হে মুখুটি মশায়।

মুখুটি মশায় মুখ থেকে হুঁকো সরিয়ে জবাব দেয়—ঠিকই ফেলেছি। গুটি যাবে তাই চেল্লাচ্ছো! তুমি কে হে?

—খবরদার।

দ্বৈরথ সমরই বাধার উপক্রম দুই বুড়োর মধ্যে। অন্যরা থামায়। আবার খেলা চলে।

এরা নিজেদের বিচিত্র নিশ্চিন্ত জগতের মাঝে আনন্দের অবকাশ খুঁজে নিয়েছে। কেদার হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় ভূধর কুমোরের আস্তানার সামনে।

গাছগাছালি ঘেরা একটা খড়ের চালা—তার নীচে ভূধর পাল খড় মাটি দিয়ে প্রতিমা গড়ছে। তখন বর্ষা শেষ হয়ে শরৎকাল আসছে। আকাশে নীল রং ফুটে উঠেছে। নদীর ধারে, মাঠে কাশফুল ফুটছে—পুজো আসছে।

ভূধর পালও ব্যস্ত। সে-ই জমিদারবাড়ির দুর্গাপ্রতিমা তৈরী করে, সেখানেই দেখেছে তাকে কেদার। আজ তার বাড়িতে এসে পড়েছে।

চালার নীচে সারবন্দী নানা দেবদেবীর মূর্তি ; দুর্গা কালী লক্ষ্মী সরস্বতী মহাদেব মায় ছোট রাধাকৃষ্ণের মূর্তিও রয়েছে।

ভূধর নিপুণহাতে ওদের মূর্তি গড়ছে, রূপ দিচ্ছে সেই রূপাতীত দেব দেবী—কৃষ্ণেরও।

কেদার বলে—তুমি ওদের দেখেছো ভূধর মামা?

ভূধর অবাক হয়। বলে সে—সেকি গো! ওদের দেখা কি মেলে সহজে! যুগ যুগ ধরে কত মুনি-ঋষিরা কত তপিস্যে করেও ওদের দেখা পাননি, আমি তো কুন ছাড়!

—তবে তৈরী করো কি করে?

—অভ্যেসে।

—তা গৌরাঙ্গ ঠাকুরের মূর্তি করো না?

ভূধর বলে—ও তো ন্যাড়ানেড়িদের ব্যাপার। ভদ্রঘরে ওসব মূর্তির চল নাই। ওরাই হৈচৈ করে বাবাজী—সেবাদাসীর দল। ছাড়ো তো ওদের কথা!

কেদারের সেই ঈশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ—এসব প্রশ্নের তেমন কোনও সদুত্তর মেলে না, প্রশ্নগুলো মনেই থেকে যায়।

সেদিন তাদের বাড়ির লাগোয়া বাগানের ওদিকে গেছে কেদার। তাদের বাড়িটা অনেক বড়, পিছনে বিশাল আম কাঁঠাল লিচু সবেদা বেল নানা কিছুর বাগান আছে। একটা সুন্দর ঘাটবাঁধানো পুকুরও আছে—তার কিছুটা বাড়ির দোতলার বারান্দা থেকে দেখেছিল মাত্র, কিন্তু কাছে এসে দেখেনি, অবশ্য বড়দা অভয় আর মেজদা কালি তাদের পাড়ার কিছু ছেলেদের সঙ্গে এখন এদিকে আসে। কেদারের এতদিন যত্রতত্র ঘোরার সুযোগ ছিল না, এখন কেদার আর ছোট ভাই হরিদাসও এদিকে আসে।

কেদার স্বভাবতই শান্ত-ধীর-স্থির ধরনের ছেলে কিন্তু হরি দাস তার ছোটভাই একেবারে বিপরীত মেরুর বাসিন্দা, সে স্বভাবতই ডানপিটে আর জেদী ও একগুঁয়ে।

এখন সেও দাদাদের সঙ্গে স্কুলে যায়। আর যাবার পথে এগাছ-ওগাছে কিছুটা চড়া শুরু করে—ফলপাকড় পেলে পাড়ে। তখন ওইটাই তার লক্ষ্য—ফলে কার্তিক সরকারের পাঠশালার কথাও তখনকার মত ভুলে যায়। তাই পাঠশালাতে যেতেও দেরী হয় আর শিরপড়ুয়া মাধবের ছড়ির আঘাত খায় হাতে বেশ কয়েক ঘা। রাগে গজরায়, আবার পরদিনও সেই ঘটনাই ঘটে।

এতদিন পর ওদিকে গেট থেকে তাদের বাগানে এসে হরিদাস স্বমূর্তি ধরে, কোন গাছের

ডালে উঠে আম পাড়ার চেষ্টা করছে, কেদার জানে এবাড়ির চাকর-মালিদের নজরে পড়লে দাদুর কানে না হয় মামাবাবুর কানেও যাবে কথাটা, তাঁরা কি ভাববেন! হরিদাসকে নিবৃত্ত করা যায় না—কেদারই সরে যায় সেখান থেকে।

ওদিকে পাহারাদারদের ব্যারাক।

এদিকে চোর-ডাকাতের ভয়ও আছে। তাছাড়া পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ এসব বেশী সংখ্যায় রাখতে হয়। নিরাপত্তার কথা ছাড়াও মান-ইজ্জতের প্রশ্ন জড়িত এর সঙ্গে। জমিদারের ঠাটবাটও জমিদারীর একটা অঙ্গ। তাই এবাড়িতে বেশ কিছু পাইক পেয়াদা বরকন্দাজ এসব আছে। তাদের বাসস্থানও দেওয়া হয় এই ব্যারাকে।

এইদিকে একফালি সবুজ ঘাসের পর ছোট কিছুটা বেড়াঘেরা ফুলের বাগান দেখে এগিয়ে আসে। ঘরের সামনে কে ফুল-বাগান করেছে! আর গাছের ছায়ায় বসে একজন লোক সুর করে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে।

স্মরণ করো রাম নাম—
সর্বপাতক হর।

সেই রামের নাম শুনে কেদার এগিয়ে আসে। লোকটার মাথায় একটা টিকি—কপালে চন্দনের ছাপ। তার ওই সুরের মধ্যে যেন কি যাদু আছে। কেদার মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যায়।

এবার জেনেছে লোকটাকে। তাদেরই বাড়ির দারোয়ান। অন্যসময় পোশাক পরে থাকে, মাথায় থাকে পাগড়ি। এখন অন্য চেহারা, গলায় পৈতে।

ওকে দেখে রামায়ণ পড়া থামিয়ে বলে শীতল তেওয়ারি—আরে খোকাবাবু, আসো আসো, বৈঠো।

সামনেই খাটিয়াটা পেতে দেয়। কেদার বসে শুধায়—কি পড়ছিলে, রামচন্দ্রের কথা?

শীতল বলে—হ্যাঁ। রামায়ণ পড়ছে হামি, শ্রীরামচন্দ্র সীতামায়ি হনুমানজীর কথা এসব আছে এতে। সমঝে খোকাবাবু, সীয়ারাম-এর নাম নিলে তাদের আশীর্বাদে সোব ভয় বিপদ কেটে যায়। শ্রীরামচন্দ্র সাক্ষাৎ ভগবান।

ভক্তিভরে প্রণাম করে শীতল, বলে সে—শুনবে তুমি? বহুৎ পুণ্য হোবে—

একজন মুগ্ধ শ্রোতা পেয়ে শীতলও পরম ভক্তিভরে রামকথা শোনাতে থাকে, কেদার শুনছে সেই অপূর্ব কথা। সীতার বনবাস পর্বে দুঃখিনী সীতার দুঃখে তার চোখেও জল নামে। বেলা কোন্দিকে চলে যায়। বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামে—পাঠক-শ্রোতা দুজনের তখন হুঁস হয়।

কেদার-এর মন কি অপূর্ব তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। আজ যেন সে এক নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছে। শীতল তেওয়ারির দুপুরে রামায়ণ পাঠের আসরে প্রায়ই আসতে শুরু করে সে, দাদারা অবশ্য তখন বাগানে পাখী-না হয় মৌচাকের সন্ধানে ব্যস্ত। মৌচাক ভেঙে টাটকা মধু বের করার কৌশলটা তার ছোটদা অর্থাৎ কালিদার বেশ আয়ত্তে এসে গেছে, অবশ্য এই দুঃসাহসিক কাজে ছোট ভাই হরিদাস দক্ষ সহকারীর কাজ করে।

কেদার তখন যেন অন্য মধুর স্বাদে মগ্ন, তাই সব সময় এদের ব্যাপারগুলোর সঠিক খবর জানে না। আর তারাও কেদারকে তাদের এসব গোপন অভিসারের কথাও জানায় না।

কেদার তার সেই রামায়ণের জগতে কোন পর্বতসমাকীর্ণ গহন দণ্ডকারণ্যে শবরী নদীর তীরে হারিয়ে গেছে। রামচন্দ্র চলেছেন—তাঁর পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যা জেগে ওঠে—কোন্ অরণ্যগহনে শবর-দুহিতা পরমপুরুষ শ্রীরামচন্দ্রের প্রতীক্ষায় সাধনমগ্না।

সেদিন ওই পাইক ব্যারাকে যেতে গিয়ে দাঁড়ালো কেদার। সামনে বেশ কিছুটা জায়গায় মাটি কুপিয়ে সেখানে কুস্তির আখড়া—লাঠি, তরোয়াল খেলার জায়গা বানানো হয়েছে।

দারোয়ান-পাইকদের অনেকেই সেখানে ল্যাঙোট পরে কুস্তি লড়ছে, আর ওদিকে দু'দলের উদ্দাম লাঠির লড়াই চলেছে, ঠক্ ঠক্ লাঠির শব্দ ওঠে।

ওপাশে বন্‌বন্ করে তলোয়ার ঘোরাচ্ছে কারা, ধারালো ফলায় রোদ পড়ে ঝিক্‌মিক্ করে, বন্‌বন্ শব্দে তলোয়ার ঘুরছে।

সবকিছুর তদারক করছে ন্যাপা সর্দার। সমস্ত পাইক পেয়াদাদের সে-ই সর্দার। বিশাল পেটা চেহারা—ঝাঁকড়া চুল, চোখদুটো বেশ বড় বড়। তার হুঙ্কারে বাচ্চারা রীতিমত ভয় পায়।

কেদার দেখে দূর থেকে ওদের ওই লড়াই, এগিয়ে যায় শীতলের বাসার দিকে।

সেদিন সন্ধ্যার মুখে কেদার ফিরছে, তখন আখড়া ফাঁকা, হঠাৎ কৃষ্ণনাম শুনে থমকে দাঁড়ায়।

কৃষ্ণনাম তাদের মন্দিরেও হয়। অনেক লোকও আসে সেখানে, খোলকর্তালও বাজে সন্ধ্যার পর। এখানে এই নির্জনে একক এই নামগান শুনে এগিয়ে যায় কেদার।

সেখানে দেখে প্রদীপ-ধূপ জ্বেলে সেই ন্যাপা সর্দার নামগান করছে। এ যেন অন্য এক মানুষ। সেই বিভীষিকাময় মানুষটা যেন নামগানের প্রভাবে একেবারে বদলে গেছে।

কঠিন সেই মানুষটা রূপান্তরিত হয়েছে অন্য মানুষে।

—খোকাবাবু!

ন্যাপা সর্দারও দেখেছে তাকে! বলে কেদার—তুমিও কৃষ্ণনাম করো সর্দার।

হাসল ন্যাপা। বলে সে—এই নামই আমার জীবনটাকেই বদলে দিয়েছে খোকাবাবু। আমার মত মহাপাপীকে তিনি শান্তি দিয়েছেন।

অবাক হয়ে শোনে কেদার ওর কথাগুলো। ওর কথার সুরে ফুটে উঠেছে নীরব কি আর্তি। এই নাম যে তার জীবনে অনেক পরিবর্তন এনেছে—এটা তারও মনে হয়।

কেদার দেখছে ওই মানুষটিকে। আনন্দময় শীতল তেওয়ারি—ওই শান্তির স্পর্শ পাওয়া ন্যাপাসর্দার এদের দেখে মনে তার প্রত্যয় হয় শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র—এঁরা সত্যি পরমেশ্বর—দয়াময়—করুণাসাগর।

—কিন্তু দেখেছ তাঁদের?

কিশোরের প্রশ্নে ন্যাপাসর্দার হাসে,—ত্যানার দেখা মুনি-ঋষিরাও পায় না—আমি তো মহাপাপী গো!

ভূধর পালও এই কথা বলে—তবু সেই পরম দেবতার অস্তিত্বে কোন অবিশ্বাস তাদের নেই।

॥ ৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ, রামচন্দ্র ছাড়াও সেদিন আর একজনের কথাও শোনে কেদার। জগন্নাথ সেরেস্তায় কাজ করে। রোজ ভোরে কেদার শোনে জগন্নাথ খঞ্জনী বাজিয়ে নামগান করে উদার শিশিরভেজা গ্রাম্যপথে।

সেদিন কেদারও ভোরে উঠেছে—বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে—দূর থেকে জগন্নাথের গান ভেসে আসে।

কহ গৌরাঙ্গ—ভজ গৌরাঙ্গ—লহ গৌরাঙ্গের নাম রে
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে—

মধুর সেই নামগান যেন নতুন শুনছে কেদার। ওদিকের পথ দিয়ে জগা গেয়ে চলেছে—

মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনে কেদার। এই গৌরাঙ্গদেবের নাম সে কয়েকবার শুনেছে।

নদীর ধারে কোন বৈরাগী মোহান্তদের আখড়ায় সেদিন বিরাট মচ্ছব হচ্ছে। দূর-দূরান্তর থেকে অনেক ন্যাড়া মাথা ভেকধারী বৈষ্ণব, রকমারি বয়সের সেবাদাসীদের নিয়ে এসেছে। নাকে রসকলি—গলায় কণ্ঠী নিয়ে তারাও খঞ্জনী বাজিয়ে গৌরাঙ্গের নাম করছে আর খাবার ডাক হতেই খোল কর্তাল ফেলে গিয়ে পাতায় বসে পড়ছে।

খাওয়াটার জন্যই বোধহয় ওই নাম করে তারা।

বসন্ত ওবাড়ির কাজ করার লোক—তার সঙ্গে কেদার ওই মেলা দেখতে গেছে, দেখে ওদের ভোজনপর্ব—সার দিয়ে দিয়ে বসেছে তারা স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে। হাসাহাসি মস্করাও চলছে। পাতায় অন্নব্যঞ্জন আসতে চূড়াপ্রমাণ অন্ন নিয়ে তারা সেবা শুরু করে। কে একজন পেটমোটা বাবাজী গর্জন করে—সাধু সাবধান!

সেই হুঙ্কারের রেশ তুলে সকলে সাড়া দেয় সমস্বরে—হ্যাঁ।

পুনরায় গর্জে ওঠে বাবাজী শিখা নাড়িয়ে।—যে দেশে নিমাই নাই সেথা নাহি যাবো।

দোঁহা ধরে অন্যরা—হ্যাঁ, নিমাই বিমুখী জনের মুখ না হেরিব।

—হ্যাঁ!

এই গর্জনের মাধ্যমে উদরস্থ খাদ্যাদিকে ঝাঁকুনি দিয়ে সেট করে আবার তারা শ্রীঅন্ন, শ্রীরসার স্বাদ আস্বাদন করতে শুরু করে।

ওদিকে কিছু কাঙালীর দলও প্রসাদের আশায় ভিড় করেছে, তাদের একজন কোন বাবাজীকে ছুঁয়ে ফেলেছে অসাবধানে, তারপরই বৈষ্ণব বাবাজী সেই বৈষ্ণবোচিত বাহ্যিক বিনয়ের মুখোশ খুলে মারমুখী হয়ে লোকটাকে এতবড় অনাচারের জন্য পায়ের কাষ্ঠপাদুকা খুলে বেদম পিটতে থাকে, আঘাতের ফলে তার কপাল ফেটে রক্ত ঝরছে, তবু ওই অশাস্ত্রীয় কাজের জন্য প্রহার থামে না।

কেদার দেখছে ওই ভণ্ড মানুষগুলোর কাণ্ডকারখানা।

বসন্ত বলে—চলো খোকাবাবু, ঢের হয়েছে মচ্ছব দেখা!

কেদার বলে—ওরা নিতাই গৌর-এর নাম করে, তবু এমন কেন?

বসন্ত বলে—ওসব বাবাজীদের ভড়ং, বোষ্টম না ছাই!

এর উত্তরও পায় না কেদার। তবু মনে হয়, নিতাই গৌরাঙ্গ সম্বন্ধে কিছু জানতে হবে। মনে পড়ে জগন্নাথদার কথা।

সেদিন মিত্রমুস্তাফি বাড়ির পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরা হচ্ছে। ছেলেরাও রয়েছে পুকুরপাড়ে। জালে বড় বড় মাছগুলো ধরা পড়ছে—কলরব করে অজয় কালিদা। হরিদাস তো জলে নেমে মাছ তোলার চেষ্টা করে।

হরবিত নায়েবও রয়েছেন।

তিনি বলেন—বড়গুলোকেই ধর।

জগন্নাথ এসে পড়ে। সে বলে—ওই নিরীহ প্রাণীগুলোকে হত্যা করে কি হবে নায়েবমশাই। জলের জীব—জলেই থাকুক।

কেদারও চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তারও মনে হয়েছে, জলজ্যান্ত সুন্দর নধর মাছগুলোকে হত্যা করে এত আনন্দ কেন পায় তারা? এসব তার ভালো লাগে নি।

আজ জগাদাকে সেই কথাটা প্রকাশ্যে বলতে দেখে খুশীই হয় সে, ওরা বন্ধ করুক এই হত্যালীলা।

কিন্তু নায়েবমশাই ধমকে ওঠেন—তুই যা তো জগা! আর ন্যাকামি করিস না! মাছ মারলে আবার অপরাধ হয় নাকি! যা তো—যত সব পাগলামি!

জগা বকুনি খেয়ে সরে যায়। কেদারও সরে আসে। তার ওদের ওই পৈশাচিক আনন্দ যেন ভালো লাগে না। পায়ে পায়ে সেও সরে আসে।

ওদিকেই জগন্নাথের বাসা। সামনে একটা বকুলগাছ, ছায়া নেমেছে সেখানে। বাতাস বকুলফুলের গন্ধে আমন্থর, আরও কিছু ফুলগাছ লাগানো, মাটির ঘর—আঙিনায় তুলসীমঞ্চ।

সামান্য গৃহস্থ সে।

কেদারকে দেখে অবাক হয় জগন্নাথ। খঞ্জনী বাজিয়ে নামগান করছিল। ওদিকের তাকে কিছু তুলোট কাগজ—তালপাতার পুঁথি, কাঠের সিংহাসনে গৌর-নিতাই-এর নৃত্যরত মূর্তিটায় তাজা ফুলের মালা—ধূপের সুরভি ওঠে।

ধনী বৈষ্ণবদের আখড়ার সেই বৈভব এখানে নেই, নেই কোন মোহান্ত মহারাজ—পায়ের কাছে রূপোর থালায় প্রণামীর টাকার স্তূপও নেই। তবু এক মনোরম স্নিগ্ধতা এখানে বিরাজমান।

—এসো খোকাবাবু!

জগন্নাথ চেনে ওকে, দেখেছে বড়বাড়ির অন্য ছেলেদের মত এ চঞ্চল উদ্ধত নয়। অনেক শান্ত। তার নামগান শোনে নীরবে। চোখেমুখে কি যেন ব্যাকুলতা।

কেদার ওই মূর্তি দেখে বলে।—তুমিও গৌর-নিতাই পূজো করো? বোষ্টম!

জগন্নাথ বলে—বৈষ্ণব হওয়া কি মুখের কথা গো! তৃণঘাসের মত বিনয়ী হবে, তরুবৃক্ষের মত সহিষ্ণু হতে হবে, জ্ঞানীমানীদের সম্মান করতে হবে, সকলকে ভালোবাসতে হবে—এইসব তো বৈষ্ণবের আসলে গুণ গো। ওসব অর্জন করা কি চাট্টিখানি কথা। নিতাই গৌরাঙ্গকে ডাকি—বলি দয়া করো।

কেদারের মনে পড়ে সেই আখড়ার কথা। সেখানে দেখেছে লোককে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে দেবতার নামে লোক ঠকানোর পালাই চলেছে। দেখেছে সেই বাবাজীর উগ্র মূর্তি—নির্দয়ভাবে মারছে অসহায় একটা বুভুক্ষু মানুষকে। দয়ামায়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

তাই বলে কেদার—তাহলে ওই আখড়ার বাবাজীরা? ওরাও তো বৈষ্ণব, কিন্তু এমন কেন?

জগন্নাথ বলে—আজ অমনি ভেকধারী বৈষ্ণবদের জন্যই গৌরাঙ্গদেবের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের এই হাল হয়েছে। তাঁর বৈষ্ণবধর্ম আজ বিকৃত—লুপ্তপ্রায়। তাই ভদ্রসমাজে সকলে বৈষ্ণবদের আজ ব্যঙ্গ-টিটকারী দেয়।

না হলে ধর্মগ্রন্থে আছে শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র যেমন এক এক যুগে অবতার, তেমনি কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নররূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন নবদ্বীপের মায়াপুরে কলির মানুষকে উদ্ধার করতে।

তার অপ্রকট হবার পর ষড় গোস্বামীর রচনায়, প্রচারে তাঁর ধর্মমত সঠিক পথে প্রবাহিত হয়েছিল, তারপর নবদ্বীপের মায়াপুর তার পুণ্যভূমিকেও গঙ্গা গ্রাস করে—আর তাঁর ধর্মমতকে আজকের কিছু লোভী মানুষ নিজেদের স্বার্থে বিকৃত করেছে। ওরা যা বলে যা করে—ওই সব ধর্ম ধর্মগ্রন্থে তার স্বীকৃতিই নেই। প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম যা মানুষকে সত্যপথের সন্ধান দিতে পারে, মুক্তির পথ দেখাতে পারে তা আজ হারিয়ে গেছে।

জগন্নাথ দেখছে কেদারকে। বলে সে—খোকাবাবু, এখন এসব কথা হয়তো ঠিক বুঝবে না। বড় হও, লেখাপড়া করো, তখন সবই চেষ্টা করলে বুঝতে পারবে।

কেদার ওর সব কথা ঠিক বোঝে না। তবে তার মনে হয় আজ নতুন একটা তথ্য সে

জেনেছে, জেনেছে যে শ্রীকৃষ্ণই কলিযুগে চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। আর বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন—যার প্রকৃত অর্থ আজ বিকৃত হয়ে গেছে।

কেদারের সব প্রশ্ন তার বাবা—না হয় কুমার মামার কাছে। তাই বাবাকে সন্ধ্যায় জানায় ওই কথাগুলো। রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনেছে, শুনেছে শ্রীকৃষ্ণের নানা গল্প, রামচন্দ্রের কাহিনী। আজ শুধোয়—শ্রীচৈতন্যদেব কে বাবা?

আনন্দবাবু ছেলের এই প্রশ্নে অবাক হন। কেদার যেন অনেক কিছুই জানতে চায়।

আনন্দমোহনবাবু এখন নিজের ভবিষ্যৎ-এর কথা নিয়ে চিন্তিত। একটা কিছু করতে হবে। শ্বশুরমশায়ের বিষয় বৈভব থাকলেও তাঁকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে।

তাই ছেলের এসব প্রশ্নে আজ তেমন সাড়া দেন না। আর চৈতন্যদেব সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানও অতীব কম, তাই তেমন জবাবও পায় না কেদার।

এবার কুমার মামাকেই ধরে সে। কুমারবাবু কেদারের প্রশ্নে অবাক হয়—এবার কি ন্যাড়া বোষ্টম হবি ভাগ্নে—খুব মোচ্ছব সাঁটাবি! তার দরকার নেই। সামনে দুর্গাপূজো, দারুণ ভোজ হবে। পাঁঠার মাংস যত পারিস খাবি। আর পাঠশালা বন্ধ—এইসব হচ্ছে? পূজোর পরই এবার নতুন ইস্কুলই বসাবো এখানে।

কেদার সেখানেও কোন সদুত্তর পায় না। ওদিকে অভয়-কালি-হরিদাসের দলও এবার কেদারকে তাদের দলে টানে।

সেই তান্ত্রিকের কথা মনে পড়ে কেদারের। তার মড়ার খুলিতে নাকি দুধগঙ্গাজল দিলে সেই খুলি হাসে, প্রার্থীর মনোবাসনা পূর্ণ করে।

হরিদাস বলে—চল ছোড়দা, মজাটা দেখে আসি।

দুপুরবেলায় ওদের আশ্রম ফাঁকাই থাকে। আশ্রমের লোকজন আশপাশের গ্রামে ভিক্ষায় যায়। এই ফাঁকে কেদার নিজেই দুধগঙ্গাজল জোগাড় করেছে।

হরিদাস ডানপিটে—তবু ভুতের ভয় তার কম নয়। বলে সে—ভূতপেত্নীতে ধরবে না তো! ওদের অনেক পোষা ভূত-পেরেত আছে ছোড়দা!

কেদারের মনে এর মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস কিছু জন্মেছে। রামনাম সম্বন্ধে সে অনেক কিছুই জেনেছে শীতল তেওয়ারির কাছ থেকে, তার মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সেও অবহিত।

তাই কেদার বলে—রামনাম করবি, ভূতপেত্নী সব পালাবে।

হরিদাস বলে—সত্যি?

—হ্যাঁরে। চল তো।

কেদার সত্য ঘটনাই জানতে চায়। মড়ার মাথার খুলি সত্যি হাসে কিনা, না সব ওদের ভণ্ডামি তাই জানার জন্যই কেদার এসেছে তান্ত্রিকের আখড়ায়। আশ্রম এখন ফাঁকা—ঘরের মধ্যে বেদীতে সেই মড়ার মাথাটা রয়েছে। হরিদাস ভয়ে ভয়ে বাইরে রয়েছে।

কেদার মড়ার খুলিতে দুধগঙ্গাজল ঢালে, কিন্তু খুলি নির্বিকারই রয়ে যায়। কেদার ওদের ভণ্ডামির পরিচয়ই পেয়েছে। বলে সে—ওসব বাজে কথা রে, মড়ার খুলিতে দুধগঙ্গাজল দিলাম, হাসল না তো।

॥ ৬ ॥

শরৎকাল এগিয়ে আসছে। বর্ষার কালো মেঘগুলো এখন সরে গেছে। আকাশ ভরে ওঠে আলোয়। গাছগাছালির পাতায় সেই আলোর আভা। নদীর ধারে মাঠে মাটি ফুঁড়ে গজিয়েছে

কাশফুলের রাশি, যেন দিগন্তজোড়া শ্বেত উত্তরী কাঁপছে হাওয়ায়, বাতাস সাইবাবলা ফুলের গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছে, প্রকৃতির বুকে কোথাও এতটুকু মালিন্য নেই, গ্রামবাংলার রূপও অপরূপ হয়ে উঠেছে। এসেছে শরৎ। দিগন্তজোড়া ধানমাঠে সবুজ গালচে পাতা—মাঠ জুড়ে ধানগাছ এখন পুরুষ্টু। কোথাও সবুজ ধানে সোনালী রং লেগেছে।

সেদিন হরিদাস তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতেই দেরী করে পাঠশালে এসেছে। শিরপড়ুয়া মাধব সেদিন পণ্ডিতের কি কাজে একটু বাইরে গেছে, দ্বাররক্ষক রয়েছে সেদিন কার্তিক পণ্ডিত স্বয়ং। সে-ই হরিদাসকে দেখে।

এই ছেলেটা বেশ গোঁয়ার আর তেজী। নিজে কোনদিন কিছুই আনবে না পণ্ডিতের জন্য, উল্‌টে যেসব ছাত্ররা কিছু নজরানা আনে তাদেরও নিষেধ করে।

পণ্ডিত এহেন অবাধ্য ছাত্রকে সযুত করার কথাই ভাবছিল, আজ সেই সুযোগ পেয়ে বেশ কয়েক ঘা বেত মেরে একেবারে সকলের সামনে নাড়ুগোপাল করে বসিয়েছিল। নাড়ুগোপাল শাস্তিটা বেশ কঠিনই তার দৃশ্যটাও বড় অপমানজনক। বালগোপালের মত হামাগুড়ি দিয়ে বসতে হবে আর দুই হাতে নাড়ুর বদলে থাকবে দু'খানা আস্ত ফরমা ইট। বেশ কিছুক্ষণ থাকার পরই ইটের ওজনটা পাথর হয়ে ওঠে। তবু তাকে বহন করে রাখতে হয়।

হরিদাসের অপরূপ ওই দৃশ্য দেখে সহপাঠীরা হাসে। হরিদাস রাগে গর্‌গর্‌ করতে থাকে।

কেদার দেখে ভাই-এর ওই হেনস্থা। কিন্তু করার কিছুই নেই।

দুপুরবেলায় পণ্ডিতমশাই ছাত্রবাহিনীর আনা সবজী দুধ মাছের মুড়ো এসবের সদ্ব্যবহার করে বেশ নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে থাকেন। তাঁর বিকট নাসিকাগর্জন চলছে যেন গড়ের ব্যাণ্ড বাজছে, এদিকে শিরপড়ুয়া মোটা মাধব নামতা পড়াবার ছলে ঢুলছে, চারিদিকে গ্রাম্য পরিবেশ, সেখানে এসেছে ক্লান্ত দুপুরের নির্জনতা। কেদার দেখে তার ছোট ভাই হরিদাস চারিদিকে দেখে হাতের ইট নামিয়ে বের হয়ে যায়।

কেদারও বের হয়ে পড়ে। হরিদাস বোধহয় পালাবার মতলবই করেছে।

কিন্তু হরিদাস তা করবে না। অনেকদিনের রাগ তার মনে, সে এবার পণ্ডিতের অন্যায় অত্যাচারের জবাবই দেবে। বের হয়ে এসে হরিদাস সামনেই কাঠ-কাটা একটা ভোঁতা দা পড়ে থাকতে দেখে সেটাকে তুলে নিয়েই ওদিকে পণ্ডিতের ঘরের দিকে তাকায়।

এবার পণ্ডিতের ব্যবস্থাই করবে সে। ওলাইচণ্ডীতলায়, তাদের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময় সে দেখেছে পাঁঠাবলির দৃশ্যটা। কেমন উন্মাদনা জাগে, পণ্ডিতকে সেও অমনি করে বলিদানই দেবে।

পণ্ডিত এমনিতে বেশ ভোজনবিলাসী আর খেতেও পারে বেশী পরিমাণে। সেদিন আহারটা জুৎসই হয়েছে, ফলে তাঁর নাসিকাগর্জনও বেড়েছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে সে, সে ভাবতেই পারে নি যে তার কোনও ছাত্র গুরুমারা বিদ্যে অর্জন করবে।

হরিদাস নির্জন দুপুরে মৌকা পেয়ে সেই ভোঁতা দা নিয়েই এবার পণ্ডিতের ঘরে ঢুকে দা তুলেছে, শেষই করবে ওকে, কিন্তু পিছন থেকে কেদার এসে ওর হাতটা ধরে ফেলতে হরিদাস বলে—ছেড়ে দাও ছোড়দা, ওকে বলিদানই দেব—ছেড়ে দাও।

—না! হরিদাস—

হরিদাস হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে আর কেদারও ছাড়বে না। ধস্তাধস্তি চলছে আর হরিদাস গর্জন করে—ওকে কেটে ফেলবো! এত বড় হিম্মৎ, খালি মারবে! ওকে শেষ করে দেব।

ওদের চিৎকার-ধস্তাধস্তিতে পণ্ডিতের ঘুম ভেঙে গেছে। সে চমকে ওঠে, ওই দা নিয়ে তাকে শেষই করবে হরিদাস? ছাত্ররাও জুটে গেছে। শিরপড়ুয়া মাধব এসে পড়ে। হরি গর্জায়—ওই পণ্ডিত আর ওই মাধবকে শেষ না করি তো আমার নাম হরিই নয়।

কেদার কোনমতে সামলায় ভাইকে।

পণ্ডিত নির্বাক। হরিদাস শাসায়—আজ আটকালে, কিন্তু ওদের শেষ করবোই। মাধব ভয়ে সরে যায়।

পণ্ডিতের বুক কাঁপে অজানা ভয়ে, সে দেখছে দা-খানাকে। তার জীবন শেষই হতো—আর সেই ভয়ও রয়ে গেছে।

পরদিন সকালে ছাত্ররা যথারীতি পাঠশালে এসেছে। শিরপড়ুয়া খেজুরডালের বেত নিয়ে তৈরি। কিন্তু দেখা যায় পণ্ডিতের ঘরের দরজা হাট করে খোলা, দুটো কুকুর ল্যাজেমাথায় এক হয়ে শুয়ে আছে। কেউ কোথাও নেই, পণ্ডিতের মালপত্রও নেই, পণ্ডিতমশায়ও উধাও। ওই দা দেখেই পণ্ডিত দেশত্যাগী হয়েছে প্রাণের ভয়ে।

পাঠশালা বন্ধ।

এবার মাধবের পালা। হরিদাস সেই খেজুরছড়ির বেতটা দখল করে শূন্যে হাঁকায় আর তার দলবল বিজয় উল্লাসে চিৎকার করে—

পণ্ডিত হাওয়া—ছুটি, ছুটি—
গরম গরম রুটি!

ওরা যেন যমযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে আনন্দে কলরব করছে। কুমার রোজ সকালে তার প্রিয় ঘোড়ায় চড়ে মাঠ নদীর ধার ঘুরে আসে। সেও এসে পড়েছে ওদের কলরব শুনে।

দেখে ছেলেদের মধ্যে তার ভাগ্নেরাও রয়েছে। কেদারই কুমারের সবচেয়ে প্রিয়। পড়াশোনাতেও কেদার বেশ মেধাবী। কুমার ওকে একদিকে চুপ করে থাকতে দেখে শুধোয়—কি হল কেদার?

কেদার বলে—পণ্ডিতমশায় নেই, কোথায় চলে গেছেন। তাই পাঠশালা আর হবে না মামাবাবু।

—সে কি! পণ্ডিতমশাই চলে গেল কেন?

মামাবাবুর এই প্রশ্নের জবাব কিছুটা অনুমান করতে পারে কেদার। কিন্তু সেটা সঠিক নাও হতে পারে। তাই জবাব দিল না। বলে—এখন পড়াশোনাও আর হবে না মামাবাবু।

কুমার বলে—দেখছি কি করা যায়! ছেলেদের বলে—তোরা বাড়ি চলে যা।

নিজেও ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে যায়। হরিদাসই এবার ছড়ি হাতে পণ্ডিতের পরিত্যক্ত হাতলভাঙা চেয়ারটা দখল করে পণ্ডিতের অনুকরণে হাঁক পাড়ে।

—অ্যাই মেধো, নামতা ঘোঁষ, আর শিবে পা টেপ।

সে-ই আজ বিজয়ী রাজার মত ওই পরিত্যক্ত সিংহাসন দখল করেছে।

॥ ৭ ॥

বর্ষার শেষ—এসেছে শরতের আমেজ—গ্রামের আকাশে বাতাসে রং লেগেছে। আউশ ধান পাকছে—মাঠে নামে টিয়ার দল।

পূজো আসছে।

উলাগ্রামও বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম, পূজা উপলক্ষে সাজ সাজ রব পড়েছে। গ্রামে বেশ কয়েকটি দুর্গাপূজা হয় এ-পাড়া ও-পাড়ায়। তবে মিত্রমুস্তাফি বাড়ির পূজোই প্রধান।

এই গ্রামে পূজা উপলক্ষে পাড়ায় পাড়ায় যাত্রাগানও হয়। তারই মহড়া চলেছে। ভূধর পালের অবকাশ নেই। দুর্গাপ্রতিমা তৈরী হচ্ছে।

অভয়-কালিদের অবশ্য অভিযান ঠিকই চলেছে। তাদের সঙ্গে মাঝে মাঝে কেদারকেও যেতে হয়। দুপুরবেলায় তারা কোন বাগানে হানা দেয়—ফলপাকুড় যা থাকে তা পাড়ে, ইদানীং মৌচাক ভেঙে মধু খাবার চেষ্টাও করে তারা। বাড়িতে তাদের এই সব গোপন অভিসারের কথা কেউ জানে না। তারা তখন দিবানিদ্রায় ব্যস্ত।

সেদিন বাগানে একটা বড়সড় মৌচাকের সন্ধান আনে হরিদাস। তার বিহার যত্রতত্র, সেই নির্জন বাগানে ঢুকতে দিনের বেলাতেই ভয় পায় মানুষ।

অভয় বলে—মৌচাক ভাঙবো ঠিকই। কিন্তু ও তো গলায় দড়ির বাগান। ওখানে কে কবে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল, সে নাকি ভূত হয়ে আছে ওখানে। ব্যাটা ভূত যদি ঘাড় মটকে দেয়!

সত্যিই ভাবনার কথা। ভূতকে পারা দায়। তার জন্য এমন মধুর সঞ্চয় হাতছাড়া হতে চলেছে। কেদার বলে—ভূত কি করবে? রামনাম করবি দাদা—ভূত কিছুই করতে পারবে না।

কেদার বিশ্বাস করে, রামনামে সব বিপদই কেটে যায়। কিন্তু অভয়দের সেই বিশ্বাস নেই। তাই বলে, যদি সত্যি ভূত বাগ না মানে!

কেদার বলে—মানবেবই। তেওয়ারীজী কত ভূত দেখেছে, স্রেফ রামনাম করে, তাই ভূত তার কিছুই করতে পারে নি, আমরাও রামনাম করবো, দেখবি কিছুই হবে না।

সেই রামনাম করতে করতে ওরা বাগানে যায় মধুর সন্ধানে। অভয় গাছে উঠেছে। ধোঁয়া দিয়ে মৌমাছি তাড়াবার আয়োজনও করা হয়েছে। কিন্তু বুনো মৌমাছির দল ক্ষেপে উঠে এবার ওদেরই আক্রমণ করে।

পড়ে রইল মৌচাক। মৌমাছির কামড়ে অস্থির হয়ে ওরা দৌড়লো। ভূতের ভয় তখন মাথায় উঠেছে, এখন পরাণ বাঁচানোই বড় কথা। তাড়া করেছে মৌমাছির দল—যথেচ্ছ ভাবে হুল ফুটিয়েছে তারা ওদের ক'জনকে। কোনরকমে বের হয় তারা বাগান থেকে।

আর বাড়ি ফিরেই শয্যা নিতে হয়। সর্বাঙ্গ ফুলে গেছে, সারাদেহে হুলের অসহ্য জ্বালা। এবার জগৎমোহিনী বিপদে পড়ে।

কুমারও দেখেছে ছেলেদের। সেই-ই কবরেজমশায়কে ডেকে এনে ওষুধের ব্যবস্থা করে। এদের তখন ধুম জ্বর। শিবুর চর-অনুচর সর্বত্র।

শিবু ঝিই খবর আনে—দিনভোর গাছে গাছে বাঁদরামি করবি, বোঝ এইবার! বাগানে মৌচাক ভাঙতে গেছলি তোরা, বলবো কর্তাবাবাকে?

কর্তাবাবা অর্থাৎ মিত্রমুস্তাফি মশাই এমনিতে বেশ গম্ভীর রাশভারী ধরনের মানুষ। সকলেই তাঁকে সমীহ করে চলে। কুমারমামাই বলে—ওসব থাক শিবুদি, এখন এদের সুস্থ করে তোল।

শিবু গজগজ করে—দিনরাত বাঁদরামি চলবে?

কুমার বলে—না। পুজোর পরই পাঠশালার ব্যবস্থা করছি। কটা দিন একটু সামলে রাখো এদের।

মামাবাবু সে যাত্রা দাদুর হাত থেকে এদের রক্ষা করেন। জগৎমোহিনীও বলে—তাই কর দাদা। ছেলেগুলো যেন বাঁদর হয়ে উঠছে দিনকে দিন।

গিন্নীমা নাতিদের খুবই স্নেহ করেন। বলেন—বাছারা জ্বরে কাঁপছে, এখন ওসব কথা ছাড়। ছেলেপুলেরা এমন এক-আধটু করেই বাপু।

অভয় জ্বরে কাঁপছে। বলে সে—আর এসব করব না।

মিত্রমুস্তাফি মশায় শুধু ওই গ্রামেরই নন—এই এলাকার নামী-দামী লোক।

নানা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আর দানধ্যানও করেন। তাই তাঁর কাছে বহু মানুষ আসে নানা

প্রার্থনা নিয়ে। এই গ্রামের বেশ কিছু মানুষ আসে ঈশ্বর মুস্তাফির কাছারিতে, তার খাস কামরাতেও বসে তারা।

তামাকের ঢালা ব্যবস্থা, দামী তামাক মেলে এখানে। সেই লোভেই নয়—বড়লোকের মোসাহেবী করে নিজের আখের গুছিয়ে নেবার লোকেরও অভাব নেই। তাই অনেকেই আসে।

মদন চক্কোত্তী তাদেরই একজন। কিছু ধানজমি আছে, তাতেই তার সংসার কোনমতে চলে। ছেলেটা কোন জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করে। তাকে এখানে যদি বসানো যায়, তার জন্যও ঘুরঘুর করে। আর নায়েব হরষিত ঘোষের কাছেও বলে কথাটা।

হরষিত ঘোষ বলে—দ্যাখো কর্তাকে বলে।

মদন চক্কোত্তী সেই মতলবেই ঘুরছে। কর্তাবাবুর কাছে রামভক্ত হনুমানের মত বসে থাকে।

সকালে সেদিন পূজার ফর্দ, কি কি অনুষ্ঠান হবে তারই আলোচনা চলছে। এই অঞ্চলে ঈশ্বর মিত্রের বাড়ির পূজার নামডাক আছে। এখানে খুবই সমারোহ ধুমধাম হয়।

মদনই বলে—দত্ত বাড়িতে শুনলাম গ্রামের দলের যাত্রা হবে।

মিত্রমুস্তাফি বলেন—তাহলে রানাঘাটের তারিণীর দলের যাত্রাগানের বায়না করো নায়েব। আর সেরা কবিয়াল দুজনকে আনাও, যেন জোর পাল্লা হয়।

মদন চক্কোত্তী বলে—ওর জন্য ভাববেন না কর্তাবাবু, তারিণীর দলের ম্যানেজার আমার বন্ধু, ও হয়ে যাবে। আর কবিয়াল তো আনবোই। সেইসঙ্গে রানাঘাট থেকে দত্ত মশায়কেও আনবো—কালোয়াতি গানের আসর হবে। পূজোর গানবাজনা হবে সরেস, কিন্তু কর্তাবাবু, হাজার পাঁচেক টাকা খরচ পড়বে।

ঈশ্বর মিত্রমুস্তাফি সব বিষয়েই সবার চেয়ে উপরে থাকতে চান। পূজার উৎসবেও তাই আয়োজনের কোন ত্রুটি রাখতে চান না। তিনি বলেন—নায়েব মশাই, চক্কোত্তীকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দাও। ও সব ব্যবস্থাদি করে আসুক আর রাহাখরচা বাবদ একশো টাকা দাও।

মদন চক্রবর্তী জানে কি ভাবে সুঁচ হয়ে ফাল চালাতে হয়। তাই নায়েবমশায়ের কাছে এসে তার কাছে টাকাটা নিয়ে তার থেকে শ'পাঁচেক টাকা নায়েবমশাইকে দিতে হরষিত তার দিকে চাইল।

মদন বলে—ওটা রাখুন নায়েবমশাই। কাজ ঠিক হবে—ওটা আপনার।

অর্থাৎ এবার দুজনে সমবেতভাবে পূজার উৎসবের ঘটা থেকে বেশ কিছু সরাবার পথও করে। মদনও জানে কানের জল বের করতে হলে কানে আগাম কিছু জল দিতে হয়। সেই কাজই করলো সে।

সারা উলাগ্রামে উৎসবের ঢল নামে। দুর্গাপূজা উপলক্ষে সারা গ্রাম মেতে উঠেছে। পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়। ঢাকের বাদ্যির চোটে আকাশবাতাস কেঁপে ওঠে।

সবচেয়ে বেশী সমারোহ হয় মিত্রমুস্তাফির বাড়িতে। পূজোর দালান দুর্গামন্দির আলাদা। বিরাট থামওয়ালা চণ্ডীমণ্ডপ। চারিদিকে কাছারিবাড়ির টানা ঘরগুলো তিন দিকে ঘেরা। আরও বিরাট উঠোন, সেখানে ছোট বড় দুটো হাড়িকাঠ পোঁতা। একটাতে ছাগ—অন্য বড়টাতে মোষ বলি দেওয়া হয়।

সে এক বিচিত্র দৃশ্য। পাঁঠাগুলোকে জলে স্নান করিয়ে এনে পুরোহিত মন্ত্র পড়ে উৎসর্গ করে দেয়। গলায় মালা পরিয়ে তাদের ঠেসে ওই হাড়িকাঠ পুরে দেয় আর হন্তারকও রামদা নিয়ে মায়ের জয়ধ্বনি দিয়ে এক-একটা ছাগলকে বধ করে চলে।

আর মোষ-বলিও আরও বিরাট ব্যাপার। মোষের কাঁধে ঘি মালিশ করা হয় দীর্ঘক্ষণ ধরে,

তারপর দড়িদড়া বেঁধে বাঁশ-এর চাপ দিয়ে বেশ কয়েকজন মিলে মোষটাকে বড় হাড়িকাঠে পোরা হয়। এই সময় মোষে-মানুষে বেশ কিছুক্ষণ যুদ্ধ চলে। কয়েকশো মানুষ দেখে সেই যুদ্ধ। তারপর হস্তারক বিশাল খাঁড়া নিয়ে বলিদানপর্ব শেষ করে। ঢাকঢোল বেজে ওঠে। সোচ্চার উল্লাসে নাচন শুরু হয়। সকলের কপালে রক্তের ওই ফোঁটা—এ যেন এক পৈশাচিক ব্যাপার। কেদারের এসব মোটেই ভালো লাগে না। অহেতুক এই হত্যা তার কাছে মনে হয় নিষ্ঠুরতাই।

অবশ্য অন্যদের কাছে এটা খুবই আনন্দের ব্যাপারই। বেশ তারিয়ে তারিয়ে এই ক'দিন মাংস প্রসাদও মেলে তাদের। কেদার ওসব খেতেই পারে না। তার মনে পড়ে ওই পশুদের আর্ত চীৎকার। সে সরে যায় তখন।

অবশ্য নবমীর দিন আর একটা অনুষ্ঠানও হয়। দোতলার বারান্দায়, ছাদে লোকজনের ভিড়। নিচের ফাঁকা জায়গায় হাতি শিবচন্দ্রকেও সাজানো হয়েছে, আর তার দাঁতদুটোতে লোহার ঠোঙা পরানো—তার প্রতিদ্বন্দ্বী একটা মোষ। তার শিং দুটোতেও তেমনি লোহার ঠোঙা।

ওদের দুজনের লড়াই শুরু হয়। হাতিটা আক্রমণ করে মোষকে, মোষও এবার রুখে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, শিং দিয়ে আঘাত করতে চায় হাতিকে কিন্তু পারে না। ঢাকঢোল বাজে—লড়াই চলতে থাকে।

দিনের বেলাতে এইসব চলে আর সন্ধ্যার পর গ্যাসবাতি—ডেলাইট—বেলোয়ারি ঝাড়ের বাতি জ্বলে। নাচঘরে গান চলে।

রানাঘাট-শান্তিপুর থেকে ধনী অনেক অতিথি দামী ফরাসডাঙার চুনোট করা ধুতি-গরদের পাঞ্জাবিতে হীরার বোতাম হার এসব লাগিয়ে—কেউবা চোগাচাপকান, কলকাদার শাল—মাথায় জরির তাজ পরে মিত্রবাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে আসেন। ওঁরা আসেন নৌকায়, বজরায়, না হয় ফিটনে।

এ বাড়ির দারোয়ান পাইক বরকন্দাজদের সাজও তখন দেখবার মত। তাদের পরনে আচকান মাথায় পাগড়ি—ন্যাপাসর্দারও সেজেগুজে পাহারাদারদের কাজ তদারক করে। কোথাও যেন কোন ত্রুটি না থাকে।

যাত্রার আসরে তখন ঈশ্বর মিত্রমুস্তাফী ভেলভেটের গদিতে আসীন, আশেপাশে নিমন্ত্রিতের দল আর তাঁর নিজস্ব মোসাহেব বাহিনী। ফুরসী টানেন মিত্র মশায়।

মদনের বেশবাসও দেখার মত। পরনে কালো কার্তিকপাড় ধুতি-পাঞ্জাবি, গলায় দড়ি পাকানো চাদর। মিত্রমুস্তাফি বলেন—যাত্রা ভালোই গাইছে—কি বল হে!

মদন কেন অন্য মোসাহেবের দল বলে—যথার্থ বলেছেন হুজুর।

হরষিত ঘোষ বলে—মদনবাবুর পছন্দ, হবে না?

মদন এখন বড় হুজুরের খুবই কাছের মানুষ। তন্ময় হয়ে ওরা যাত্রা শুনছে। বেহালাদার তখন আসর নিয়ে নিজের কেরামতি দেখাচ্ছে। হাতে নয়, পা দিয়ে ছড় টেনে সে বেহালার সার্কাস দেখাচ্ছে।

ঈশ্বর মুস্তাফি দুটো দশ টাকার নোট তার দিকে লক্ষ্য করে হাওয়ায় ভাসিয়ে দেন।

ওদিকে মাঝরাত থেকে শুরু হয় জনসাধারণের জন্য কবিগানের আসর। ঢোল বাজে গান চলে রাতভোর। কেদার সেখানেও শ্রোতা।

উৎসবের এই আনন্দপ্রবাহের মাঝেও আনন্দমোহন কেমন নিরানন্দ হয়ে বসে আছেন। ক'বছরই পার হয়ে গেছে এখানে, এখনও কিছু করা যায়নি। এবার একটা সুযোগ এসেছে।

মুর্শিদাবাদে তখনও বেশ বড় বাজার। ওখানেই ব্যবসাপত্র করতে চান। যোগাযোগও হয়েছে। ব্যবসা ঠিকমত চালাতে পারলে ভাগ্য ফিরে যাবে। মুর্শিদাবাদে রেশমশিল্প, কাঁসার বাসন এ সবে বাজার সর্বত্র।

এবার আনন্দমোহন বিশু মুখুয্যেকে তাড়া দেন—সেই টাকাটা যদি এখন ফেরত দেন আমার কাজ লাগে!

বিশু মুখুয্যে সেই কতদিন আগে তার বিষয়-আশয় মহাজনের খপ্পর থেকে বাঁচাবার জন্য ওই টাকা নিয়েছিল, বলেছিল, ছ'মাসের মধ্যেই শোধ দেবে। দু'তিনটে ছ'মাস কেটে গেছে, বিশু মুখুয্যে সেই টাকা আর দেয়নি। নানা টালবাহানাই করে চলেছে।

আর এ বাড়িতে সে আসেও কম। এখন অন্য পাড়ার কোন জমিদারের বৈঠকখানায় আড্ডা দিতে যায়। তাকে এখন আনন্দমোহনের দরকার, তাই সকালেই বিশু মুখুয্যের বাড়িতেই হানা দিতে হয়।

বিশু মুখুয্যে অমায়িক ভদ্রলোক। সে বলে—নিশ্চয়ই দেব আপনার টাকা। কাল—না পরশু সকালে আসুন।

এইভাবে ক'দিন আনন্দবাবুকে ঘুরিয়েছে সে।

এবার আনন্দবাবু বলেন—কালই চাই টাকা। কাল দুপুরেই মুর্শিদাবাদ যেতে হবে।

বিশু বলে, তাই হবে।

আনন্দমোহন অনেকে আশা নিয়েই এসেছে। টাকাটা পেলে তার সুরাহা হয়। ব্যবসায়েতে লাগাবেন।

কিন্তু বিশু মুখুয্যের বাড়িতে এসে শোনেন তিনি যে বিশু মুখুয্যে মাসখানেকের জন্য তীর্থে চলে গেছে। টাকাও রেখে যায়নি। আনন্দমোহন হতাশই হন।

সব প্ল্যান তাঁর ভেস্তে যাবার উপক্রম, ব্যবসাও করা যাবে না। হতাশ হয়ে বাড়ি ফেরেন।

এই বড়বাড়িতে তখন সমারোহ চলেছে। তাঁর দুঃখ হতাশা বোঝার মত রয়েছে মাত্র একজন। সে তাঁর স্ত্রী জগৎমোহিনী। সেই-ই শুধায়—কি ব্যাপার। টাকা পেলে?

জগৎমোহিনী সব ব্যাপারই জানে। স্ত্রীর কথায় আনন্দমোহন বলেন—নাহ্! বিশু মুখুয্যে টাকা দেয়নি, তীর্থে চলে গেছে। কবে ফিরবে তার ঠিক নেই। ব্যবসা করা আর হবে না কেদারের মা।

—কেন হবে না?

স্ত্রীর কথায় আনন্দমোহন বলেন—টাকা কোথায়? ওই টাকার উপর ভরসা করে মুর্শিদাবাদের মহাজনকে বলেছিলাম মাল দেবার জন্য, সে টাকা তো পেলাম না।

জগৎ বলে—এত ভেঙে পড়ছ কেন? টাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

আনন্দমোহনও জানেন ব্যবস্থা কি করবে তার স্ত্রী। তারও এভাবে স্ত্রীর টাকা নিতে বাধে। বলেন তিনি—তোমার টাকা একবার নিয়ে তো দিতে পারিনি এখনও। আবার যদি দিতে না পারি?

জগৎ হাসে। বলে সে—এবার তো ব্যবসার জন্য নিচ্ছ, ঠিক দিয়ে দেবে। এ নিয়ে তুমি ভেবো না। যাবার আয়োজন করো। টাকার যোগাড় হয়ে যাবে। দেখবে ব্যবসাতে লাভও হবে। তখন ফেরৎ দিও টাকাটা।

আনন্দমোহন বলেন—সত্যি জগৎ, তোমার জন্য কিছুই করতে পারিনি। অথচ তুমি—

জগৎ বলে—ওসব কথা বলে আমাকে অপরাধী করো না। স্ত্রীর কর্তব্যটুকু করছি মাত্র।

আমার টাকা তো তোমারই। তবে এসব কেন বলছ!

পূজার বিসর্জনও এখানে দেখার মত। সারাগ্রামের সব প্রতিমা নিরঞ্জনের জন্য আনা হয় ছায়াঘন চূর্ণি নদীর তীরে। সর্বাগ্রে আসবে মিত্রমুস্তাফি বাড়ির প্রতিমা। বাদ্যভাণ্ডসহকারে বিশ কাহারের কাঁধে চেপে সেই প্রতিমাকে গ্রাম ঘুরিয়ে এনে নদীতে বিসর্জন দেওয়ার পর অন্য সব প্রতিমা জলে পড়বে। নদীর ধারে হাজার হাজার মানুষ আসে—দোকানপশারও বসে। মেলা শুরু হয়।

নৌকায় বজরায় ঘোরে অনেকে। কেদার-অভয়দের পোশাকও ক'দিন বদলে যায়। ভালোমন্দ খাওয়া আর মখমলের উপর জরির কাজ করা পোশাক ওদের অঙ্গে। উৎসবের ক'দিন কোন্‌দিকে কেটে যায় তার হদিশ থাকে না।

মনে হয় রোজ এমনি উৎসব হলে ভালোই হতো। কিন্তু তা হয় না। দশমীর দিনই সব উৎসব ফুরিয়ে যায়। বাবা এতদিন ছিলেন কেদারের সঙ্গী। এবার তিনিও চলে যাচ্ছেন মুর্শিদাবাদে।

কেদারের চোখে জল নামে। সব যেন শূন্য হয়ে যায়। সন্ধ্যার পর আর রামায়ণ-মহাভারতের গল্প তাকে শোনাবে না। ধ্রুব-প্রহ্লাদ-পরীক্ষিতের কাহিনীও কেউ বলবে না।

কুমারমামা তবু রয়েছে—এই যা ভরসা। কিন্তু কুমারবাবুও বসে নেই। এর মধ্যে কৃষ্ণনগরে যোগাযোগ করেছেন। তাঁকেও নানা কাজে সদরে যেতে হয়। সেখানেই পরিচিত হন তিনি মিঃ ব্যারোটের সঙ্গে। মিঃ জো ব্যারোট ছিলেন আসলে ফরাসী, তখন চন্দননগরে ফরাসী উপনিবেশ ছিল। মঁসিয়ে ব্যারোটও কুমারবাবুর কথায় আকৃষ্ট হয়ে এই দূর বীরনগর উলাগ্রামে এসে শিক্ষকতার ভার নেন।

এবার পাঠশালার রূপটা কিছু বদলে যায়। এখন আর মাটির ঘরে গ্রামের সর্বজনকে নিয়ে সেইভাবে পড়ানো হয় না। মিত্রমুস্তাফি মশায়ের বিরাট কাছারিবাড়ির একদিকে একটা ঘরে ব্যারোট সাহেবের ইংরাজী স্কুল চালু হয়ে গেল কুমারবাবুর চেষ্টায়।

এবার আবার অভয় কালি কেদার হরিদাস স্কুলের গণ্ডীতে বাঁধা পড়লো।

কেদারেরও ভালো লাগে এই ব্যারোট সাহেবকে, কার্তিক পণ্ডিতের মত নিষ্ঠুর তো নয়ই—লোভীও নয়। এখানে নজরানার কোন ব্যাপারই নেই। কেদার ইংরাজী পড়ার মধ্যে ডুবে গেল। সঙ্গে বাংলা, ইতিহাস এসব তো আছেই। আর রোজ সন্ধ্যাটা কেমন শূন্য লাগে। বাবা থাকতে সন্ধারতির পর রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুরু হতো।

ভক্ত প্রহ্লাদের উপর অত্যাচারের কাহিনী, তার হরিভক্তির কথা শুনতো মন দিয়ে, সব বিপদে কৃষ্ণই তাঁর ভক্তকে রক্ষা করেন। প্রহ্লাদের অপূর্ব সেই ভক্তি আর ধ্রুবর কাহিনী, মহারাজ পরীক্ষিতের কাহিনী এসব কথা—সীতা, সাবিত্রীর কাহিনীও শুনেছে সে।

দিদিমার ঘরে কয়েকটা পুঁথি আছে—রামায়ণ-মহাভারত এসবও এখন মাঝে মাঝে পড়ে আর বাবার কথা মনে পড়ে। বাবা তখন দূর মুর্শিদাবাদে গেছেন ভাগ্যান্বেষণে।

আনন্দমোহন আশা করেছিলেন বিশু মুখুয্যে তাঁকে টাকাটা ফেরত দেবে। সেদিন নিছক তার বিপদে সাহায্য করার জন্যই টাকাটা দিয়েছিলেন। সেদিনের হিসাবে আড়াই হাজার টাকা কম নয়। সেটা পেলে কাজে লাগবে।

কিন্তু বিশু মুখুয্যে তার দায় উদ্ধার হয়ে যেতেই আবার সম্পূর্ণ অন্য মানুষে পরিণত হয়। কোন লেখাপড়াই নেই সেই টাকার।

ফলে দু-চারবার আনন্দবাবুকে নানা ঢালবাহানা করে ঘুরিয়ে তারপর একদিন বিশু মুখুয্যে স্রেফ ঝেড়ে ফেলে দেয়। বলে সে।—কিসের টাকা আনন্দবাবু? আপনার কাছ থেকে কোন টাকাই তো নিই নি।

—সে কি! আনন্দবাবু অবাক হন।

—কিছু কাগজপত্র আছে? বিশু মুখুয্যে এবার বলে কথাটা। কাগজপত্র কিছুই নেই। বিশু মুখুয্যে বিজ্ঞের মত বলে—এতগুলো টাকা কেউ কাগজ না করে দেয়? দয়া করে আর টাকার কথা তুলবেন না। ওসব মিথ্যা কথা নিয়ে আলোচনা করাও ঠিক নয়। অর্থাৎ আর টাকা সে দেবে না এইটাই জানিয়ে দেয়।

আনন্দবাবু এসব কথা আর কাউকে বলতে পারেন না। বলেন শুধু স্ত্রীর কাছেই—একি সর্বনাশ করলাম তোমার কেদারের মা!

জগৎমোহিনীও সব জানে, বলে—এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ কি, এত ভেঙে পড়লে চলবে না।

—কিন্তু মুর্শিদাবাদে ব্যবসা করতে যেতাম—সব কথা হয়ে গেছে।

জগৎমোহিনী বলে—যাবে।

—কিন্তু মূলধন!

—তার যোগাড় হয়ে যাবে।

—কি বলছ?

—হ্যাঁ গো। জগৎমোহিনী বলে—আমার কিছু টাকা পড়ে আছে, এটাই ব্যবসাতে লাগাবে। হাজার দুয়েক দিতে পারবো।

তবু আনন্দমোহন ইতস্তত করেন।—যদি মার যায় আবার? না-না। ও টাকা তোমার থাক। তোমাকে কিছু দিতে পারিনি—নেব আবার এত টাকা?

জগৎ স্বামীকে খুবই শ্রদ্ধা করে। তাঁর শুকনো মুখ সে দেখতে পারে না। তাই বলে—নেবে। দেখবে ওই সব লোকসান তোমার পুষিয়ে যাবে।

॥ ৮ ॥

আনন্দবাবু এসেছেন মুর্শিদাবাদে। মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারে তখন রেশমের শাড়ি-কাপড় এসবের বড় বাজার। শাঁখ পিতলকাঁসার বাসন তৈরীর বড় বড় কারখানাও রয়েছে। কলকাতা কাশীর মহাজনরা এখানে আসে মালপত্র খরিদ করতে। ঔরঙ্গাবাদ চক ইসলামপুর এসব দূর অঞ্চলের তাঁতিরা দামী রেশমী কাপড় আনে। হাজার হাজার টাকার কেনাবেচা হয়। আনন্দমোহনও তাঁতিদের কাছ থেকে ওইসব কাপড় কেনেন—বিদেশী সাহেবরাও গনুটিয়া মুনিয়াডিহি ইসলামপুর ডোমকল এসব অঞ্চলে বিশাল রেশমের কুঠি তৈরী করে হাজার হাজার টাকার দামী কাপড় বিদেশে চালান দেয়।

সেই কর্মকাণ্ডে আনন্দমোহনও নিজের চেষ্টায় ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা করেন। এ যেন এক সংগ্রামই।

আনন্দমোহন উলাতে এসে ভালোমানুষি দেখাতে গিয়ে এক ধাক্কায় আড়াই হাজার টাকা জলাঞ্জলি দিয়েছেন। আবার স্ত্রীর টাকা নিয়ে এই ব্যবসাতে নেমেছেন, যেভাবেই হোক তাঁকে এই লড়াই জিততেই হবে।

তাঁর স্ত্রী-পুত্রের মধ্যে একটি মেয়েও এসেছে—তাঁর সংসারে সেই পুত্রকন্যাদের ভবিষ্যৎ-এর সংস্থান করতে হবে। চিরকাল শ্বশুরবাড়িতে তাদের রাখা আনন্দমোহনের মনঃপূত নয়।

তাই তিনি দূর-দূরান্ত গ্রামে যাতায়াত করে কিছু তাঁতীদের দাদন দিয়ে রেশমী কাপড় কেনেন—বাজারে বিক্রী করেন, কিছু লাভ থাকে—তাই স্বপ্ন দেখেন আরও বড় ব্যবসা করবেন তিনি। নিজের ভাগ্য ফেরাতে হবে।

সব মানুষই চায় নিজের ভাগ্য ফেরাতে। আর এক-একজনের পথও এক এক রকমের। হরষিত নায়েব আর শশী গোমস্তা এখন মিত্রমুস্তাফি এস্টেটের যেন সর্বময়কর্তা হয়ে উঠেছে।

পুণ্যাহের সময়। এইদিন কাছারিবাড়িতে মহাসমারোহ হয়। সব মহাল থেকে বিশিষ্ট প্রজা—ছোট বড় পত্তনিদাররা আসে। বিশাল কাছারিবাড়ি—অতিথিশালা তাদের ভিড়ে ভরে ওঠে।

এইদিন প্রজারা বাকী খাজনা মিটিয়ে দেয়। বেশ কিছুদিন আগে থেকেই এই উৎসবের আয়োজন চলে। মাঝে মাঝে ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রমশায়ও নিজে দু-একটা মহালে যেতেন। হাতি শিবচন্দ্রকে সাজিয়ে তার পিঠে হাওদা বসিয়ে পাইক পেয়াদা সহকারে যেতেন তিনি।

কখনও নিজস্ব বজরাতে যেতেন। চূর্ণি নদীর ঘাটে তাঁর খাস বজরা পানসী এসব মজুত থাকতো। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স হয়েছে, তাই নিজে আর বিভিন্ন মহালে যেতে পারেন না।

কুমার অবশ্য এখন সেরেস্তায় বসেন। তবে হরষিত ঘোষ দেখেছে ছোট হুজুরের সখ কালোয়াতি গান-বাজনার দিকেই বেশী। এছাড়া মহালে দু-একটা স্কুলও করে দিয়েছেন, কুমার নিজেও কিছু মহালে যান।

খাজনাপত্র কি আদায় করে নায়েব-গোমস্তারা—তার জমাবন্দী হিসাব বড় একটা দেখেন না। প্রতি মহালেই বেশ কিছু খাস জমি বাগান পুকুর আছে। হরষিত নায়েব গোপনে বেশ প্রচুর টাকার বিনিময়ে তাদের পাট্টা বিলি করে দেয়, কুমারবাবু সে সবের খবরও পান না।

তবু দেখেছেন কুমার দূরগ্রামে পথঘাট নেই, স্কুল নেই, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই নেই। প্রজারা বলে—এসবের কিছু ব্যবস্থা করুন ছোট হুজুর। আপনি না বাঁচালে বাঁচবো না।

কুমারবাবু বলেন—নায়েবমশাই, একটা ডাক্তারখানা খোলার ব্যবস্থাই করুন।

নায়েব জানে এমনি খরচের পথ বের হলে সেই পথে খরচের নামে বেশ কিছু টাকা পকেটে আসবে, সেইজন্য খুশী হলেও মুখে কপট জমিদার-প্রেমের ভান দেখিয়ে বলে—টাকা জলে দেবেন ছোট হুজুর? বড় হুজুর যদি কিছু বলেন?

কুমার বলেন—বাবাকে আমি মানিয়ে নেব। আপনি দাতব্য চিকিৎসালয়ের ব্যবস্থা ক ওই মহালের স্কুলের জন্যও কিছু টাকা দেবেন।

—যে আজ্ঞে। হরষিত ঘাড় নাড়ে।

তারপরই তার খেল শুরু হয়। দাতব্য চিকিৎসালয় দু'দিন পরই উঠে যাবার উপক্রম, স্কু বন্ধ হবার জোগাড়, কিন্তু মাস মাস খয়রাতির মোটা টাকা খরচ দেখানো হয় আর তার সিংহ যায় হরষিত নায়েবের পেটে। বাকীরা ছিটেফোঁটা অবশ্যই পায়।

বৎসরে ওই পুণ্যাহের দিন বিভিন্ন মহালের বিশিষ্ট প্রজা-পত্তনিদাররা আসে।

পুণ্যাহের দিন সারা বাড়ি দামী ঝাড়লণ্ঠনের আলোয় ভরে ওঠে। মেঝেতে গালচে পাতা হ ওদিকে কিংখাবের গদিমোড়া চেয়ারে বসেন ঈশ্বর মিত্রমুস্তাফি। তাঁর পরনে দামী সাটিনে মেরজাই, মাথায় জরির তাজ—রুপোর আতরদানে দামী গোলাপজল ছড়ানো হয়, সামনে রুপোর বিশাল পরাতে টাকা মোহর নজরানা দেয় প্রজাপত্তনিদাররা।

নায়েব হরষিতও সেজেগুজে ওদিকে জাবেদা খাতায় হিসাব তোলে। আর সোঁ ন্যাপাসর্দারের পরনেও নতুন পোশাক, পাইক-পেয়াদারাও সেজেগুজে হাজির।

ভোর থেকে মাঙ্গলিকী সানাই বাজে, মন্দিরে বিশেষ পূজাপাঠের আয়োজনও হয়।

কেদার দেখে সেই বৈভব। মূল ফটকে সেদিন হাতি শিবচন্দ্রকেও মাথা থেকে শুঁড় অবধি জরির কাজ করা আবরণ দিয়ে সাজানো হয়।

অনেকে হাতি শিবচন্দ্রকেও সিনি আনি দু'আনি নজরানা দেয়। সে শুঁড়ে করে কুড়িয়ে সেগুলো মাহুতকে দেয়। ওটা তার প্রাপ্য। বিনিময়ে সেদিন শিবচন্দ্রের প্রচুর পরিমাণ খেচরান্ন-পরমান্ন সবজীও মেলে। কারণ সেদিন সকলের জন্য এখানে অন্নসত্র খোলা হয়।

কেদারের চোখে এই প্রাচুর্যটা চোখে পড়ে। মনে হয় এর অনেকখানিই যেন অপচয়ই। বাবা নেই।

এখন সন্ধ্যার পর কেদার যায় কুমারমামার কাছে। এখন সে ব্যারোট সাহেবের প্রিয় ছাত্র। ইংরাজীতে বেশ দখল আসছে।

কুমার বলেন—ভালো করে পড়াশোনা কর কেদার। তোকে কৃষ্ণনগরের ইংরাজী কলেজে—তারপর কলকাতায় কলেজে পড়তে পাঠাবো।

—কলকাতায়? অবাক হয় কেদার। কলকাতা কোন এক বিরাট স্বপ্নরাজ্য তার কাছে। কুমারবাবুদের এক আত্মীয় থাকেন কলকাতার সদ্য গড়ে ওঠা ভবানীপুর অঞ্চলে। পাকা রাস্তা—বিশাল অট্টালিকা—কত বিদেশী ইংরাজ গোরাদেরও ভিড় সেখানে। রাতেও দিনের মত ঝকঝকে গ্যাসের আলো জ্বলে। কত বড় বড় পণ্ডিতের ভিড়।

কুমারবাবু বলেন—কলকাতায় না গেলে পড়া ঠিক হবে না। কত বড় বড় স্কুল-কলেজ আছে সেখানে। ইংরাজী শিখতে হবে তোকে। মস্ত বড় মানুষ হবি তুই।

মঁসিয়ে ব্যারোটও বলেন—টুমি খুব ইনটেলিজেণ্ট আছে কেডার। এ গুড স্টুডেণ্ট।

কেদারকে তাই তার দাদা অভয়, কালি, ছোট ভাই হরিদাসও যেন একটু সমীহ করে চলে। ওদিকে তখন কার্তিক সরকারের পাঠশালাও উঠে গেছে। ওদের আর পাঠশালার তাড়া নেই। তখন দিনদুপুরেও তাদের অভিযান শুরু হয় বাগানে—এখানে ওখানে। ফলপাকুড় তো পাড়বেই—গাছে আমের বোল এসেছে। অভয়-হরিপদের দল বাগানে ঘোরে—মাঝে মাঝে কেদারকেও দলে নেয় তারা।

ব্যারোট সাহেবকে তখনও পাননি কুমারবাবু, বাবা ঈশ্বরচন্দ্রকেও বলেন তিনি এখানে একটা স্কুল করার কথা। ঈশ্বর মিত্র তাঁর একমাত্র সন্তানের এইসব খেয়ালের কথা জানেন।

বহু মহাল মৌজাতে সে স্কুল, দাতব্য চিকিৎসালয় করেছে, মাস মাস হরষিত নায়েব সে সবের জন্য মোটা টাকাই খরচ দেখায়।

ক্রমশ আদায়ী খাজনার অনেকখানিই ওসব খাতে বের হয়ে যায়। এখন বাজারে জিনিসপত্রের দামও বাড়ছে। জমিদারী ঠাটবাট এতদিন অনায়াসেই বজায় রাখা গেছল, কিন্তু খাজনা আদায়ও কমছে, প্রজারা নাকি প্রতিবছর হয় খরা, অজন্মা—না হয় বন্যার প্রকোপে পড়ছে। খাজনা আদায়ও বেশ কমছে।

ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এবার ভাবনায় পড়েন। তবু ছেলের কথায় বলেন—দ্যাখো তেমন বিদেশী মাস্টার যদি পাও। আর নিজেও এবার ফি সন মহালে ঘোরো। আদায়পত্র ঠিক ঠিক হচ্ছে না কুমার।

কুমার বলেন—দেখছি বাবা। নায়েব কাকা তো যান—

ঈশ্বর বলেন—নিজের জমিদারী, সরকারকে এত টাকা মাল-গুজারী ট্যাক্স দিতেই হবে। এবার কি করে সেই খাজনা দেব তাই ভাবছি কুমার!

ঈশ্বরচন্দ্র এতদিন পর এবার যেন ঈশান কোণে একটুকরো কালো মেঘের ছায়াও দেখেন। আগে হলে নিজেই মহালে যেতেন, প্রজাদের সঙ্গে কথা বলতেন, এখন সেই সামর্থ্য আর নেই, তাই বিপদের আশঙ্কাই করছেন তিনি।

এবার চৈত্র কিস্তিতে এক লাখ টাকা কৃষ্ণনগরের সরকারী ট্রেজারিতে জমা দিতেই হবে। কিন্তু তহবিলে তত টাকাও নেই। এদিকে খরচ কমাবার কোন পথই দেখেন না।

নায়েব হরষিতকে বলেন মিত্রমুস্তাফি মশায়—চৈত কিস্তির টাকা জোগাড় করো নায়েব। মহালে মহালে যাও।

হরষিত জানে তহবিলের অবস্থা।

অবশ্য এটা নতুন কিছু নয়। প্রকৃতির নিয়মে নদীর একদিক ভেঙে নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে যায় আর অপরদিকে গড়ে ওঠে নতুন উর্বর সোনা ফসলের চর।

তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রমুস্তাফির এস্টেটের বেশ কিছু অংশ ধসে পড়ে বিলীন হতে চলেছে আর হরষিত ঘোষের উদরও ক্রমশ ফুলে উঠছে গোপনে, তার কিছুটা শশী গোমস্তাও পায়। অবশ্য গোপনে এসব ঘটে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

হরষিত ঘোষ অবশ্য বিনয়ের মূর্তিমান অবতার। সে বলে ঈশ্বর মিত্রের ওই কথায়।

—মহালে মহালে কড়া তাগাদা দিচ্ছি হুজুর। কিন্তু এবার তো খরা, ফসলও হয়নি। তাছাড়া সাহেবদের চাপে বহু জমিতে নীল চাষ করতে হচ্ছে, খাজনা দেবে কোত্থেকে? তবু দু'দশজনকে কাছারিতে এনে চাবকেছি।

ঈশ্বর বলেন—না-না, প্রজাদের উপর অযথা অত্যাচার করো না।

—নাহলে খাজনা আসবে না হুজুর।

নায়েবের কথায় ঈশ্বর বলেন—এ ঠিক নয়। তার চেয়ে বরং একটা মহাল বিক্রীই করে দাও। সেই টাকাতে এবারের সরকারের খাজনা হয়ে যাবে।

হরষিতের অনেক স্বপ্ন সে এতদিন নায়েবী করে বেশ কিছু তছনছ করে কিছু অর্জন করেছে। ক্রমশ জমিদারের কাছে থেকে তারও সাধ হয় মহাল কিনে সেও কালে জমিদার হবে। তাই এই সুযোগ সে ছাড়তে রাজী নয়।

তবু বলে—মহাল একটা বিক্রী করে দেবেন হুজুর? যেন তারই গায়ে লাগছে।

মিত্রমুস্তাফি বলেন—এছাড়া আর পথ কি বলো? তুমি বরং কেশবপুর বিক্রী করে দাও। ওখান থেকে দু' সন তেমন আদায়পত্রও হয়নি। কখনও খরা কখনও বন্যা সেখানে লেগেই আছে। পদ্মার ধারে ওই মহাল রেখে লাভ নেই।

হরষিত জানে ওই মহাল খুবই অর্থকরী। গত দু' সন থেকে হরষিত ইচ্ছা করেই সেই মহাল থেকেই বেশী করে লুটপাট করেছে, যাতে ওইটাই কর্তাবাবু লোকসানের মহাল বলে ভাবেন। আর বিক্রীর কথাও ভাবতেই হবে। তখন প্রথমে ওই মহালেই হাত পড়বে।

তার অঙ্কটা মিলে যাচ্ছে। হরষিত বলে—এছাড়া পথও নেই হুজুর?

ঈশ্বর মিত্র বলেন—না। তাই বলছি খদ্দের দ্যাখো। ভালো দাম পেলে ওই মহাল বিক্রী করে দেব।

হরষিত বলে—দেখি যখন বলছেন।

অবশ্য খদ্দের হরষিত এখন নিজেই। তবে নিজের নামে নয়, বেনামীতে ওর স্ত্রীর নামেই কিনবে। মহাল কেনার মত টাকা তার এখন আছে। আরও বেশ কিছু টাকা সে রোজগার করে আদায়ী খাজনা থেকে আর গোপনে নানা জমি-বিষয় পাট্টা দিয়ে।

বড়বাড়ির অতলে গোপনে সে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চলেছে। একদিন এই প্রাসাদে সে ধস নামাবেই আর এইখান থেকে লুণ্ঠিত অর্থে নিজেই সে এই এলাকার জমিদার হয়ে উঠবে।

ঈশ্বর মিত্রমুস্তাফির প্রাসাদে এই ধসের কথাটা অবশ্য প্রকাশ্যে কেউ জানে না। হরষিত ঘোষ গোপনে কৃষ্ণনগর সদর কাছারিতে দলিল করে এবার মহাল কিনলো, ঈশ্বর মিত্রের এবারের সরকারের খাজনাটা মেটানো হল ওইভাবেই। খবরটা বিশেষ কেউ জানল না—জানলেন মিত্রমুস্তাফি মশাই।

॥ ৯ ॥

তবু বড়বাড়ির ঠাটবাট ঠিকমতই চলে।

সদরের বৈঠকখানায় কেদার পড়ছে মিঃ ব্যারোটের স্কুলে। অভয়-কালি-হরিদাসরাও পড়ে। তবে পাঠশালার সেই উৎকট শাসন এখানে নেই।

তাই তাদের দুপুর-বৈকালের বাগানে নদীর ধারের অভিযান সমানে চলে। কোন-কোন-দিন-নৌকা নিয়ে চূর্ণির বুকেও ভেসে যায় তারা। কেদার দাদাদের ভয়ে ওদের সঙ্গী হয়, তবে এইসব দুরন্তপনা তার ঠিক আসে না।

কিন্তু দাদাদের দরকার কেদারকে। এ সঙ্গে থাকলে তাদের শাস্তি কিছুটা কম হয়।

কেদারের এসব ছাড়াও তার নিজের একটা জগৎ আছে। বাবা নেই, মনের সঙ্গী বলতে ওই মামাবাবু, তাকে তো সব সময় পাওয়া যায় না। ইদানীং মামাবাবুও শিবচন্দ্র হাতিকে সাজিয়ে, না হয় ঘোড়ায় চড়ে মহলে যান।

কেদার একাই ঘোরে।

কখনও আসে শীতল তেওয়ারির ঘরে, যেখানে রামায়ণ কথা শোনে। সীতাউদ্ধার, লক্ষণের শক্তিশেল, সীতার বনবাস, লবকুশের কাহিনী। কখনও ধ্রুবর কাহিনী শোনে।

রামচন্দ্রেব প্রসাদ পায়।

কোনদিন ন্যাপাসর্দারের আখড়াতেও যায়। কৃষ্ণ-কীর্তন শোনে। খিচুড়ি-প্রসাদ পায়।

এছাড়া যায় এই মিত্রমুস্তাফি বংশেরই আর এক তরফের পরশুরাম মিত্রের কাছে। এই বংশের কিছু জমিদারীর মালিক তিনি। কিন্তু নিজে ওসব দেখেন না। জমিদারী ও সামান্য ব্যবসাপত্র এসব তাঁর ছেলেরাই দেখে, পরশুরামবাবু এই এলাকা ছেড়ে ওদিকের একটা ছোট বাগানে একটা ঘরে থাকেন সংসার থেকে দূরে।

র‍্যাকে প্রচুর ধর্মপুস্তক-পুঁথি।

মুসলমানদের ধর্মগ্রন্থ কোরাণ, খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল, হিন্দুদের বেদ-উপনিষদ—এ সবই পড়েন তিনি। ওইসব নিয়েই থাকেন। কেদারও আসে তাঁর কাছে। বৃদ্ধ পরশুরামবাবু চেনেন ওকে।

—এসো কেদার।

কেদার বলে—নচিকেতার গল্প শোনাবেন বলেছিলেন।

বৃদ্ধের মুখ হাসিতে ভরে ওঠে।

—এসো, এসো। এসব কথা কেউ শুনতেই চায় না। দ্যাখো না—খেউড়, কবিগান—হাফ-আখড়াই গান, যাত্রা-পালা নিয়েই ব্যস্ত সবাই। বোসো।

শান্ত সবুজ নির্জনে যেন কোন ঋষির তপোবনের ভাব ফুটে ওঠে। পরশুরাম শোনান।

ঋষি উদ্দালক-এর দানযজ্ঞ চলেছে—তিনি যজ্ঞশেষে তাঁর ধনরত্নাদি গরু সবকিছুই দান করে

দিচ্ছেন। ঋষিপুত্র কিশোর নচিকেতা তাই দেখে বাবাকে বলে—কস্মৈ মাং দাস্যসি! অর্থাৎ আমাকে কাকে দান করবেন পিতা?

ঋষি নীরবই থাকেন। দানপর্ব চলেছে, ছেলে আবার সেই প্রশ্ন করে, ঋষি ছেলের ওই প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বলেন—মৃত্যবেত্বা দদামীতি—অর্থাৎ তোমায় যমকে দান করলাম।

পিতৃসত্য পালনের জন্য রামচন্দ্র যেমন সর্বস্ব ত্যাগ করে বনবাসে গেছলেন—বালক নচিকেতাও তেমনি যমরাজের উদ্দেশ্যে যমলোকে যাত্রা করে।

যমরাজ বালকের এই পিতৃভক্তিতে খুশী হয়ে তাকে তিনটি বর প্রার্থনা করতে বললেন। দুটি বর প্রার্থনার পর ঋষিবালক নচিকেতা প্রার্থনা জানাল তাকে আত্মতত্ত্ব জ্ঞান দিতে হবে—

যমরাজ তখন বলেন—তুমি শতবর্ষ আয়ু রথ স্বর্ণ সম্পদ যা খুশী চাও, ওই আত্মতত্ত্ব জ্ঞান ছাড়া সবই পাবে—ওটি চেয়ো না।

মানুষের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান অর্জন খুবই কঠিনতম ব্যাপার। কিন্তু ঋষিবালক জাগতিক সব সম্পদ তুচ্ছ করে সেই পরম জ্ঞানই পেতে চায়।

কেদার শুনছে আগ্রহ নিয়ে, কি সে তত্ত্ব—সব তার কাছে বিচিত্র মনে হয়, হয়তো পরশুরাম দাদু জানেন, কিন্তু প্রকাশ করতে চান না। কি সেই সম্পদ যার কাছে এই ধনসম্পদ সব তুচ্ছ!

শিশু কেদার আনমনে ঘোরে।

আটচালায় গ্রামের বাচস্পতি মশায়ও পাঠ করেন। রামায়ণ ভাগবত নানা ধর্মগ্রন্থ তিনি বলেন। গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির কথা সেখানে ও শোনে। কোন নারী বলেন—যাতে অমৃত নেই তাতে কোন প্রয়োজনও নেই।

কেদারের মনে নানা প্রশ্ন জাগে।

অমৃতের কথা শুনেছে সে। সমুদ্রমন্থনে সেই অমৃতকুম্ভ উঠেছিল। সেই অমৃতই কি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? কথাটা পরশুরাম দাদুকেই শুধোয় সে—অমৃত কি দাদু?

পরশুরাম হেসে ওঠেন।—এখন থেকেই অমৃতের সন্ধান কি রে, অ্যাঁ! পড়াশোনা কর, পড়াশোনা কর, সংসারকে দ্যাখ। তারপর বুঝবি অমৃত সন্ধান কি বস্তু। গরলকেও চিনতে হবে, তবে তো অমৃত।

উত্তর ঠিক মেলে না।

কেদার পড়াশোনা ঠিকমতই করে। মিঃ ব্যারোটের স্কুলের সেই-ই সেরা ছাত্র।

ঈশ্বর মিত্রমুস্তাফিও আসেন বৈকালে ব্যারোটের পাঠশালায়। মিঃ ব্যারোট বলেন—মিঃ মিত্র, আপনার নাতি কেদার আমার সেরা ছাত্র। ওকে এবার অন্যত্র পড়ানোর ব্যবস্থা করুন। ভবিষ্যতে ও মস্ত বিদ্বান হবে।

কুমারবাবুও শোনেন কথাটা।

ইদানীং তাঁরও খুব কাজের চাপ পড়েছে। এস্টেটের আয়ের পথ কমে আসছে। বাবার শরীরও ভালো নেই।

আশুতোষ এ-বাড়ির পুরোনো কবরেজ।

মিত্রমুস্তাফি মশায় এখানে নিজের খরচে বিশাল বৈদ্যশালা খুলেছেন, রোগীদের চিকিৎসা করা হয়। নানারকম ওষুধ—মায় স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ রৌপ্যভস্ম প্রভৃতি নানা কিছু দামী ওষুধও তৈরী করা হয়। বেশ কিছু দরিদ্র মেধাবী ছাত্র এখানে জমিদারের খরচায় চিকিৎসাবিদ্যা শেখে।

এবার এস্টেটের আয় কমেছে। মিত্রমুস্তাফি মশায়ও ভাবনায় পড়েন। নিজের শরীরও ভেঙে

পড়ছে। কুমারবাবু বাবাকে বলেন—বৈদ্যশালার এত খরচ বন্ধ করে দিন। শুধু কবরেজ মশাই থাকুন।

ঈশ্বর মিত্রমুস্তাফি বলেন—তা হয় না কুমার। প্রজাদের কথাও ভাবতে হবে। এ ছাড়া বেশ কিছু চিকিৎসকও তৈরী হয় এখানে। দেশের সেবায় লাগে তারা।

—কিন্তু এত খরচা আসবে কোথা থেকে?

হরষিত নায়েব যেন মজা দেখছে। একটাই নয়। এর মধ্যে আরও একটা মহাল কিনেছে সে বেনামীতে। আশা করছে সামনের চৈত্রকিস্তির খাজনা দিতে তৃতীয় মহালও বেনামীতে জলের দরে কিনবে সে। বলে হরষিত—ছোট হুজুর, বড় হুজুর যখন বলছেন ওসব যেমন চলছে চলুক। জনসেবার মহৎ কাজ—

কুমার বলে—কিন্তু খরচটা? সামনে চৈতকিস্তী দিতে হবে সরকারকে।

ঈশ্বর বলেন—এবার শান্তিপুরের—না হয় রানাঘাটের পালদের কাছ থেকে নগদ টাকা কিছু ঋণ আনো। খাজনা পেলেই মিটিয়ে দেব।

হরষিত জানে প্যাঁচ কি ভাবে কষতে হয়। বলে সে—টাকা দেখি যদি পাই! রানাঘাটের নন্দীদের কাছে তো গতবছরের টাকা এখনও শোধ দিতে পারি নি।

—এবার পালবাবুদের কাছে টাকা নিয়ে ওটা শোধ করো।

হরষিত জানে ওসবই মিথ্যা। টাকা বেনামে সে-ই দশহাজার দিয়ে বিশ হাজারের হ্যাণ্ডনোট করিয়ে নিয়েছে। এবারও তেমনি খেলাই খেলবে।

এদের ঠাটবাট তবু চালাতেই হবে!

আশুতোষ বৈদ্যশাস্ত্রী ঈশ্বরবাবুকে বলেন—আপনার পূর্ণ বিশ্রামের প্রয়োজন। ওষুধপত্রও নিয়মিত খান।

কুমার বলেন—তাই হবে।

হরষিতও সায় দেয়—আপনি ভাববেন না বড় হুজুর। আমি তো রয়েছি, ছোট হুজুরও এবার কাজকর্ম দেখছেন। আপনাকে এসব নিয়ে ভাবতে হবে না।

ঈশ্বর মিত্র মুখে কিছু না বললেও মন থেকে এই জটিল ভাবনাগুলোকে দূর করতে পারেন না।

ব্যারোট সাহেবের স্কুলের পাঠ শেষ হয়ে গেল।

এবার কেদারই সেরা ছাত্র। কেদারের মনেও একটা নীরব অহঙ্কারই বোধ হয়।

কুমার মামা বলেন, তোকে এবার প্রাইজ দেব।

বাড়িতে দিদিমাও খুব খুশী। বলেন তিনি—কেদারের আমার সোনার দোয়াত-কলম হবে।

শিবুরও গর্বের শেষ নেই। শিবু এ-বাড়ির কাজের মেয়ে হলেও ওদের গার্জেন—এই গ্রামেই তার বাড়ি, স্বামী সংসার নিজের মেয়ে সবই আছে।

মেয়েটা মায়ের জন্য কাঁদে। কিন্তু নিজের মেয়ের চেয়েও এই অভয় কালি কেদার হরি তার আরও আপনজন। এর মধ্যে জগৎমোহিনীর একটি মেয়েও হয়েছে। হেমলতা আসার পর জগৎ-এর শরীর ভেঙে পড়ে, তাই ছেলেদের ভার পড়েছে শিবুর উপরই।

জগৎ বড়লোকের মেয়ে। কাজকর্ম করার খুব অভ্যাস তার নেই। তাই কাচ্চাবাচ্চাদের সামলাতে পারে না। শিবুর এই বাড়ি ছেড়ে যাবার উপায় নেই। এই তার যেন নিজের সংসার—ওরাই তার আপনজন। শিবু কেদারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আনন্দমোহন তখন মুর্শিদাবাদে। ব্যবসা এখনও চালাচ্ছে সে—আর রোজগার যা করেছেন ব্যবসা বাড়াবার জন্য সেই টাকা মফঃস্বলের তাঁতিদের দাদন দিয়েছেন। মহাজনের ঘর থেকে রেশম কিনে বুনতে দেন। তারই জন্য আনন্দমোহনকে ছুটোছুটি করতে হয়।

এতদিন বেশ চলছিল কারবার, কিন্তু এবার অন্য ব্যবসায়ীরা ইংরেজ কুঠিয়ালদের চাপে পড়ে সব মাল তাদেরই বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে কম দামে।

আনন্দমোহন প্রমাদ গণেন। এত টাকা ঢেলে মাল তৈরী করে বাজার না পেলে তাঁরও বিপদ হবে এটা বুঝেছেন। তাই স্থানীয় মহাজন ধরমশায়কেই বলেন—আপনি নিজেই কলকাতায় মাল চালান দেন।

ধরমশাই মুর্শিদাবাদ-কাশিমবাজারের বনেদী ব্যবসায়ী। মফঃস্বলেও তার কুঠি আছে। কিন্তু ধরমশাইও বুঝেছেন ইংরেজ এখন দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাদের চটানো ঠিক হবে না। সরকারী প্রশাসনও চোখ বুজে ইংরাজ কুঠিয়ালদের সব আবদার মেনে নেয়। এর মধ্যে দু'একজন বিদ্রোহী ব্যবসায়ীকে নানা ভাবে বিপদে ফেলে তাদের জমি-কুঠিবাড়ি এসবের দখল নিয়েছে সরকার।

ধরমশাই-এর উপরও চাপ আসছে। সেটা বাইরে প্রকাশ করেন নি তিনি। তাই আনন্দমোহনবাবুর কথায় বলেন তিনি—দেখি, ব্যবসা সহজে ওদের হাতে তুলে দেব না।

আনন্দমোহন ভাবনায় পড়েন। তাঁরও অনেক টাকা-মালপত্র পড়ে আছে তাঁতিদের ঘরে। সেসব মাল যেভাবে হোক তুলে আনতেই হবে।

বিদেশী কুঠিয়ালদের চেয়েও বেশী ভয় এদেশী বেনিয়ান মুৎসুদ্দিদের। তারা এর মধ্যে সব ব্যবসাদারদের খবরও যোগাড় করেছে। আর নিজেদের লোক পাঠিয়ে নগদ দামে তাঁতিদের সকলের ঘরের মালও কিনে ফেলছে। অভাবী তাঁতীরা নগদ টাকা পেয়ে মহাজনের মালই ওদের হাতে তুলে দেয়। জানে সাহেবদের পিছনে লাগবার সাহস ওই সব ছোট ব্যবসায়ীদের নেই।

বরং তারা ওদের মাল বেচে দিয়ে সাহেব কুঠিয়ালদের রেশমই বেশী বুনতে থাকে। তবু দু'একজন বলে—ওই মহাজনদের কি বলবো?

সাহেব কুঠিয়ালদের বেনিয়ানরা বলে—হাঁকিয়ে দিবি।

সৎ তাঁতিরা অবাক হয়—সে, কি, মাল নিইছি—

—লেখাপড়া-টিপছাপ কিছু কি দিইছিস তোরা?

এসব কাজ এতদিন বিশ্বাসের উপরই হয়েছে। মুখের কথায় মাল দিয়েছে তারা, এরাও শাড়ি বুনে দিয়েছে। হিসাবমত মজুরি পেয়েছে। লেখাপড়া তেমন হত না, নেইও।

বেনিয়ানরা বলে—বলবি মাল দিয়ে দিয়েছি।

—এখন না বলব কিন্তু ধর্ম তো আছে?

তাদের কথায় বেনিয়ানরা বলে—টাকাই ধর্ম। টাকা পাচ্ছিস, ব্যস, ধম্মকম্ম এখন ভুলে যা।

তারাই এবার নতুন ধর্মমতের প্রবর্তন করে। চুরি করাই ধর্ম, মিথ্যা বলাই ধর্ম। সমাজের বুকে ওরাই নবাব।

ওরা নতুন আদর্শের পত্তন করে যার খবর আনন্দমোহন কেন, অনেকেই রাখে না। নতুন ধর্ম, নতুন শিক্ষার প্রবর্তন শুরু হল ইংরেজ শাসকদের যুগে।

কৃষ্ণনগর নদীয়ার সদর শহর।

তখনও কৃষ্ণনগরের রাজাদের নামডাক আছে। রাজপাট একেবারে উঠে যায় নি। যদিও ইংরেজ এখানে ক্রমশ গেড়ে বসেছে—তারাও জমিদারী ব্যবসা শুরু করেছে। শিকারপুর—

করিমপুর—পদ্মার পাশে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে ও মেদিনীপুরে জমিদারী-কোম্পানী তার জমিদারী ব্যবসা শুরু করেছে, তবুও রাজাদের গৌরব ম্লান হয়নি।

তখন শিক্ষা চিকিৎসা রাস্তাঘাট—এসবের ব্যবস্থাতেও রাজামহারাজাদের অবদান ছিল অনেক। বহু রাজামহারাজাদের উদ্যোগে আর সাহায্যে বহু স্কুলকলেজ দাতব্য চিকিৎসালয় পথঘাট পানীয় জলের পুষ্করিণী এসব তৈরী হতো। সব ভার ইংরেজ সরকার তখনও গ্রহণ করে নি, করার সদিচ্ছাও খুব বেশী তাদের ছিল না।

কৃষ্ণনগরের মহারাজা নিজের উদ্যোগে কৃষ্ণনগর শহরে একটা ইংরাজী স্কুল-এর প্রতিষ্ঠা করলেন। তখনকার দিনে বিদ্যালয় আর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোলই কিছু ছিল। সেখানে বাংলা আর সংস্কৃতেই আদ্য মধ্য উপাধি এসব পড়ানো হতো। কিছু ফার্সী শেখার প্রচলনও ছিল।

কিন্তু ইংরেজ আসার বেশ কিছুকাল পর থেকে ইংরাজী জানার, শেখার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। কারণ ক্রমশ ফার্সী ছেড়ে রাজকার্য পরিচালনা শুরু হল ইংরাজীতেই।

তবু নিম্নমধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ তখনও বিজাতীয় ভাষাকে ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি। ফলে মফঃস্বলে ইংরাজী স্কুলে ছাত্র তেমন হতো না, আর সাধারণ মধ্যবিত্তদের সেসব পরিবেশে আসা সহজও ছিল না।

এই কৃষ্ণনগরে ইংরাজী বিদ্যালয় হবার পর তিনি স্থানীয় এবং আশপাশের বেশ কিছু জমিদারদের কাছেও মহারাজা অনুরোধ জানালেন তাঁদের সন্তানদের যেন এই স্কুলে তাঁরা পাঠান।

কুমারবাবু খবর পেয়ে খুশীই হন। তিনিও চান তাঁর ভাগ্নেরা বিশেষ করে কেদারের মত মেধাবী ছেলে আরও পড়াশোনা করুক। তাই কুমার বলেন— বাবা, ওদের ভাবছি কৃষ্ণনগরের স্কুলেই পাঠাবো।

ঈশ্বর মিত্রও খুশী হন, বলেন—ভালোই হবে। কৃষ্ণনগরের বাড়িটা তো এমনিই পড়ে আছে। সদরে কেউ কাজে গেলে থাকে। ওই বাড়িতেই থাকবে ওরা।

অভয় কালী হরিদাস কোম্পানী তখন সারাগ্রাম দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। কবিগান যাত্রাগানের নিবিষ্ট শ্রোতা। বৈরাগী বোষ্টমদের আখড়ায় যায়, পীরের মেলাতেও তাদের যাতায়াত, তান্ত্রিকের আখড়াতেও তাদের আনাগোনা।

কেদারও নদীর ধারে বাউলদের আখড়ায় যায়। শীতল তেওয়ারির ওখানে, জগাদার গৌরাঙ্গ কুটিরেরও নিত্যযাত্রী সে। বাউলদের আখড়ায় গান শোনে।

গুরু তোমার চরণ পাবো বইলে
বড় আশা ছিল।
আশানদীর কূলে বইস্যে
আমার আশায় আশায় জনম গেল
আশা না পুরিল—

কাতর আত্মনিবেদনের সেই সুর কেদারের মনকে স্পর্শ করে। মানুষ অনেক কিছুই চায় ব্যাকুলভাবে—কেউ চায় অর্থ নাম, কেউ চায় মোক্ষ পরমার্থ।

কিন্তু তাদের আশা কি পূর্ণ হয়? এর উত্তর বাচস্পতি মশায়, পরমেশ্বর দাদুও জানেন না। কেদারের মন ছায়া-নামা বৈকালে কি অসীম শূন্যতায় ভরে ওঠে। তার চাওয়া তো পূর্ণ হয়নি— অবশ্য কি সে চায় তাও জানে না।

সেদিকে অভয়দা কালীদারা অনেক ভালো আছে। সামান্য ফল-পাখীর সন্ধান—কিছু হৈ-চৈ তাতেই তারা খুশী।

এমনি দিনে কুমার মামা বলেন—কেদার, কৃষ্ণনগরে পড়তে যাবে তোমরা। অনেক বড় স্কুল, ভালো রেজাল্ট করতে হবে। অভয়রাও যাবে।

ওদের কৃষ্ণনগর যাবার ব্যবস্থা হয়ে যায়। অভয় কালী হরিদাসের কাছে এ যেন নির্বাসন। ওরা গর্জায়—ওখানে যাবো না, উলাতেই থাকবো।

উলার প্রতিষ্ঠিত দেবী ওলাইচণ্ডী খুবই জাগ্রত দেবী। বিশাল এক বটবৃক্ষের নীচে তেলসিন্দূর মাখানো একটা বড় পাথরে দেবীর অধিষ্ঠান। তিনি মন্দিরের সীমায় আবদ্ধ থাকতে চান না।

সারা গ্রামের লোক ওই গাছতলায় এসে মায়ের পুজো দেয়—চরণামৃত নিয়ে যায়। সকলেরই মনস্কামনা পূর্ণ করেন ওলাইচণ্ডী মা।

অভয় কালী ওদের জমানো পয়সায় বাতাসা কিনে এনে মায়ের ভোগ দেয়—কেষ্টনগর যাওয়া বন্ধ কর মা! এখানেই যেন থাকি চিরকাল, এখান থেকে কোথাও যাবো না।

হরিদাসও প্রণাম করে।

কেদার দেখে ওদের আকুল প্রার্থনা। মনে মনে সে হাসে। সে বরং খুশীই হয়েছে, তাই মনে মনে সে প্রার্থনা করে—মাগো, কৃষ্ণনগরে যাওয়াই যেন হয়।

সে চায় আরও পড়াশোনা করতে। এই উলাগ্রামে বাইরের বিশাল জগৎকে দেখতে চায় সে।

মা ওলাইচণ্ডী তার মনস্কামনাই পূর্ণ করেন।

কয়েকদিন পরই দুটো পাল্কীতে চারটি বালককে নিয়ে কৃষ্ণনগর রওনা করিয়ে দিলেন কুমারবাবু। জগৎমোহিনীও চায়, তার স্বামী বাইরে ব্যবসার কাজে ব্যস্ত, তবু ছেলেরা লেখাপড়া শিখুক মানুষ হোক।

ওই কিশোরবাহিনীর গার্জেন হয়ে সঙ্গে গেল শিবু।

শশী গোমস্তা পাইক নিয়ে চলেছে, পিছনে চলেছে পাল্কীর শোভাযাত্রা।

দিদিমা ও জগতের চোখে জল।

তবু ছেলেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাদের কৃষ্ণনগরেই পাঠানো হল। কুমার বোনকে বলেন—চোখের জল ফেলিস না জগৎ, ছেলেদের মানুষ করতে হবে রে। দেখবি কেদার, কৃষ্ণনগর স্কুলেও ফার্স্ট হবে রে।

জগৎ বলে—সেই আশীর্বাদই কর দাদা।

কৃষ্ণনগর শহরে এসেছে ওরা।

নিজেদের বাড়িটা শহরের মধ্যেই। উলা গ্রামের সেই নির্জনতা, সেই সবুজ স্নিগ্ধতা এখানে নেই। শহরের পরিবেশই আলাদা। এখানে তাদের কেমন কেউ চেনে না।

আর উলায় তাদের ছিল অবারিত মুক্তির আশ্বাস। নদীর ধার—তাদের বিরাট বাগান—খেলার মাঠ সর্বত্রই ছিল তাদের অবাধ গতিবিধি। পড়াশোনার চাপও তেমনি ছিল না। গ্রামে বারো মাসে তের পার্বণ।

উলা এমনিতেই বেশ বর্ধিষ্ণু গ্রাম। ছোট বড় বহু জমিদার পত্তনিদার উচ্চমধ্যবিত্তের বাস। তাই নানারকম উৎসব গান কবিগান বাউল—এসবের আসর বসতো, গান-বাজনার রেওয়াজও ছিল।

যেখানে হোক বসে যেত তারা উৎসবমুখর পরিবেশে। সন্ধ্যার পর কীর্তন না হয় পাঁচালীর আসরও বসতো। সময় কেটে যেন কোন্‌দিকে। এখানে সে সব নেই। যে যার কাজ নিয়েই ব্যস্ত।

অভয়-কালী-হরিদাস যেন এখানে বন্দী হয়ে পড়েছে।

মনে পড়ে উলার কথা। নদীর ধারে দাশুপাগলার কালীমন্দিরে এখন কালীকীর্তন শুরু

হয়েছে। দাশু রক্তবস্ত্র পরে, গলায় হিংলাজের মালা, কপালে মাড়লির মত ইয়া সিন্দূরের টিপ। চোখদুটো দ্রব্যগুণে সর্বদাই লাল হয়ে আছে। তার মন্দিরে মাকালীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। হাড়িকাঠও আছে। অমাবস্যায় পাঁঠাবলি দেয়।

হরিদাস-অভয়রা সেদিন প্রসাদও পায়—মাংসের ঝোল আর খিচুড়ি। সেই সঙ্গে চলে কালীকীর্তন।

এমন দিন কি হবে মা তারা—
যবে তারা তারা তারা বলে
দুনয়নে পড়বে ধারা।

সেই গান দাশুপাগলার গলায় অমারাত্রির অন্ধকারে খন্‌খন্ করে বাজে।

হরির আটচালায় তখন খোলকর্তাল সহযোগে মেঠো কীর্তন চলে। হরিদাসের কাছে হরিরলুটের বাতাসার চেয়ে ওই কচি পাঁঠার স্বাদ অনেক বেশী।

তাই অভয়দাকে নিয়ে সে ওখানেই কালীকীর্তনের আসরে যায়। কেদার অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই ওই সব বীররসের আধিক্যকে এড়িয়ে যায়। জগাদার সেই কীর্তনই ভালো লাগে তার, না হয় কৃষ্ণলীলা যাত্রার আসরেই বসে পড়ে। তার কাছে কৃষ্ণ-রাম-শ্রীচৈতন্য এসবের আকর্ষণই বেশী।

অভয়দা বলে—ন্যাড়ানেড়িদের ওই কেত্তন একদম বাজে। ভদ্দর-লোকদের কেউ যায় ওখানে? আর ওই গিরিদাস বাবাজী—ও তো চিতেবাঘের মত তিলক কেটে বসে থাকে আর লোককে ঠকিয়ে সবার জমি জায়গা দখল করে, মুখে কেষ্ট কেষ্ট করছে!

কেদারনাথও দেখেছে ওসব। তার মনে হয় কৃষ্ণ-চৈতন্যদেব কখনই ওইভাবে অন্যায় করতে বলেন নি। এসব ওদের নিজেদের লোভের ফলই, ধর্মের নামে এইভাবে লোক ঠকানোর কথা কোনদিনই কোন ধর্ম সমর্থন করে না। বৈষ্ণবধর্ম আসলে কি সেই তত্ত্ব তাকে জানতে হবে। এই সব ভণ্ডদের মুখোশ খুলে দিয়ে, এদের মত স্বার্থান্ধ মানুষদের হাত থেকে ধর্মকে বাঁচানো প্রয়োজন।

কিন্তু সেই শক্তি তার নেই। চুপ করে দেখে মাত্র।

গ্রামের কথা তারও মনে পড়ে। কিন্তু কৃষ্ণনগরের এই বিচিত্র পরিবেশে এসে সে এবার পড়াশোনাতেই মন দেয়। কেদারের মনে হয় জানার শেষ নেই। এখানের গ্রন্থাগার দেখেছে—কত বই-পুঁথি, সব যদি সে পড়তে পারতো!

এখানের জীবন বেশ একটা ছন্দে বাঁধা।

সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে পড়তে বসতে হয়। শিবুদিদি এই নতুন সংসারের কর্ত্রী। কড়াহাতে অভয়-কালি-হরিদের শাসন করে। তাদেরও পড়তে বসতে হয়।

দশটার সময় স্নানখাওয়া সেরে বের হতে হয় স্কুলে। এখানে গ্রামের সেই কার্তিক সরকারের স্কুলের শিরপড়ুয়া মাধবের ছড়ির ভয় নেই।

তবু নিয়মনিষ্ঠা আছে। প্রিন্সিপ্যাল খোদ মিলিটারীসাহেব ক্যাপটেন রিচার্ডসন। ইয়া গোঁফ, লালচে চুল, দীর্ঘ-পেটা দেহ, জুতোর শব্দ তুলে বারান্দায় যাতায়াত করেন। তখন ছাত্রদের সব কলরব থেমে যায়। খোদ জেলাশাসক লালমুখো ইংরেজ। তারই বিশাল বাংলোর একদিকের একটা ব্যারাকবাড়িতে স্কুল।

অভয়-হরিদাসদের মত ডানপিটে ছেলেরাও মুখ বুজে ঢোকে এখানে। শহরের বেশ কিছু গণ্যমান্য লোকদের ছেলেরা এই স্কুলে আসে। জুড়িগাড়ির শব্দ ওঠে।

জেলাশাসকের বাংলোর গেট পার হয়ে বাগানের মধ্যে লাল মোরাম বিছানো পথ দিয়ে তেজী দু'ঘোড়ায় টানা জুড়িটা ঢোকে।

এই জুড়িগাড়ি থেকে নামছে কোঁচানো ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি কিশোর। কৃষ্ণনগরের রাজার ছেলে সতীশচন্দ্র। সেও এই স্কুলের ছাত্র।

ক্যাপটেন রিচার্ডসন সেনা বিভাগের অফিসার হলেও তো নিজে খুবই বিদ্বান এবং বিদ্যোৎসাহী। তিনি দেখেছেন এদেশে ইংরেজের প্রতিষ্ঠা কায়েম রাখতে হলে উচ্চকোটির সমাজে তাদের শিক্ষা, ভাষার প্রচলন করার দরকার। তাদের সমর্থক হিসাবে মিলবে দেশীয় জমিদার-সমাজকে।

আর ইদানীং উচ্চবর্ণের কিছু এদেশীয় মানুষও আদ্যিকালের সংস্কৃত আর ফার্সীকে ছেড়ে ইংরাজী ভাষাও শিখতে চায়। এ নিয়ে বিলেতে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তাদের মধ্যেও অনেক ভাবনাচিন্তা জল্পনাকল্পনাও চলছে। এদেশে তাদের প্রতিষ্ঠা কায়েম করতে হলে একটা শ্রেণীকে তাদের সমর্থক হিসাবে পেতেই হবে।

ক্যাপটেন রিচার্ডসন শিক্ষার কথাই ভেবেছেন আর তাই এই স্কুলের প্রবর্তন করেছেন।

কেদারনাথ এমনিতে খুবই মেধাবী আর পরিশ্রমী। মন দিয়ে ক্লাসের পড়াশোনা করে আর সহজেই ক্যাপটেন রিচার্ডসনের নজরে পড়ে।

ক্লাসে সেদিন কেদারই সুন্দরভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে ইংরাজী কবিতাটা আবৃত্তি করে। এর আগে রিচার্ডসন আরও কয়েকজন ছাত্রকে সেটা পড়তে বলেন।

দু'একজন জমিদারনন্দন শহরে পড়ার জন্য নয় পৈতৃক পয়সায় বাবুগিরি করতে এসেছে। পড়ায় মন তাদের নেই। তাই দু'চার লাইন পড়েই থেমে যায়, উচ্চারণেও গ্রাম্যজড়তা ফুটে ওঠে।

কিন্তু কেদারের তা নেই। মিঃ ব্যারোট তার ইংরাজী উচ্চারণ শুধরে দিয়েছেন, সেই অভিজ্ঞতাই তাকে ক্লাসে সেরা ছাত্রের মর্যাদা এনে দেয়।

—ভেরি গুড মাই বয়। ক্যাপটেনও খুশী হন।

তার ইংরাজী লেখাও চমৎকার। এর মধ্যেই ইংরাজীতে সহজ অনুবাদও করে নির্ভুলভাবে। খাতায় সেই সবচেয়ে বেশী নম্বর পায়।

কুমার সতীশচন্দ্র কৃষ্ণনগরের মহারাজার ছেলে। সে একদিন কেদারকে বলে—সুন্দর ইংরাজী বলো, লিখতেও পারো তুমি!

কেদার দেখছে ওই রাজপুত্রও তার খাতা চেয়ে নেয়, ওকেই দু'একটা কথার অর্থও শুধোয়। সেদিন বলে কেদারকে—আমাদের বাড়ি যেতে হবে তোমাকে।

কেদার অবাক হয়। যদিও তার দাদুও মস্ত বড়লোক, তবু কৃষ্ণনগর রাজবাড়ি বলে কথা!

অভয়-কালি-হরিদাস কেন, স্কুলের অনেক ছাত্রই অবাক হয়। কেদার মহারাজকুমারের জুড়িগাড়িতে চেপে বের হয়ে গেল।

কেদার রাজবাড়িতে এসেছে। বিশাল প্রাসাদ, চারিদিকে সাজানো বাগান। গোলাপই কত বর্ণের তার হিসাব নেই। তাদের সৌরভে বাতাস ভরপুর।

তার দাদুর বাড়ি এদের তুলনায় অনেক ছোট।

সিঁড়িগুলো বিরাট, অনেক সিঁড়ি টপকে তবে ওঠা যায় মূল প্রাসাদে।

বিশাল বেলজিয়াম কাঁচের ঝাড়লণ্ঠন। দামী মেহগনী আবলুস কাঠের চেয়ার, শ্বেতপাথরের টেবিল। বাগানে মর্মরপাথরের কত মূর্তি।

এত প্রাচুর্য তার চোখে পড়ে নি। কেদার অবাক হয়ে দেখে এসব।

রুপোর থালায় এসেছে রকমারি সন্দেশ, সরভাজা, সরপুরিয়া।

কুমার সতীশ বলে—খাও। তারপর লাইব্রেরীতে যাবো।

রাজবাড়ির গ্রন্থাগারও এক বিচিত্র জগৎ। কৃষ্ণনগর রাজবংশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও খুবই সুনাম ছিল। এককালে অনেক কবি তাদের সভা অলঙ্কৃত করেছিলেন। অনেক মূল্যবান পাণ্ডুলিপি-পুঁথি-গ্রন্থ এখানে রয়েছে। কেদার দেখছে সেসব রত্নসম্ভার।

—তুমি এসব পড়েছ?

কুমার সতীশ ওর প্রশ্নের উত্তরে হাসে মাত্র। কেদারের মনে হয় এসব যদি সে পড়তে পারতো। এক নতুন জ্ঞানজগতের প্রবেশপথে সে যেন করাঘাত করছে। তাকে আরও পড়াশোনা করতে হবে। জানতে হবে অনেক কিছু।

ভারতের মুনিঋষিদের রচিত বেদ-পুরাণ-উপনিষদ এসবের সম্বন্ধে পরশুরাম দাদু, বাচস্পতি মশায়ের কাছে শুনেছে সে, কিন্তু এদের গ্রন্থাগারে দেখে বিদেশী অনেক বই।

জন স্টুয়ার্ট মিল, সোপেনহাওয়ার, কেণ্ট, ভলটেয়ার—আরও কত লেখকের বই—তাঁরাও ইতিহাস দর্শন এসব নিয়ে গবেষণা করেছেন।

কিশোর কেদার যেন এক বিচিত্র জগতের সন্ধান পায় এখানে। অনেক ইংরেজ কবিদের বইও রয়েছে—শেলী, বায়রন, কীটস্, কোলরিজ! এ যেন গভীর অরণ্যে একটি কিশোর এসে হারিয়ে গেছে নতুন এক জগতে, যে জগতের সীমানা উলা কৃষ্ণনগর এসবের বাইরে বিস্তৃত এক সীমাহীনতায়।

অভয়-কালী-হরিদাসদের কাছে এই জগতের কোন সন্ধানই নেই। সপ্তাহের শেষ দিনটার হিসাবই করে তারা। কবে শনিবার আসবে!

শনিবার হাফছুটির পরই তাদের পাল্কী না হয় জুড়িগাড়ি এসে যায় উলা থেকে। ওরা সপ্তাহে এইদিন বাড়ি ফেরে। উন্মুক্ত প্রান্তর গাছগাছালি দূরদিগন্তে উলাগ্রামের গাছপালা যেন তাদের ডাকে।

শনি-রবিবার থাকে দেশের বাড়িতে। সেই বাগান, নদীর ধারে দাশুপাগলের আশ্রমে কালীকেত্তন শোনে, নদীতে নৌকা বায়।

কেদারের দেখা হয় জগন্নাথের সঙ্গে—কি গো, পড়াশোনা কেমন চলছে?

জগন্নাথের কথায় যেন মধু ঝরে। কেদার বলে—তোমার নামগান চলছে কেমন?

হাসে জগন্নাথ। সে বলে—বড় হয়ে গ্রন্থ লিখবে কেদারভাই। অনেক ধর্মগ্রন্থ। বুঝলে সত্যিকার ধর্মগ্রন্থের দেখাই মেলে না! যা মেলে তা ওই ন্যাড়ানেড়িদের লেখা। সেখানে দেহ-ই সার গো। আসল বৈষ্ণবতত্ত্ব লেখা গ্রন্থ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত এসব চোখেই দেখলাম না। সেসব মহৎ গ্রন্থ থাকলে এত ভণ্ড হতো না মানুষ।

কেদারের মনে পড়ে রাজবাড়ির গ্রন্থাগারের কথা। এবার গিয়ে সতীশকে বলবে, ওই সব গ্রন্থ আছে কিনা খোঁজ করতে।

কুমারমামাই সব থেকে খুশী হন কেদারের পরীক্ষার ফল দেখে। কেদার স্কুলে প্রথম হয়েছে।

ঈশ্বর মিত্রও খুশী হন। তাঁর সভাসদদের অনেকেই খবরটা শোনেন। কৃষ্ণনগরের সাহেব স্কুলে কেদার প্রথম হয়েছে।

মণি ঠাকুর তো তাই বলে—কি, বলিনি কত্তাবাবু, আপনার নাতি এই চাকলার মধ্যে সেরা ছাত্র। আমি দেখেই বুঝতে পারি যে, কেদার কি জিনিস তা বুঝেছি।

মামা কেদারকে একটা ঘড়ি দেন—এটা তোর। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এই ঘড়ির সময়ের সঙ্গে বাঁধা। যে মুহূর্তটা চলে যায় তা আর ফিবে আসে না। তাই জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই মূল্যবান। তার অপচয় করা পাপ।

কেদারেরও মনে হয়, কথাটা সত্যি।

কেদার এখন গ্রামের চোখের মণি। মনে হয় তার সে যেন ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা নিয়েই জন্মেছে। যখন যা খুশী তাই সে করতে পারে। পড়াশোনা তার নখদর্পণে। সামান্য দেখলেই তা হয়ে যাবে, সুতরাং তার জন্য এত পরিশ্রম না করলেও চলবে।

অতি সহজেই সে ফার্স্ট-ই হবে। এই অহমিকাই তাকে পেয়ে বসে। সকলের প্রীতি-প্রশংসাই যেন কাল হয়ে দাঁড়ায় তার কাছে।

কৃষ্ণনগরে এসেছে কেদার, পরবর্তী ক্লাসের প্রথম ছাত্র। কিন্তু এবার পড়াশোনাতে তার তেমন মন নেই।

মাঝে মাঝে শহরের এখান ওখানে বের হয়। চলে যায় দূরে নদীর ধারে কুমোরপল্লীতে। ঘূর্ণি অঞ্চলে বহু মৃৎশিল্পীদের বাস। কেদার সেখানে গিয়ে তাদের কাজকর্ম দেখে। কখনও বা নদীর ধার দিয়ে এক মুক্ত জগতের পথে হারিয়ে যেতে চায়। পড়াশোনার কথা মনেই আসে না, স্কুলে যেতেও মন চায় না। সেও যেন এবার অভয়-কালীদাদেব দলে ভিড়ে পড়ে বৃহত্তর জগতকে নতুন করে চিনতে চায়।

কেদার যেন আগেকার সেই মানসিক পরিবেশ থেকে এক স্বতন্ত্র জগতে সরে এসেছে।

॥ ১০ ॥

আনন্দমোহন এবার বিপদেই পড়েছে। অদৃষ্ট যেন তার সঙ্গে এক নিষ্ঠুর পরিহাসই শুরু করেছে। এতদিন পরিশ্রম করে বেশ কিছু অর্থ উপার্জন করেছিলেন তিনি।

আরও ব্যবসা বাড়াবার জন্য সেই সব টাকা দাদন দিয়েছিলেন তাঁতীদের, মহাজন ধর মশায়ও কাঁচা মাল দিয়েছিল, সব শাড়ি-রেশমি থান সেখানেই দিত।

কিন্তু সাহেব কুঠিয়ালরা নানা ভাবে চাপ দিয়ে সেইসব মালের দাম অনেক কমিয়ে দিতে প্রভূত টাকা লোকসানই দিতে হল আনন্দমোহনকে।

মহাজন ধরমশাইও ইংরেজ কুঠিয়ালদের চাপে ব্যবসা বন্ধ করে দিল আর এতদিনের পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল আনন্দমোহনের। যথাসর্বস্ব সবই চলে গেল মহাজনের দেনা মেটাতে। মুর্শিদাবাদের ব্যবসাও তাকে বন্ধ করে দিতে হল।

এতদিনের পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল। আবার শূন্যহাতে ভগ্ন মনে ফিরে এলেন আনন্দমোহন উলায়।

জগৎমোহিনী ওসব শুনেছে। তার নিজের অর্থ বেশ কিছু গেছে এই বিশু মুখুজ্যের জন্য, তারপরও সঞ্চিত অর্থ থেকে স্বামীকে ব্যবসা করতেও কিছু টাকা দিয়েছিল। সেও গেল।

তবু জগৎমোহিনীর তার জন্য কোন দুঃখ নেই, তার দুঃখ স্বামীর এই ব্যর্থতাতে। তবু সে স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়—এ ভাবে ভেঙে পড়লে চলবে না। ব্যবসায় লাভ লোকসান সবই আছে, না হয় লোকসান হয়েছে, কিছুদিন বিশ্রাম নিয়ে ভেবেচিন্তে আবার ব্যবসাপত্রই শুরু করবে। দেখবে এই সব লোকসান পুষিয়ে যাবে।

আনন্দমোহন বলে,—আবার ব্যবসা! ওসব আমার ধাতে সইবে না জগৎ।

অন্য কিছু করার কথাই ভাবতে হবে।

আনন্দমোহন ফিরে এসেছেন।

কেদার-অভয়রা এখন কৃষ্ণনগর স্কুলে পড়ছে। তারাও এখন বড় হয়ে গেছে। কেদারও আর সেই ছোট্ট নেই—এখন রামায়ণ-মহাভারতের গল্প সব তার জানা। বাবাকে প্রণাম করে। আনন্দমোহনও ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

বলেন—মন দিয়ে পড়াশোনা করবে বাবা।

কেদার কিন্তু এবারের পরীক্ষায় খুবই খারাপ ফল করেছে, হতাশ হন মিঃ রিচার্ডসন। এবার কেদারকে ডেকে বলেন কঠিন স্বরে,—এই রেজাল্ট হবে ভাবিনি। লাস্ট চান্স দিচ্ছি, এবার ভালো ফল না করলে ইউ শ্যাল বি আউট। তোমাকে বের করে বাধ্য হবো কেদার।

কেদার যে গতবার সবচেয়ে বেশি সম্মান পেয়েছিল এবার তাকেই তিরস্কার পেতে হল সবচেয়ে বেশি। মনে হয় পড়াশোনা করবে না আর। এসব ছেড়েই দেবে।

মনমেজাজ ভালো নেই কেদারের।

খবরটা বাড়িতেও পৌঁছেছে। আনন্দমোহনবাবুর মনমেজাজও ভালো নেই। ব্যবসায়ে লোকসান দিয়ে শূন্যহাতে ফিরে আবার শ্বশুরবাড়িতেই রয়েছেন।

ওদিকে উড়িষ্যার জমিদারীর অবস্থাও খারাপ।

বাবা নিজে প্রায় সন্ন্যাসীর মতই থাকেন, সৎমাই সেখানের সর্বেসর্বা। সেখানেও যাবার উপায় নেই। আনন্দমোহন আশা করেছিলেন তবু কেদার তাঁর সব শূন্যতাকে পূর্ণ করবে। কিন্তু সেও হতাশ করেছে।

তিনিও কেদারকে বকেন—পড়াশোনাও করবে না। তাহলে করবে কি?

কেদার চুপ করে থাকে।

শিবুমাসি বলে—তোমরা সবাই মিলে একটা দুধের ছেলের পিছনে লাগবে? কত বড় বড় বই পড়ে ও তা জানো? এবার ঠিক ফাস্টো হবে আমার কেদার।

কেদার দেখেছে জগতে খ্যাতিরও কোন স্থিরতা নেই। গতবছর সে প্রথম হয়ে যে খ্যাতি পেয়েছিল সেটা যে কত মূল্যহীন তা বুঝেছে। জগতে খ্যাতির বোধহয় তেমন কোন দামই নেই। শুধু খ্যাতি কেন, নাম-যশ-অর্থ-প্রতিষ্ঠা সবই বোধহয় এমনিই ক্ষণস্থায়ী। কিছুরই মূল্য নেই। নিমেষেই তা হারিয়ে যায়।

জগাদা বলে—তাই গো। সত্য স্থায়ী শুধু ঈশ্বর। সে কৃষ্ণ-রাম-শ্রীচৈতন্য যে ভাবেই ধর না কেন, যুগযুগান্ত ধরে তাঁরাই রয়েছেন, থাকবেনও। তাঁরাই পরম সত্য—পরম ব্রহ্ম, আর সবই অর্থহীন, শূন্য।

কেদার এসবের অর্থ ঠিক বোঝে না। তবু কথাগুলো তার মনে সাড়া আনে।

কুমার মামাই এই দুঃখের দিনে তাকে সাহস দেয়।

—কি রে, রেজাল্ট খারাপ হয়েছে তাতে কি হয়েছে? এদের সব নিন্দার দাম কি? আবার পড় মন দিয়ে, দেখবি ফার্স্ট হবি, আবার সবাই সুখ্যাতি করবে তোর।

—আবার স্কুলে যাবি। এত সহজে হেরে যাবি কি রে? জীবনটাই একটা লড়াই। এগিয়ে যাবার লড়াই, হারজিৎ তো থাকবেই, তাই বলে হেরে পালাবি?

কেদারও মনে মনে জোর পায়।

এবার তাকে আবার ফার্স্ট হতেই হবে। তাই আবার কৃষ্ণনগরে আসে নতুন এক শপথ নিয়ে।

আনন্দমোহন নিজের ঘরে বসে আছেন।

কেদারকে ঢুকতে দেখে চাইলেন। কেদার বলে—এবার মন দিয়ে পড়বো বাবা। দেখবে

আবার ফার্স্ট হবো।

আনন্দমোহন ছেলেকে বুকে টেনে নেন। বলেন তিনি—তোর উপর আমার অনেক আশা কেদার। তুই অনেক-অনেক বড় হবি। আমার বাবার কুষ্ঠি মিথ্যা হয় না।

কেদাররা কৃষ্ণনগরে এসেছে।

তখন কলকাতার বৃহত্তর সমাজেও এক নব্যশিক্ষার আলোড়ন এসেছে।

এতদিন কলকাতার হিন্দু বিশেষ করে উচ্চকোটির সমাজে ছিল জমিদার, কিছু ধনী ব্যক্তিদেরই আধিপত্য। কলকাতার বাবু সমাজ তখন প্রাচুর্যের মধ্যেই বাস করছে। তাদের জগৎ যেন আলাদা। অধিকাংশ লোকেরই পূর্বপুরুষের অর্জিত বেশ কিছু জমিদারী আছে। আর কলকাতা-সুতানুটি-গোবিন্দপুর এলাকা ছাড়াও উত্তরে বরাহনগর-এড়েদহ অঞ্চলে রয়েছে বিস্তীর্ণ বাগানবাড়ি।

সেখানে তারা বাঈনাচ, এদিকে পাড়ায় পাড়ায় দোল দুর্গোৎসব আর না-হয় পায়রা ওড়ানো, বুলবুলির লড়াই এসব নিয়েই মত্ত।

হাফ আখড়াই—কবি-গানও চলে।

তারা নিজেদের খোলসের মধ্যেই ভোগবিলাসের স্রোতে ডুবেছিল। তাদের মধ্যে কিছু, তাও মুষ্টিমেয় মাত্র, লেখাপড়ার চর্চা করতেন। রাজা নবকৃষ্ণদেবের পরে তাঁর প্রবর্তিত শিখার ধারা কিছু প্রবাহিত ছিল। কালীকৃষ্ণ সিংহ মশায়ও ছিলেন ব্যতিক্রম।

তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সেই সাবেকী কূর্মবৃত্তিই ছিল প্রধান।

এই সময়ে এল ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন। ডেভিড হেয়ার, ডিরোজিওর মত কিছু বিদ্যোৎসাহী বিদেশী এসে এখানে ইংরাজী শিক্ষার প্রচেষ্টাও শুরু করলেন।

আর এর মধ্যে ওই ধনিক শ্রেণীর কিছু মানুষও বুঝেছিল তাদের জমিদারী আর এই ফুর্তির বন্যা এভাবে চিরদিন চলবে না। তারা ইংরেজ বেনিয়াদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন, কিছু উৎসাহী ভাগ্যান্বেষী যুবকও এগিয়ে এলো, ইংরেজদের কুঠিতে কাজকর্ম শুরু করবে বলে কাজচলা গোছের ইংরেজী শিখে তারা বেশ প্রতিষ্ঠাও অর্জন করলো।

ক্রমশ অর্থনৈতিক কারণে, তারপর ইংরেজসমাজে পরিচিতি এবং প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যও কিছু যুবক ইংরাজী শিখতে শুরু করলো। ক্রমশ ইংরাজী শেখাটা শুধু অর্থনৈতিক কারণেই নয়, সামাজিক মর্যাদালাভের জন্যও অনেকে শিখতে শুরু করলেন।

ওদিকে শিক্ষার সঙ্গে সামাজিক পরিবর্তনেরও সূচনা হল। রাজা রামমোহন রায়-এর উদ্যোগেই হিন্দুসমাজে সেই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। তিনি নিজে জন্মেছিলেন বৈষ্ণব বংশে। ধর্মের গোঁড়ামি নানা কুসংস্কার তখন হিন্দুধর্মকে নাগপাশে আবদ্ধ করেছিল।

রামমোহন নিজে ছিলেন পণ্ডিত। ফার্সী-ইংরাজী-সংস্কৃত সবই ছিল তাঁর গোচরে। বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্য দর্শন তাঁকে খুবই প্রভাবিত করেছিল। তাই সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে তিনি হিন্দুধর্মের কুসংস্কার আর গোঁড়ামিকে আঘাত করেছিলেন। সতীদাহের মত নিষ্ঠুর প্রথাকে তিনি আইন করে রদ করেছিলেন।

আর হিন্দুধর্মের মূলে আঘাতও করেছিলেন। অবশ্য তার জন্য গৃহত্যাগও করতে হয়েছিল তাঁকে। নিজেই প্রবর্তন করেন উদার মন নিয়ে ব্রাহ্মধর্মের।

সেই ব্রাহ্মধর্ম তখনকার দিনে বেশ কিছু বিদগ্ধ মানুষকে আকৃষ্ট করেছিল। তৎকালীন কলকাতার বহু উচ্চকোটির মানুষ এই ধর্মমতকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

আর ক্রমশ সনাতন হিন্দুধর্মের সঙ্গে এই নবপ্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের সংঘাতও অনিবার্য হয়ে

উঠল। শিক্ষাক্ষেত্রেও এল এক নতুন জোয়ার।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন সবে অধ্যাপনা শুরু করতে চলেছেন। ইংরেজ কোম্পানীও ক্রমশ এদেশের শাসনযন্ত্রকে পাকাপোক্ত ভাবে পরিচালনা করার জন্য তাদের ইংরেজ কর্মচারীদেরও এদেশের ভাষায় পারদর্শী করার জন্য বিদ্যালয় গড়ে তুলছে।

ওদিকে শ্রীরামপুরের মিশনারীরাও বসে নেই। তারা আর এক ধাপ এগিয়ে গেছেন। বাংলায় এতকাল মুদ্রণ যন্ত্র তেমন ছিল না। তাঁরা ছাপাখানায় বাংলা টাইপের প্রবর্তন করে বাংলা ভাষায় পুস্তকাদি প্রকাশের ব্যবস্থা করে এক বিপ্লব ঘটালেন।

কলকাতায় তখন এক বৈপ্লবিক নবজাগরণ শুরু হয়েছে। বেশ কিছু স্কুলও গড়ে উঠেছে। শুরু হয়েছে কিছু পত্রপত্রিকা, সমাজের বুকে ইংরেজী শিক্ষার ঢেউ এসে আঘাত হেনেছে এতদিনের জগদ্দল সমাজের বুকে।

এরই সামান্য আলোড়ন কলকাতা থেকে দূরে কৃষ্ণনগরেও পৌঁছাতে দেরী হয় না।

স্কুল চলছে সেখানে। কেদার আবার মন দিয়ে পড়াশোনা শুরু করেছে। এবার তাকে আবার হারানো গৌরব ফিরে পেতেই হবে।

কুমার মামা তাকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেন। কলেজের নামও শুনেছে সে। সেখানের কলেজে পড়বে কেদারনাথ, তার জন্য তৈরি হচ্ছে।

কুমার মামার আশা স্বপ্ন সে ব্যর্থ হতে দেবে না। বাবাও চান কেদার আরও বড় হোক। কেদার পড়াশোনাতে মন দেয়।

কিন্তু জীবনের পথ সহজ সুগম নয়। মানুষ ভাবে এক আর অদৃশ্য কোন জীবনদেবতা তাকে নিজের পথেই নিয়ে চলেন। সেখানে মানুষ যেন অসহায়। সেই অদৃশ্য হাতের কারসাজিতে মানুষের সব হিসাব কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

কেদারও ভাবেনি যে তার জীবনেও অদৃশ্য সেই দেবতার আঘাতগুলো এইভাবে নেমে আসবে। কৃষ্ণনগরে থেকে পড়াশোনা চলছিল, শিবুমাসীই তাদের তদারক করে।

হঠাৎ সেদিন ভেদবমি শুরু হলো কালীদাদার। তখন ভেদবমির তেমন কোন সুষ্ঠু চিকিৎসা ছিল না, তবু ডাক্তার ডাকা হলো। ওষুধপত্রেও তেমন কোন কাজ হয় না।

কালীদাকে পাল্কীতে করে ওই অবস্থাতেই কৃষ্ণনগর থেকে উলাতে আনা হচ্ছে। বেশ কয়েকমাইল পথ, এতদিন সেই পথে তারা যাতায়াত করেছে অনেক হৈ হল্লা করে। আজ ফিরছে ভীত শঙ্কিত মনে। পথের যেন শেষ হয় না। ক্রমশ নেতিয়ে পড়ে কালীদা। প্রাণশক্তি ফুরিয়ে আসছে তার।

কোনমতে উলাগ্রামে আনা হল তাকে।

কবরেজ মশাইও এলেন। জগৎমোহিনী দেখে তার সন্তানকে। আজ সব যেন ফুরিয়ে আসছে। চিকিৎসার কোন ত্রুটি হয় না, কিন্তু তখন আর সময় নেই।

কেদার দেখে ধীরে ধীরে কালীদাদার শেষ সময় ঘনিয়ে আসছে। মৃত্যুর করাল ছায়া নামে সংসারে। কালীদাদা মারা গেলেন।

এই প্রথম দেখল কেদার মৃত্যুকে অতি কাছ থেকে। তার প্রিয়জনকে কেড়ে নিল কোন নিষ্ঠুর দেবতা। সারা অন্তর মন দুঃসহ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

এতদিন একসঙ্গে মানুষ হয়েছে, কত দিন-রাতের সঙ্গী। আজ সে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য। মৃত্যুর যবনিকা তাদের বিচ্ছিন্ন করে দিল।

জীবনের এই করুণতম পরিণতি যে পরম সত্য এই কথাটা এতদিন তার জানা ছিল না।

সারা বাড়িতে শোকের ছায়া নামে।

হাসিখুশী ভরা ছেলেগুলোর মুখের হাসিও মুছে গেছে।

এই বড় বাড়িতেও সেই আগেকার খুশীর আভাস মুছে আসছে। এক এক করে বেশ কয়েকটা মহাল বিক্রী হয়ে গেছে। পদ্মার ভাঙনের মতই যেন ঘটছে ব্যাপার। নদীর বেশ দূর অবধি নীচে জলরাশি এগিয়ে চলেছে, উপরের মাটিতে তার কোন চিহ্নই নেই। ঘর বাড়ি-গৃহস্থের সংসার-ক্ষেত সবই ঠিক ঠাক রয়েছে।

হঠাৎ একদিন অতর্কিতে দূরে সরু ফাটল একটা দেখা যায়। আর তারপরই বিনা নোটিশে ধ্বসে পড়ে সব কিছু, পদ্মার অতল গর্ভে সব তলিয়ে যায়। সেই সবকিছুর চিহ্নমাত্র থাকে না। থাকে শুধু জল আর জল।

এই বড় বাড়ির গভীরে যেন তেমনি এক সর্বনাশের সূচনা হয়েছে, তা অবশ্য বাইরে থেকে দেখা যায় না। এখনও দেউড়িতে দারোয়ানরা পাহারা দেয়। জুড়ি গাড়িতেও বের হন মিত্রমুস্তাফি মশায়। সন্ধ্যায় কালোয়াতি গানের আসরও বসে। দোলেও উৎসব হয়। রং-এর খেলা চলে।

দুর্গোৎসবও হয়। মন্দিরে অন্য পালাপার্বণও অনুষ্ঠিত হয়। কোথাও যেন তেমনি কিছু ঘটে নি।

কিন্তু খরচটা আসে ঐ বিক্রীবাট্টার টাকা থেকেই। সেটা জানে ভালো করে হরষিত ঘোষ। কারণ এই নাটকের মূল হোতা সেই-ই।

শশী গোমস্তা এমনিতে নিরীহ ধরনের মানুষ। ইতিপূর্বে সে নায়েব মশাই-এর কার্যকলাপ কিছু দেখেছে। কিন্তু অর্থ আত্মসাৎ করাটা জমিদারী সেরেস্তার প্রচলিত রীতি, কিন্তু ক্রমশ হরষিত নায়েব যে হাঁস মেরে ডিম খেতে শুরু করবে তা ভাবে নি সে।

একটার পর একটা মহাল বেনামীতে কিনে চলেছে, আর এস্টেটকে দেনার সমুদ্রে ডুবিয়ে চলেছে। শশী গোমস্তা বলে—এটা কি করছেন ঘোষ মশায়?

ঘোষ মশায় বলে—একটু চোখ বুজে থাকো হে, এত দরদ নাইবা দেখালে? আপনি বাঁচলে বাপের নাম। নিজের আখের গুছিয়ে নাও এই বেলা।

শশী গোমস্তা বলে—এ তো অধর্ম। অন্নদাতার এইভাবে সর্বনাশ করবেন? এ আমি পারব না।

হরষিত নায়েবও বুঝেছে শশী গড়বড় করতে পারে। তাই বলে—জমাবন্দীর হিসাব তোমার হাতেই, এসব গড়বড় তুমিই করেছ তাহলে। কর্তাবাবুকে জানাই।

চমকে ওঠে শশী।

হরষিত নায়েব জানে কোথায় ঘা মারলে কাজ হবে। বলে সে—তহবিল তছরুপের দায়ে জেলে যেতে হবে তোমাকেই।

কথাটা মিথ্যা নয়।

নায়েব তাকেই ফাঁসিয়ে রেখেছে যাতে শশীও মুখ খুলতে না পারে।

শশী গোমস্তা তখনকার মত চুপ করে যায়। হরষিত নায়েবও যথারীতি তার কাজ চালিয়ে যায়। শশী গোমস্তা দেখে আর মনে মনে শিউরে ওঠে। মুখে কিছু বলার সাহস তার নেই, মনেই রাগ আর জ্বালাটাকে চেপে রাখে।

দিন চলে এইভাবেই বড় বাড়ির।

শিবু ঝি বলে—গিন্নীমা ওই কেষ্টনগরে গে ওদের পড়ে আর কাজ নাই। একজন তো গেল পণ্ডিত হতে গে, বাছারা তবু বেঁচে বর্তে থাকুক। ঢের হয়েছে পড়াশোনায়।

অভয়, হরিদাসও নিশ্চিন্ত হয়। উলা ছেড়ে যেতে হবে না তাদের, বাড়িতেই থাকবে।

কুমারবাবু ও আরও কয়েকজন নব্যযুবক মিলে তখন উলাগ্রামেই একটা স্কুল চালু করার কথা ভাবছেন। এতবড় গ্রাম, বহু ছোট বড় জমিদারের বাস। সেই বিশু মুখুয্যেও এবার অবস্থা সামলে নিয়ে এখন দেশসেবার কাজে মন দিয়েছে।

অবশ্য আনন্দমোহনবাবুর টাকাটা আর দেবার প্রয়োজনও সে বোধ করে নি।

সেই বিশু মুখুয্যেও স্কুল গড়ার কাজে যোগ দেয়।

কুমারবাবুর চেষ্টাতেই উলাগ্রামে স্কুল গড়ে উঠলো আর অভয়-হরিদাস-কেদারও সেইখানেই ভর্তি হয়ে গেল।

অভয়রাও খুশি। কেষ্টনগরের সাহেবের শাসন এখানে নেই। গ্রামে যাত্রা-কবিগান-তান্ত্রিকের আখড়ার মেলা এসব নিয়েই দিন কাটে।

কেদার যায় বাচস্পতিমশায় পরশুরাম দাদুর কাছে। বাইবেলের গল্প বলেন পরশুরাম দাদু।

বৃদ্ধ লোকটির মুখে যীশুর কাহিনী, তার প্রেম, মানুষের কল্যাণে আত্মত্যাগের কাহিনী শোনে। আবার জগন্নাথের কাছে শোনে শ্রী চৈতন্যদেবের প্রেম বিতরণের কথা। জাতিভেদ নেই—ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পাপী সকলকেই তিনি বুকে টেনে নিয়েছিলেন। মানবকল্যাণের জন্য নিজেও সংসারসুখ ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে প্রেমধর্ম বিতরণ করেছিলেন।

বাচস্পতি মশায় শোনান বেদান্তের কথা। মৈত্রেয়ীর সেই অমৃত সন্ধানের কথা। জগতের সার সেই অমৃত।

প্রশ্ন করে কিশোর কেদার।

—অমৃত কি?

হাসেন বাচস্পতি মশায়। বলেন—ইদং সত্যং ইদং অমৃতং ইদং ব্রহ্মঃ। তাই সত্যই অমৃত—তিনিই ব্রহ্ম। জগতের সার তত্ত্ব। এসব বুঝবি না এখন। পড়াশোনা কর কেদার। জীবনের বহু সাধনায় তাকে বুঝতে হয়। মানুষের জীবনের লক্ষ্য সেই সত্যকে উপলব্ধি করা। তাতেই আনন্দ, তাই ঈশ্বর পরমানন্দময়।

কেদার এসব ঠিক বোঝে না।

তবে মনে হয় তাকে অনেক কিছুই জানতে হবে, পড়তে হবে।

আনন্দমোহনও কিছুটা বুঝেছে যে এই বড়বাড়ির আনন্দের দিন, নিশ্চিন্ততার দিন শেষ হয়ে আসছে। উড়িষ্যার খবরও ভালো নয়।

মুর্শিদাবাদেও প্রচুর লোকসান দিয়ে এসেছে। এখন এখানেও আর এভাবে থাকতে মন চায় না। তার এক সন্তানও মারা গেল। আনন্দমোহন এবার ব্যবসার কথা ছেড়ে চাকরীর কথাই ভাবছে।

কুমার জানে ভগ্নিপতির মানসিক অবস্থার কথা। সেই-ই বলে—একটা কাজকর্মের মধ্যেই থাকলে তবু ভালো থাকবে আনন্দ।

আনন্দও তাই চায়। বেকার বসে বসে এবাড়ির অন্নদাস হয়ে থাকতে চায় না সে। তাই কুমারের কথায় বলে, চাকরী হলে তো ভালোই হয়, কিন্তু দিচ্ছে কে?

কুমার ভাবছে। কৃষ্ণনগরে তার পরিচিত এক ইংরেজ কুঠিয়াল মিঃ ফারলন-এর এখন শিকারপুর-কুষ্টিয়ার দিকে নানা ব্যবসা রয়েছে। রেশম-তাঁতের কাপড়, নীল-এর চাষ এসবও করেন। বেশ কয়েকটা কুঠি রয়েছে ওদিকে।

মিঃ ফারলন উলাতেও মিত্রমুস্তাফি মশায়ের কাছেও আসেন। তাদের কুষ্টিয়ার ওদিকের

বিস্তীর্ণ খাস জমি পত্তনি নিয়ে সেখানে নীল চাষ করতে চায়।

কুমার বলেন—দেখি চেষ্টা করে, যদি কোন কুঠিয়ালের ওখানে কাজ মেলে। তুমি তো রেশমের ব্যবসাও করেছ, কিছু অভিজ্ঞতা আছে।

আনন্দমোহন-এর চাকরির এখন দরকার।

তাই বলেন—দ্যাখো। অনেক টাকা লোকসান দিয়ে কিছু অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই হয়েছে। নিজে তার থেকে কোন লাভ করতে পারি নি। যদি অন্য কেউ করতে পারে করুক।

মিঃ ফারলনকে সেদিন কৃষ্ণনগরেই পেয়ে যান কুমারবাবু। মিঃ ফারলন জানে কুমার সাহেবকে হাতে রাখতে পারলে আখেরে তার লাভই হবে। তাই আনন্দবাবুর চাকরির ব্যাপার শুনে মিঃ ফারলন বলেন,

—ঠিক আছে। আপনি যখন বলছেন আপনার আত্মীয়, তাকে পাঠান, কাজ আমি দেব। আমাদের শিকারপুর কুঠিতে একজন সহকারী ম্যানেজারের দরকার।

আনন্দমোহন খবরটা শুনে খুশীই হয়।

শিকারপুর নদীয়া জেলার দূর পল্লী অঞ্চল। যাতায়াতের পথও তেমন নেই। অন্য সময় মাঠ বিল ভেঙে কাঁচা সড়ক একটা আছে, বেশ দীর্ঘ পথ, কিন্তু বর্ষাকালে তাও দুর্গম হয়ে ওঠে।

কিন্তু করার কিছুই নাই।

আনন্দমোহন স্ত্রী পুত্র তার ছোট মেয়ে হেমলতাকে উলায় রেখে সেখানেই চলে গেলেন জীবিকার সন্ধানে। যদি ভাগ্য ফেরাতে পারেন কোনমতে।

কেদারও দেখে। কিছুদিন বাবাকে পেয়েছিল কাছে। আবার চলে গেলেন তিনি দূর দুর্গম জায়গায়।

সময় বসে নেই। সে তার গতিতেই চলেছে। উলাগ্রামের শান্ত পরিবেশের বাইরে বিশাল জগতে তখন নানা কর্মকাণ্ড চলেছে। কলকাতা শহরে এখন নব্য যুবক সমাজ আর সাবেকী পথে চলতে রাজী নয়।

হিন্দু কলেজ শুরু হয়েছে। মিশনারীদের প্রভাবও বাড়ছে। মিঃ রেভারেন্ড ডাফ সাহেব কলকাতার বুকে স্ত্রী শিক্ষা নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছেন। এতদিন ধরে বাঙালী মেয়েরা ছিল বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ। বের হতে হলে পর্দাঘেরা গাড়িতে না-হয় পাল্কীতে বের হত।

এমনকি গঙ্গাস্নান করতে হলে বদ্ধ পাল্কীতেই বসে থাকতেন তাঁরা, বেয়ারারা গঙ্গাজলে নেমে সেই পাল্কীসমেত চুবিয়ে আনতো।

সেই বন্দী মেয়েদের নিয়ে এবার লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টাও শুরু হল। মেয়েদের হাতে বই খাতা দেখলে বাড়ির পুরুষরাও চটে যেত। এবার তাদের নিয়ে স্কুল গড়তে চলেছেন ডাফ সাহেব এবং অন্যরা।

ছেলেদের জন্যও স্কুল কলেজ হচ্ছে। আর ইংরাজী শিখে তারাও নিজেদের স্বাধীন মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে।

সমাজে এখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটি বহু আলোচিত নাম। তিনি আরও অনেকদূর এগিয়ে গেছেন। শিক্ষাক্ষেত্রে আলোড়ন ছাড়াও এবার তিনি রামমোহন রায়ের উপরেও গেছেন সামাজিক আন্দোলনে।

রামমোহন স্বামীর মৃত্যুর পর তাদের বিধবাদের সহমরণে যাবার প্রথা রদ করেছিলেন। এবার বিদ্যাসাগর সেই বিধবাদের আবার বিয়ে থা দিয়ে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করার কাজেও নেমেছেন।

চারিদিকে গেল গেল রব উঠেছে। সেই সামাজিক বিপ্লবের খবর দূর উলাগ্রামেও পৌঁছে যায়। এ নিয়ে প্রবীণদের মধ্যেও তুমুল আলোচনা হয়। হিন্দুধর্মের প্রবক্তার দল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুণ্ডপাত করতে শুরু করেন।

কুমারবাবু দূর গ্রামে থাকলেও এসব খবর রাখেন। কিছু সাময়িক পত্র সেখানেও কয়েকদিন পর হলেও পৌঁছায়।

তিনিও বলেন—কেদার, বাংলার বুকে নতুন এক জাগরণ আসছে। পুরোনো অনেক কিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে নতুন অনেক কিছুই আসবে। কলকাতায় তারই সূচনা হয়েছে।

কেদার ভাবছে কলকাতার কথা। সেখানেই পড়তে যাবে সে। এই নবচেতনার দিনে সেই আন্দোলন থেকে বাইরে সে থাকবে না। কুমারবাবু বলেন,—ভালো করে পড়। কলকাতার কলেজে পড়তে হবে।

কেদারও স্বপ্ন দেখে। মহানগরীতে গেছে সে। কৃষ্ণনগরের থেকেও অনেক বড় জায়গা। কত বিরাট লোকদের বাস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও খুব দেখতে ইচ্ছে করে।

পত্রপত্রিকা আসে মামার কাছে সেই মহানগরীর খবর নিয়ে। কেদারও মন দিয়ে পড়ে সে সব। ক্রমশ জানতে পারে ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠার কথা। ইংরেজী শিক্ষার জন্য কলেজ হয়েছে তাও জানে। কত ছাত্র পড়ছে। কত ইংরাজী বই মেলে সেখানে।

কেদার খবরের কাগজ থেকে ইংরাজী পড়তে শিখছে, নিজেই ইংরাজী রচনাও লেখে। স্কুলের মধ্যে এবার কেদার-এর নাম ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে।

মামাবাবুও খুশী হন। কেদারকে এবার ফার্স্ট হতেই হবে।

কেদারের মনে হয় তার জীবনে যেন একটা অভিশাপ কোথায় রয়েছে। এতদিন ধরে সহজ ভাবেই এগিয়েছে সে। গ্রামের সর্বত্র তার যাতায়াত।

গ্রামের প্রান্তে দেখেছে কর্তা-ভজা সম্প্রদায়ের কিছু বাউলদের। গোলকদাস তাদের গুরুস্থানীয়। গেরুয়া পরে, মাথার চুলগুলো ঝুটির মত বাঁধা।

সেই গোলকদাস সেদিন কেদারকে দেখে বলে,—গোসাঁই যে গো! এসো—

কেদার এগিয়ে যায়। তখন গোলকদাস রোগীদের জড়িবুটি দিতে ব্যস্ত। তবু বলে সে—এ যে সত্যিই গোসাঁই গো তুমি। এমন চোখ, এমন লক্ষণ। তুমি তো জগৎ জয় করবে গো!

হঠাৎ চুপ করে যায় গোলকদাস। কি ভাবছে সে। গোলকদাস বলে, কিন্তু জীবনে তো অনেক উঠান পড়ান আছে গো। তবে ত্যান্যার দয়ায় সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু উলা ছাড়তে হবে তোমায়।

কেদার শুনছে ওর কথা। বলে সে—শুধু তোমাকেই নয়, অনেককেই এ গেরাম—

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে যায় গোলকদাস। বসন্ত এসে পড়ে। মুস্তাফি বাড়ির পুরোনো চাকর বসন্ত এখনও বহাল তবিয়তেই রয়েছে আর তার মুখের ধারও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ছে।

বসন্ত বলে—এখানেও জুটেছ কেদার! ধন্যি যা হোক! কোনদিন এবার শ্মশানে গে ধুনি জ্বালিয়ে বসবে বোধহয়। বাড়ি চলো। মামাবাবুর খুব অসুখ।

চমকে ওঠে কেদার। বের হয়ে আসে। বলে সে—

বসন্তদা, গোলকদাস তো অনেক ওষুধ জানে, ভূত ভবিষ্যৎও নাকি গুণতে পারে। মামাবাবুর কথা বলব ওকে? দেখবে ওর ওষুধে মামাবাবু ভালো হয়ে উঠবে।

বসন্ত ধমকে ওঠে—ছাড়ো তো বুজরুকের কথা। কচু জানে। ওই গাছগাছড়া দেয় আর দুম

দাম আনশান বলে, লাগে তাক, না লাগে তুক। ছোটবাবুকে বড় কবরেজ দেখছেন।

কুমারবাবুর শরীরটা কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছিল না। মহালের খাজনা আদায়, জলকরের আদায়পত্র ঠিক মত হচ্ছে না। কুমারবাবু নিজেই গেছলেন সেই সব দূর মহলে, আর সেখানে শশী গোমস্তাও সঙ্গে গেছে।

এবার শশী এতদিন পর সাহস অর্জন করে ছোট হুজুরকে মহালের খাজনা আদায়-এর রহস্যগুলো সবই প্রকাশ করে।

কাতর স্বরে অনুতপ্ত শশী গোমস্তা বলে,—তখন নায়েব মশাই-এর ভয়ে বলতে পারি নি। ছাপোষা মানুষ, চাকরী গেলে খাবো কি? আর জমাবন্দী খাতায় উনিই আমাকে ওসব লিখতে বাধ্য করেন, সামান্য কিছু টাকাও দিয়েছিলেন, নিতে চাইনি। কিন্তু না নিয়ে উপায় ছিল না। এসব করতে বাধ্য হয়েছি।

কুমারবাবু এবার বুঝতে পারেন। কিন্তু সর্বনাশ যা হবার তা হয়ে গেছে। এতগুলো মহালও চলে গেছে। আর খাজনাও প্রজাদের কাছ থেকে হালসন অবধি চাপ দিয়ে আদায় করে নিয়েছে হরষিত ঘোষ কিন্তু সেরেস্তায় তা জমা পড়ে নি।

অর্থাৎ কয়েক লাখ টাকাই তছরুপ হয়ে গেছে—সেই সঙ্গে মহালও কয়েকটা চলে গেছে। এখন শেষ অবস্থা।

কুমারবাবু বাবাকে এসব কথা জানাবেন কি করে ভাবতেও পারেন না। বাবার শরীর খারাপ। এদিকে তহবিলও শূন্য, সামনে চৈত্র কিস্তির সরকারী খাজনা জমা দিতে হবে।

কুমারবাবু তবু মহালে ঘোরেন, যদি কিছু খাস জমি বিলি করা যায়। কিছু টাকা আসবে। কিন্তু রেকর্ডপত্রে দেখা যায়, খাস জমিও সব বিলি করা হয়ে গেছে, তার জন্য কোন আদায়ও দেখানো হয়নি।

কুমারবাবু কোনমতে শূন্যহাতেই ফিরে এসে অসুস্থ হয়ে পড়ে।

ঈশ্বর মিত্র এতসব খবর জানেন না। নায়েব হরষিত ঘোষ অবশ্য এসব খবর রাখে। তবে তার যা নেবার তা নেওয়া হয়ে গেছে। এখন এখানে তার কোন দরকারই নাই। সে নিজেই এখন তিন চারটে মহালের মালিক। ফলে এখানেও আর আসে না। কুমার মিত্রের অসুখ বাড়ছে। বৃদ্ধ ঈশ্বর মিত্রও বিপদে পড়েন। কবিরাজ-এর ওষুধও কাজ হয় না। এস্টেটের তহবিলেও তেমন টাকা নেই।

গিন্নীমাই তার সঞ্চয় থেকে কিছু টাকা দেন। কৃষ্ণনগর থেকে সাহেব ডাক্তারকে আনানো হয়, কিন্তু রোগ তখন বেড়ে গেছে।

সারা বাড়িতে ওঠে কান্নার রোল।

মিত্রমুস্তাফি বাড়িতে নেমে আসে আবার মৃত্যুর কালো ছায়া। কুমারবাবু মারা গেলেন।

কেদারের সামনে জগতের সব আলো যেন মুছে যায়। এইভাবে তাকে ফেলে মামাবাবু চলে যাবেন তা ভাবতেও পারে নি সে।

মামাবাবুকে ঘিরে কেদারের ছিল অনেক স্বপ্ন। সব স্বপ্নই এবার ব্যর্থ হয়ে যাবে। কেদারের চোখে জল নামে। তার সবচেয়ে প্রিয়জনকেই এবার ছিনিয়ে নিল মৃত্যুর করাল স্পর্শ।

কালীদাদা মারা গেছে, এবার গেলেন কুমার মামা।

সারা বাড়িটাই তার কাছে শূন্য মনে হয়। কেদারের অনেক কিছুই হারিয়ে গেছে।

বাচস্পতিমশায়-এর কাছে আসে কেদার। তার ছোটবাড়ির উঠানে দিনশেষের ছায়া নামে।

পাখীরা ফিরছে বাসার সন্ধানে। দিনের আলো মুছে আসছে। বাচস্পতিমশায় গীতার শ্লোক শুনিয়ে বলেন—কেদার, জীর্ণবাস আমরা যেমন পরিত্যাগ করে নতুন বাস গ্রহণ করি, তেমনি এই দেহ পরিত্যাগ করে আবার নতুন দেহ গ্রহণ করার নামই মৃত্যু। দেহের ক্ষয় লয় হয়, কিন্তু আত্মার ক্ষয় লয় নেই। সে অবিনশ্বর।

কেদারের মন মানে না। বলে সে—মৃত্যুকে জয় করা যায় না?

বাচস্পতিমশায় বলেন—মানুষ বেঁচে থাকে তার কাজের মধ্য দিয়ে, যে মহৎ কাজ করে, সে-ই মানুষের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকে। মৃত্যু তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

কেদারের মন মানে না। জগন্নাথের ওখানে যায়। যায় পরশুরাম দাদুর কাছে। অমৃততত্ত্ব শোনে—কিন্তু সেসব তত্ত্ব গ্রহণ করার মত মন তার নেই। শীতল তেওয়ারির রামনাম, ন্যাপাসর্দারের কৃষ্ণতত্ত্বও আজ কেদারের মনকে স্পর্শ করতে পারে না।

সবকিছু যেন তার হারিয়ে গেছে। নদীতীরের শ্মশানে যায় যেখানে কুমারের নশ্বর দেহকে দাহ করা হয়েছিল, সেখানে বসে থাকে।

শান্ত নদীতীর, শান্ত প্রকৃতি—সাঁইবাবলার বনে হলুদ ফুল ব্যাকুল সৌরভ নিয়ে ফুটে থাকে। জীবনযাত্রায় কোথাও কোন বিরতি নেই—পৃথিবী যেন সর্বংসহা। কোন মৃত্যুর স্পর্শ এখানে নেই, জীবনের চলমান স্রোতই প্রবাহিত।

কেদারের মনে হয়, মৃত্যুর কাছে প্রকৃতি পরাজিত হয়নি। তবে মানুষ কেন হারিয়ে যাবে। ওই পাখীডাকা জগতের সব সবুজ স্নিগ্ধতার মাঝেও মামাবাবু রয়ে গেছে, রয়ে গেছে তার স্মৃতিতে। মৃত্যু সেখানেই পরাজিত।

বসন্ত জানে কেদারের প্রকৃতিকে। একান্তে থাকতে চায় সে। অভয়, হরিদাসদের সে চেনে। কিন্তু কেদারকে ঠিক চিনতে পারে না। খেয়ালী সে। বাড়িতে না দেখে খুঁজতে খুঁজতে এখানেই এসেছে।

বলে বসন্ত—বাড়ি চলো! কাঁহা কাঁহা মুলুকে ঘুরে বেড়াও কে জানে!

কেদার পড়াশোনায় মন দিতে চায়। কিন্তু শূন্যতা জাগে। এখানের পড়া শেষ হলে কে আর তাকে কলকাতায় কলেজে পড়তে পাঠাবে। তাছাড়া মামাবাবু মারা যাবার পর এখানেও নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে।

স্কুলও ঠিকমত চলছে না। ঈশ্বর মিত্র আগে দরাজ হাতে স্কুল-বৈদ্যশালা-পথঘাট এসবের জন্য, গরীব মানুষদের জন্য টাকা সাহায্য এসব করতেন।

তখন সেরেস্তা বাড়ি গমগম করতো। সকাল থেকেই আমলা-পাইক-পেয়াদাদের ভিড় জমতো। আসতো দূর দূরান্ত থেকে প্রজারা। তাদের থাকা খাওয়ার জন্যই একটা বাড়ি নির্দিষ্ট ছিল।

এখন সদাব্রত সেই অতিথিশালাও বন্ধ হয়ে গেছে। দাদুরও শরীর খারাপ। দোতলায় শোবার ঘরেই পালঙ্কে শুয়ে বসে থাকেন।

একমাত্র যোগ্য ছেলে মারা যাবার পর ঈশ্বর মিত্রও ভেঙে পড়েছেন, বাজপড়া তালগাছের মত তাঁর অবস্থা। সব ডালপাতা শুকিয়ে গেছে, আগুনে পোড়া বিবর্ণ কাণ্ডটাই যেন কোনমতে টিকে আছে।

দাদু আর কাছারি বাড়িতে তাঁর খাসকামরায় বসেনও না। শশীগোমস্তাই এখন সেরেস্তায় বসে দু'একজনকে নিয়ে টিমটিম করে কাজকর্ম দেখে। কাগজপত্র দোতালায় দাদুর কাছে নিয়ে যায়।

হরষিত নায়েব এখানের কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে। তার নিজের গ্রামেই এখন জমিদার হয়ে বসেছে।

বড় বাড়ির সেই ঔজ্জ্বল্যও আর নেই। ঈশ্বরচন্দ্র আজ বুঝেছেন জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি নিজের ভুলেই নিঃস্ব হয়ে গেছেন। বৈঠকখানায় গানের সুরও থেমে গেছে।

এবার আসে খরচ কমাবার পালা। এতদিন এত বড় বাড়িতে ছিল বহু কাজের লোক, পাইক পেয়াদা। অন্দরেও কাজের মেয়ে—আশ্রিতের সংখ্যা কম ছিল না। এবার সব পাইক-পেয়াদাদেরও জবাব দিতে হল।

তাদের চোখে জল। তারা বলে—কর্তাবাবু এতদিন আপনার নিমক খেয়েছি। এখন কোথায় যাব?

কর্তাবাবু এর জবাব কি দেবেন জানেন না।

বৃদ্ধ বলেন—আমার সামর্থ্য আর নেই। তোরা অন্যত্র কাজের চেষ্টা করগে।

শশীগোমস্তা বলে—মাইনে দেন না দেন ক্ষতি নাই। আমাকে আপনার সেবা করতে দেন বাবু। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দেন। যা আছে এখনও দেখভাল করলে বাকী দিনগুলো এবাড়ির মানুষদের চলে যাবে। সেটুকু করতে দিন।

ঈশ্বরবাবু বলেন—শশী, একজন সর্বস্ব নিয়ে চলে গেল। আর তুমি সর্বস্ব দিয়ে এখানে পড়ে থাকবে?

শশীগোমস্তা আর ন্যাপাসর্দার যেন এক গোত্রেরই। ন্যাপাসর্দার বলে—আমিও থাকছি। মেরে তাড়ালেও ন্যাপা দুর্দিনে আপনাকে ছেড়ে যাবে না।

ন্যাপা, শীতল তেওয়ারী আর কাছারিতে জগন্নাথ রয়ে গেছে। আর আছে শিবু মাসী। ও কেদারদের ছেড়ে যাবে না।

গিন্নীমাও পুত্রশোকে ভেঙে পড়েছেন।

জগৎমোহিনী মাকে সামলাবার চেষ্টা করে। তার মেয়ে হেমলতাই এখন দিদিমার সঙ্গিনী। বড় বাড়িটার সব আনন্দ যেন হারিয়ে গেছে।

কুমারবাবুর প্রিয় ঘোড়াটা আস্তাবলে রয়েছে। রোজ ভোরে কুমার ওকে নিয়ে বের হতেন। ঘোড়াটাও বুঝেছে আর তার মালিক নেই। ভোরে এখনও সে ডাক পাড়ে, কিন্তু কেউ তাকে নিয়ে বের হয় না।

ঘোড়াটা চুপচুপ পা ঠোকে। সহিস দানাপানি দেয়, যেন খেতেও তার রুচি নেই।

কেদার দেখে ঘোড়াটার চোখেও যেন জল নামে। অবলা প্রাণীর কাছেও সেই মৃত্যু এক বিষাদের আভাস আনে।

হাতিশালে শিবচন্দ্র তখনও রয়েছে। বয়সও হয়েছে তার। তখন দেখেছে কেদার পুজোর সময়, উৎসবে তাকে সাজানো হতো। বিদেশী বাজনার দল আসতো, তাদের আগে শিবচন্দ্র যেতো—যেন মিত্রমুস্তাফি পরিবারের সম্মান ছিল ওই বিশাল জীবটি।

ওর পিঠে হাওদা বসিয়ে তারাও চাপতো। পুণ্যাহের দিন শিবচন্দ্রের জন্যও নজরানা আসতো—বোঝা বোঝা আখ, কলার কাঁদি—কলাগাছ।

শিবচন্দ্র শুঁড় তুলে সম্মান জানাতো তাদের। জমিদার বাড়ির জীবন্ত প্রতিভূ সে।

হঠাৎ সেদিন সকালেও, শিবচন্দ্র নদীতে স্নান করে, নিজের খোরাক কিছু ডালপাতা সংগ্রহ করে আনে। কিন্তু দুপুরের পরই শুয়ে পড়ে। আর কাতর আর্তনাদ করতে থাকে। কবরেজ মশায়ও আসেন। কেদার-অভয়রাও এসেছে।

শিবচন্দ্রের সব আর্তনাদ ক্রমশ স্তব্ধ হয়ে যায়। এতবড় জীব—এতদিন পর এবাড়ির মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। মিত্রমুস্তাফি মশায়ও নেমে আসেন। শিবচন্দ্র শেষ বারের মত শুঁড় তুলে তাকে শেষ নমস্কার জানিয়ে মারা গেল।

ঈশ্বরচন্দ্র বলেন—এ বাড়ির এবার সব কিছু যাবার পালাই সুরু হল! সবই হারিয়ে যাবে।

বৃদ্ধ নীরব শোকে যেন ভেঙে পড়েন। কেদার দেখছে এই সব হারাবার দৃশ্যটাকে। সবকিছু প্রতিষ্ঠা-ধন-জন সব যেন অলীক স্বপ্নই। এই আছে এই নেই।

ঈশ্বর মিত্রমুস্তাফি আস্তাবলের মধ্যে কুমারের ঘোড়াটাকে দেখেন। তেজী সরেস জাতের ঘোড়া। কোন ঘোড়ার ব্যবসায়ী এসেছেন, যদি এটাকে বিক্রী করে দেন ভালো দামই দেব।

ঈশ্বর মিত্র বলেন—শশী, তাই দাও। শিবচন্দ্র গেল। আর ওসব পশুপালন করে লাভ নেই। ওটাও কোনদিন বেঘোরে মারা পড়বে। ওসব বিদেয় করে দাও।

সেই প্রিয় ঘোড়াটাকেও বিক্রী করে দিতে হল।

শূন্য হয়ে গেল হাতিশালা-ঘোড়াশালা। জমিদার বাড়ির হাতিঘোড়ার অস্তিত্ব কাহিনীতেই পরিণত হয়ে গেল।

বৈদ্যশালাও উঠে গেল।

কবিরাজদের খরচ যোগাতে পারেন না ঈশ্বর মিত্র। তাঁর স্বপ্ন ছিল গরীব প্রজারা চিকিৎসা, ওষুধ যাতে তারা সবাই পায় এখানে প্রজারা তাই এত খরচ করে বৈদ্যশালা, গবেষণাগার গড়েছিলেন। সে সবও বন্ধ করে দিতে হল।

॥ ১২ ॥

তখন গ্রামে মাঝে মাঝেই কলেরা বসন্ত এসব মহামারী আকার ধারণ করতো, পানীয় জলের যোগান আসত সাধারণ পুকুর কিংবা নদী থেকে। স্বাস্থ্যবিধিও তেমন মানা হতো না গ্রামগঞ্জে। ফলে একবার ওসব রোগ শুরু হলে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় ওই রোগ ক্রমশ বেড়েই যেত গ্রাম-গ্রামান্তরে নানা ভাবে।

ফলে অনেকেই মারা পড়তো। এ ছাড়া ম্যালেরিয়া-কালাজ্বরের প্রকোপও কম ছিল না। মানুষজন বিনা চিকিৎসাতেই মারা পড়তো। ধনী দরিদ্র বলে বিশেষ কোন বাছবিচার ছিল না। হঠাৎ অভয় আর হরিদাস অসুস্থ হয়ে পড়লো। তখন গ্রামে তত বৈদ্য আর নেই। ওষুধপত্রও তেমন তৈরী হয় না। মিত্রমুস্তাফি প্রাসাদে তখন সর্বনাশের কালো ছায়া নেমেছে।

জগৎমোহিনীও ভাবনায় পড়ে।

স্বামীও চাকরির কাজে বাইরে, বাড়ির কর্তা নিজেই শোকে-জরায় প্রায় শয্যাশায়ী। তিনটি শিশুকে নিয়ে সে রয়েছে অসহায় অবস্থায় বাবার আশ্রয়ে।

শশী গোমস্তা জগদীশ তবু রানাঘাট থেকে ডাক্তার আনে। শিবুও সেবাযত্নের ত্রুটি করে না। কিন্তু ছেলে দুটিকে বাঁচানো গেল না। অভয়-হরিদাস কয়েকদিনের ব্যবধানে দুজনেই মারা গেল।

কেদার ভাবতেই পারে নি যে শেষ অবধি তার দুই ভাইও তাকে ছেড়ে চলে যাবে। এতদিন একসঙ্গে মানুষ হয়েছে, কত সুখদুখের সঙ্গী, একসঙ্গে জীবনের এতগুলো দিন কেটেছে তাদের, তারাও এইভাবে চলে যাবে তা ভাবতেও পারে নি।

আজ সে একা নিঃসঙ্গ, বাড়িতে রইল একমাত্র তার ছোট বোন হেমলতা।

সারাবাড়িতে আর অভয়-হরিদাসের কলরব উঠবে না।

বাগানের গাছে গাছে তাদের হৈ-চৈ—পুকুরের জলে সাঁতার কাটা—চূর্ণিতে নৌকাবিহার

এসব খেলাতেই আর তাদের দেখাও যাবে না।

এই জগতের সব খেলা শেষ করে তারা অন্য কোন্ জগতের পথে হারিয়ে গেল যে পথের সন্ধান কেদার জানে না। এই জগতে তার আপন অতিপ্রিয় যারা ছিল তারা একে একে চলে যাচ্ছে।

কেদার জগন্নাথের সেই ঘরে প্রতিষ্ঠিত শ্রীচৈতন্যমূর্তির দিকে চেয়ে থাকে। জগন্নাথ বলে—সব হারালেই তো তাঁকে পাওয়া যায় গো।

কিশোর কেদার-এর মনে কি দুঃসহ বেদনা। বলে সে,—তাকে পেলেই সব দুঃখ ঘুচে যায়?

জগন্নাথ ওর চোখের জল মুছিয়ে বলে,—হ্যাঁ গো। তিনিই সত্য, জগৎ মিথ্যা। এ জগতের সব কিছুই হারিয়ে যায়। কোন মূল্যই এসবের নেই। তিনিই জগৎপ্রভু, তিনি কৃষ্ণ। তিনিই যাকে ইচ্ছা দেন—যাকে ইচ্ছা রাখেন। তিনিই দাতা-গ্রহীতা। সব কিছুর মূল।

—তবে আমার সব কিছু কেড়ে নেন কেন? কেন মামাবাবু, অভয়দা, হরিদাসদের নিলেন তিনি?

এর জবাবে জগন্নাথ বলে, সবই তাঁর ইচ্ছা। গাছের ওই পাতা দেখছ, সেটাও বোধহয় বাতাসেই নয়, তাঁর ইচ্ছাতেই নড়ছে। তোমাকে দিয়ে কিছু মহৎ কাজ করাবেন তিনি—তাই রেখেছেন।

কেদার এসব যুক্তি মানতে চায় না।

পরশুরাম দাদুর ওখানেও যায়। তিনি এক বিচিত্র মানুষ। হিন্দু ধর্মগ্রন্থও পড়েন, কোরান তাঁর মুখস্থ। মৌলবীর কাছে ফার্সী শিখেছেন, আবার বাইবেলও পড়েন। উপনিষদ-বেদান্ত তাঁর পড়া। কিশোর কেদারের মনের নীরব এই হাহাকার তাঁর মনকে স্পর্শ করে।

বলেন, মৃত্যুকে মেনে নিয়েই জীবনের পথে চলতে হবে কেদার। আমরা তো মৃত্যুঞ্জয় হতে পারি না—তবে মৃত্যুসহ হয়ে উঠেছি।

রাজপুত্র গৌতম এমনি জরাগ্রস্ত মানুষ আর মৃত্যুকে দেখেই সংসার ত্যাগ করেছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে মানুষকে মৃত্যু থেকে অমৃতলোকের সন্ধান দিয়েছিলেন।

ভগবান বুদ্ধের কথা এই প্রথম শোনে কেদার।

এখানেও সেই অহিংসা আর প্রেমের বাণীর কথা শুনে কেদার বলে—চৈতন্যদেবও তো এমনি কথাই বলেছেন এতকাল পরও।

পরশুরাম দাদু বলেন,—সব ধর্মই তো মূলে এক গো। সে মহম্মদই বল, যীশুই বল আর কৃষ্ণ-চৈতন্যদেবই বল। সবারই একই কথা। আমরা ভিন্ন চোখে দেখি।

সনাতন হিন্দুধর্ম সেই বেদের কাল থেকে আজ অবধি সেই কথাই বলেছে। আমরা গ্রহণ করি নি। এই চৈতন্যদেব কলিযুগে মানুষকে জাত-পাত-ধর্মের সব বাঁধন ভেঙে ভালোবাসতে বলেছেন, মানুষের মন কি তা গ্রহণ করেছে? আজ তাঁর কথা কেউ বলে না—যারা বলে, তারা বলে অন্য কথা। বিকৃত কথা। তাঁর বাণীই জগৎসংসারকে শান্তির সন্ধান দিতে পারে। কিন্তু তা আমরাই গ্রহণ করি নি। তাঁর ধর্মকে অবলুপ্তপ্রায় করেছি।

—তাহলে সেই ধর্মমত কেউ পুনঃপ্রচার করে না কেন?

কেদারের কথায় পরশুরাম বলেন,—হয়তো তাঁর ইচ্ছাতেই একদিন তা সম্ভব হবে। তাঁর ইচ্ছাতেই এসব অবলুপ্ত হয়েছে, আবার তাঁর ইচ্ছামত কেউ সেই সবকিছুকে আবার পুনরুদ্ধার করে সারা দেশবিদেশের মানুষের কাছে পুনঃপ্রচার করবে, অমৃতের সন্ধান এনে দেবে।

—কে সে?

কেদারের প্রশ্নে হাসেন বৃদ্ধ। বলেন—তা তো জানি না। তিনিই জানেন, সময় হলেই তিনিই তেমনি যোগ্য কাউকে পাঠাবেন, হয়তো সে এসেও গেছে। তার সন্ধান জানি না।

উলাগ্রাম থেকে বহুদূরে তখন উড়িষ্যার এক গণ্ডগ্রামেও জীবনযাত্রা নিজের খাতে বয়ে চলেছে। কটক থেকে দূরে ছোট্ট নদীর ধারে সবুজ ছায়া ঘেরা ছোট গোবিন্দপুরে রাজবল্লভ দত্ত মশায় নিজের ছোট্ট জমিদারীর মধ্যেই সাধকের মতই জীবনযাপন করেন।

ধর্মপুস্তক আর পূজাপাঠেই তাঁর সময় কেটে যায়। এখন তিনি একাহারী। আহারও খুবই সামান্য। রাত্রে কিছু অন্ন—না-হয় দুধে কিছু খেজুরসেদ্ধ তাই খেয়েই দিন কাটে ধ্যান-পূজাদির মধ্যে।

তবু সব কাজের ফাঁকেও তাঁর ছেলে আনন্দমোহনের কথাও মনে পড়ে। তার খবরাখবরও পান। আনন্দমোহনকে এখানে তিনি রাখতে পারেন নি। তার দ্বিতীয়া স্ত্রী বাপের বাড়ির বেশ কিছু জমিদারী মহাল পেয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে, আর সেইসব মহালের দেখাশোনাও আনন্দমোহনই করতো। এইখানেই সৎমায়ের আপত্তি ওঠে। তাঁর নিজের লোকজনও কিছু প্রশ্ন তুলতে আনন্দমোহন নিজেই ওসবের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে উলাগ্রামে চলে গেছে।

রাজবল্লভও ছেলের এই সততার পরিচয়ে খুশীই হন। এতকাল দ্বিতীয়া স্ত্রীর লোকজন সেইসব ভোগ করেছে। আনন্দমোহন তখন মুর্শিদাবাদে আপ্রাণ চেষ্টা করছে নিজের ভাগ্য ফেরাতে।

কিন্তু ভাগ্য তার ফেরে নি। বরং নিষ্ঠুর পরিহাসই করেছে নিয়তি তার সঙ্গে। এখন তার শ্বশুরবাড়ির অবস্থাও খুবই খারাপ। তাদেরও সর্বস্ব চলে গেছে।

ঈশ্বর মিত্রের ডানহাতই চলে গেছে একমাত্র যোগ্য সন্তানের মৃত্যুতে। আনন্দও একে একে তিন ছেলেকে হারিয়েছেন। তবু সামান্য রোজগারের আশায় কোন এক বিদেশী কুঠিয়ালের কুঠিতে চাকরি নিয়ে দুর্গম পল্লীঅঞ্চলে পড়ে আছেন।

রাজবল্লভ এসব খবরও কিছু পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর এতদিন করারও কিছু ছিল না। এইবার সেই সুযোগই আসে।

রাজবল্লভের দ্বিতীয়া স্ত্রী বেশ কিছুদিন ধরে শয্যাশায়ী। রাজবল্লভের এই পক্ষের কোন সন্তান নেই। রাজবল্লভ তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর ব্যবহারে মোটেই খুশী ছিলেন না।

তবু তাঁর অসুখের সময় চিকিৎসার কোন ত্রুটিই করেন না। তাঁর এস্টেটের গোমস্তা লালু চক্রবর্তীকে কটকে পাঠান, বড় ডাক্তারও আনা হয়। বাড়ির সব কাজের ভার স্থানীয় পরমেশ্বর মহান্তির উপর। রাজবল্লভ তাদেরও নানা দিকে ছুটিয়ে ডাক্তার, ওষুধ পথ্যাদির ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু অসুখ ক্রমশ বাড়তেই থাকে। এবার ভদ্রমহিলাও বুঝেছেন এতদিন যাদের উপর ভরসা করেছিলেন, বিপদের সময় তাঁরা কেউই পাশে নেই। স্বামীই সব কিছু করেছেন তাঁর জন্য। অথচ তাঁকেই পুত্রের কাছ থেকে তিনিই কেড়ে নিয়েছিলেন। ধীরস্থির ঋষিকল্প মানুষটি এ নিয়ে স্ত্রীর কাছেও কোনদিন কোনও অভিযোগ করেন নি।

এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে ভদ্রমহিলা স্বামীকে বলেন,—আমার যা কিছু সম্পত্তি, জমিদারী সবই আনন্দকেই দিয়ে যেতে চাই। তুমি উকিলবাবুকে খবর দাও, উইলই করবো। রাজবল্লভ দত্ত স্ত্রীর কথায় অবাক হন।

—কি বলছ তুমি!

ওঁর স্ত্রী বলেন—এতদিন মস্ত ভুল করে এসেছি। আজ শেষদিনে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই।

লালু চক্রবর্তী ছুটলো সদরে উকিলবাবুকে আনতে। সেও খুশী হয়েছে গিন্নিমায়ের এই সুমতিতে। এতকাল বারোভূতে সব লুটেপুটে খেয়েছে আর এ বাড়ির সন্তান আনন্দমোহন সব কিছু থেকে বঞ্চিতই হয়ে এসেছে।

সেও চায় ছোটবাবু এবার এখানে এসে জমিদারী, দেবসেবা এসবের ভার নিন। রাজবল্লভবাবু এর মধ্যে এই গ্রামে মন্দির অতিথিশালা এসবও করেছেন।

ছোটবাবু এলে সবকিছুই সুষ্ঠুভাবে চলবে। তাই চায় লালু চক্রবর্তী, পরমেশ্বর মহান্তিও। গিন্নিমার ইচ্ছামত উইলও হয়ে গেল। তাতে আনন্দমোহনকেই তাঁর ছটা মহাল-খাস জমি সবই দিয়ে গেলেন তিনি।

এর ক'দিন পরই মারা গেলেন নতুন গিন্নিমা।

উড়িষ্যা থেকে তখন পশ্চিমবাংলায় যাতায়াতের পথ বেশ সুগম ছিল না। তাই তখুনিই খবর দেওয়া গেল না। শেষ কাজ সব চুকে যাবার পর লালু চক্রবর্তীই বলে রাজবল্লভকে—এবার ছোট বাবুকে এখানে আনাই। এস্টেটপত্র বুঝে নিক।

রাজবল্লভ এবার চান আনন্দমোহন সপরিবারে এখানে এসে এখানের কাজকর্ম বুঝে নিক, তিনি এসবের থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনের বাকী কটা দিন জগন্নাথদেবের নাম নিয়েই কাটিয়ে দেবেন। শেষ বয়সে তবু ছেলে-নাতি-নাতনীদের মধ্যে দিন কাটাবেন, যা এতদিন পারেন নি। তাই রাজবল্লভ দত্ত বলেন,—

দূরের পথ, লালু পরমেশ্বরকেও সঙ্গে নাও। তবু ও সঙ্গে থাকলে ফেরার সময় আনন্দ-বৌমা-নাতি-নাতনীদের কিছু সুবিধা হবে। আর সেখানে বেশিদিন দেরী করো না। এদের নিয়ে তাড়াতাড়িই ফিরবে।

লালু চক্রবর্তী বলে,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন কর্তামশায়, মোটেই দেরী হবে না। ছোটবাবুদের নিয়ে তাড়াতাড়িই ফিরে আসবো।

ওরা বের হয়ে পড়ল উলাগ্রামের উদ্দেশে। দীর্ঘপথ পাড়ি দিতে হবে। একটা মস্ত সুখবর নিয়েই চলেছে তারা আনন্দমোহনের জন্য।

॥ ১৩ ॥

আনন্দমোহন এসবের কিছুই জানেন না। তিনি তখন দূর কোন গ্রামের খড়ের ছাউনির কাছারিঘরে ফারলন সাহেবের জমিদারীর হিসাব রাখতে ব্যস্ত। সামান্য মাইনে—আর খাটুনি খুবই বেশি।

রোদেবৃষ্টিতে গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরতে হয় খাজনা আদায়ের কাজে, খাবারও ঠিক নেই। তবু কিছু টাকার জন্যই এই কাজ করতে হয়।

বেশ কিছুদিন থেকে জ্বরও আসছে। পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসার তেমন কোন ব্যবস্থাও নেই। দু-চারটে শিকড় শিউলি বাসক পাতার রস, এই সবই খেয়ে কাজে যায়।

ক্রমশ শরীর ভেঙে পড়ে আর জ্বরও বাড়ে। বিছানা নিতে হয়। সেই শয্যাশায়ী অবস্থাতেই ফারলন সাহেব কোনোমতে দায়িত্ব এড়াবার জন্যই জ্বরে বেহুঁশ আনন্দমোহনকে পাল্কীর ব্যবস্থা করে উলাগ্রামের বাড়িতে পৌঁছে দেয়।

জগৎমোহিনী স্বামীর এই অবস্থা দেখে চমকে ওঠে। মানুষটাকে যেন চেনাই যায় না। বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে। সুন্দর বর্ণও কালিঢালা হয়ে গেছে।

শশী গোমস্তা আর জগন্নাথ এখন এ বাড়ির দেখভাল করে। ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র এখন নিজেই

অসুস্থ, স্থবির। নিজের ঘরেই থাকেন দিনরাত। সংসারের কোন খবরই রাখার মত মানসিক অবস্থাও তাঁর নেই। সংসারের বোঝাই এখন তিনি। নিঃসঙ্গ একক একটি ধ্বংসস্তূপ।

জগৎমোহিনীর মা'ও এককালে রানীমা ছিলেন এই প্রাসাদের। আজ তার অবস্থাও করুণ। সব হারিয়ে কোনমতে বেঁচে আছেন মাত্র। জগৎমোহিনীই নিজের কিছু অলঙ্কার বিক্রী করে স্বামীর চিকিৎসা করাচ্ছেন, কেদারও বাবার সেবা করে।

সবসময়ই বাবার ঘরে থাকে, ওই অসুস্থ মানুষটির পাশে। হাসিখুশী সেই মানুষটা আজ যেন হারিয়ে গেছে, স্তব্ধ অসাড় দেহ—শুধু বুকটাই কাঁপে জীবনের ক্ষীণতম স্পন্দন নিয়ে।

এমনই দিনে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে কলকাতা থেকে নৌকায় এসে পৌঁছলো উড়িষ্যা থেকে লালু চক্রবর্তী আর পরমেশ্বর মহান্তি সেই সুখবর নিয়ে।

আনন্দমোহনের দিন এবার ফিরেছে। সে আবার তার জমিদারী—সব মহাল ফিরে পেয়েছে। উড়িষ্যায় গিয়ে সেখানেই বসবাস করতে হবে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে। বাবা রাজবল্লভ দত্তও তাদের পথ চেয়ে আছেন। আবার তার সংসার ফুলে ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

কিন্তু কাকে এই সুসংবাদ দেবে তারা?

আনন্দমোহনের জীবনের দিনই ফুরিয়ে এসেছে। যাযাবরের মত পথে পথে ঘুরে অন্ন সংগ্রহের লড়াই-এ তিনি আজ পরাজিত, ক্লান্ত, নিঃস্ব। সেই নিঃস্বতা নিয়েই তাঁকে শূন্য হাতে এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে ফিরে যেতে হবে।

তিনি জানতেও পারলেন না যে তাঁর জীবনেও সুদিন এসেছিল। অন্ধকার রাত্রিতে তারার আলো জ্বলে। স্তব্ধতা নেমেছে বিরাট এই বাড়িতে। জেগে আছে জগৎমোহিনী স্বামীর শয্যাপাশে। কেদার ঘুমুচ্ছে।

জেগে আছে লালু চক্রবর্তী। সে এসেছে তাদের ছোটবাবুকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু আনন্দমোহন আর ফিরে যাবে না কোনদিনই সেখানে।

সে আজ কোন্ অমৃতলোকের যাত্রী। আকাশের সীমান্তে তারার আলোভরা অসীমে সে হারিয়ে গেল চিরদিনের জন্য। পিছনে পড়ে রইল সব বৈভব, তার স্ত্রী, সন্তান কেদার আর হেমলতা।

ভোরের আলো ফোটার আগেই সব শেষ হয়ে গেল।

ঘুম ভাঙে কেদারের। শোনে সেই সংবাদ। ছুটে যায় বাবার ঘরে। তখন সব শেষ। আবার দেখছে কেদার মৃত্যুর শান্ত সংহত রূপটিকে। বহু মৃত্যু যেন তার অন্তরে এক নিঃস্বতার বেদনাই আনে।

শান্তিপুর শ্মশানে আনা হয় শবদেহ। লালু চক্রবর্তী পরমেশ্বর মহান্তির চোখে জল নামে। এসেছিল তারা একটা সুখবর নিয়ে, ফিরে যেত এদেরকে নিয়ে—কিন্তু তা হয় নি, সব আশা তাদেরও হারিয়ে গেল।

চিতা জ্বলে ওঠে। বালক কেদার নিজের হাতে বাবার অগ্নিসংস্কার করে। মনে পড়ে বাচস্পতি-মশায়ের কথা ঃ

আত্মা অবিনশ্বর। অস্ত্র একে ছেদ করতে পারে না—অগ্নি একে দহন করতে পারে না—শুধু পরিত্যক্ত দেহটাকে দগ্ধ করে মাত্র। আত্মা অবিনশ্বর। তার বাবাও বেঁচে থাকবেন তার অন্তরে। কেদারের মন তবু মানে না। চোখে নামে জলের ধারা, মায়ের সাদা থান পরা নিরাভরণ মূর্তি দেখে চমকে ওঠে সে। আজ কেদারের মাথার উপর ওই মা ছাড়া আর কেউ রইল না।

ঈশ্বর মিত্র সবই শোনেন স্তব্ধ পাথরেব মূর্তির মত। কোন চেতনাই যেন তাঁর নেই। আজ ধন-জন-প্রতিষ্ঠা সবই তাঁর হারিয়ে গেল। কেদারও দেখে আর অনুভব করে মনে মনে—ধন-জন-যৌবন-প্রতিষ্ঠা এসবের কোন মূল্যই নেই। এ যেন পদ্মপাতায় জল। টলমল করে নিমেষেই আবার জলে মিশিয়ে যায়।

এসবের কোন অর্থই নেই, তবে জগতে পরমার্থ কি? সত্য কি? কিসের সন্ধান করবে মানুষ?

বৈকাল নামে পরশুরাম দাদুর আশ্রমে।

বৃদ্ধ বলেন—ঈশ্বরই সত্য, তাঁকেই সন্ধান করে মানুষ। তাঁর স্পর্শ পেলেই জীবন সার্থক হয়ে ওঠে।

আমরা বলি শ্রীকৃষ্ণ ভগবান, মুসলমানরা বলে আল্লা, বাইবেল বলে যীশু। যে ভাবেই ভজনা কর না কেন তিনি এক—বেদান্ত তাঁকে বলে ব্রাহ্মণ।

কেদার সব শোনে, কিন্তু সান্ত্বনা পায় না।

এখন বাড়িতে সে একা, বোন হেমলতা বড় হচ্ছে, সে থাকে দিদিমার সঙ্গে। বৃদ্ধা সব হারিয়ে ওকে নিয়েই দিন কাটান। আর ঈশ্বরবাবুরও শরীর ভেঙে পড়েছে, এখানের কবরেজ তাঁর চিকিৎসা করে, কিন্তু ফল কিছুই হয় না।

জগৎমোহিনীর উপরই এখন এই সংসারের ভার পড়েছে। তখন বাড়িভর্তি লোক—কাজের লোক, রান্নার লোক—আশ্রিতদের ভিড়ে বড় বাড়িটা গমগম করতো। এখন কেউ নেই—একমাত্র শিবুই টিকে আছে। জগৎমোহিনীকেই এখন নিজের হাতে কাজ করতে হয়।

এই অবস্থা তার হতো না, অনায়াসে সে ফিরে যেতে পারতো কেদার, হেমলতাকে নিয়ে তাদের উড়িষ্যার জমিদারীতে। সেখানে সুখেশান্তিতে প্রাচুর্যের মাঝে থাকতে পারত জগৎমোহিনী।

কিন্তু মা আর অসহায় নিঃস্ব অসুস্থ বাবাকে ফেলে সে যেতে চায় নি। কেদারও দেখেছে মায়ের এই স্বার্থত্যাগ, তাই মনে মনে মাকে কেদার শ্রদ্ধা করে।

জগৎমোহিনী লালু চক্রবর্তীকে বলে,—এসময় এই বিপদের মধ্যে মা-বাবাকে ফেলে যাওয়া আমার উচিত হবে না চক্রবর্তী মশায়। বাবাকে বুঝিয়ে বলবেন, সময়মত ঠিকই আমরা যাবো সেখানে। এখন সম্ভব নয়।

লালু চক্রবর্তীও বুঝেছে সব। সেও বলে,—আপনি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন মা। কর্তাবাবুকে গিয়ে সবই বলবো। এক আশা নিয়ে এসেছিলাম, ফিরে যাচ্ছি শূন্যহাতে এক চরম দুঃসংবাদ নিয়ে।

ওরা চলে যায় উড়িষ্যায়।

জগৎমোহিনী এখন এবাড়ির শূন্যপুরীতে রয়েছেন হয়তো আরও কিছু ঘটার অপেক্ষায়।

কেদারকে নিয়েই ভাবনা। পড়াশোনাতেও মন নেই। কেদার এখানে ওখানে ঘোরে। সেদিন এসেছে গোলক দাসের আশ্রমে। লোকজন বিশেষ নেই। গোলক আসনে বসে আছে, ওকে দেখে চাইল। বলে সে—এসো খোকাবাবু!

গোলকের চোখে যেন বিহ্বল দৃষ্টি। বলে সে—

—তুমি যাওনি তাহলে?

মাথা নাড়ে কেদার। বলে, এখানেই থাকছি।

হাসে গোলক সাধু। বলে, এখানে থাকা তোমার হবে না খোকাবাবু, এই উলাগ্রামে কালে কোন মানুষই থাকবে না। এখানে নেমে আসবে ধ্বংস আর মৃত্যুর কালো ছায়া।

—সে কি!

সাধু বলে—কিন্তু তুমি হবে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ। তাঁর নির্দেশে তোমাকে বিশাল কর্মযজ্ঞে নামতে হবে। তুমি কি যে, সে গো—মহৎ প্রাণী।

কেদার ওই রহস্যময় কথাগুলোর অর্থ বোঝে না। আজ সে নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব। সামনে তার কোন ভবিষ্যৎ নেই। বিশাল এক ধ্বংসস্তূপের মাঝে অতন্দ্র প্রহরীর মত পড়ে আছে সে। তাই সাধুর ওই কথাগুলো আজ তার কাছে পরিহাস বলেই মনে হয়।

সাধু মাথা নাড়ে।

—আমার কথা বিশ্বাস করছ না! কিন্তু দেখবে আমার কথা একদিন বর্ণে বর্ণে সত্য হবে।

উড়িষ্যায় ফিরে গেছে শূন্যহাতে লালু চক্রবর্তী আর মহান্তি মশায়। রাজবল্লভ দত্ত সব কথাই শোনেন।

একমাত্র পুত্র আজ তাঁকে ফেলে রেখে কি অভিমানেই যেন চলে গেল। ছেলের জন্য কিছুই করতে পারেন নি তিনি।

রাজবল্লভও বোঝেন বৌমার না আসার কারণটা। লালু চক্রবর্তী বলে,—এত বড় বাড়িতে ওই বুড়োবুড়ি আজ নিঃস্ব অসহায়। তাঁদের ফলে তাই বৌমাও আসতে পারলেন না। বললেন—সময় হলেই আসবেন।

রাজবল্লভবাবু চুপ করে সব শোনেন।

বড় সাধ ছিল নাতি-নাতনীকে দেখার। নাতির কুষ্ঠি তিনি নিজে করেছিলেন। ভবিষ্যৎ-এ বিশাল এক ব্যক্তিত্বময় সম্মানী পুরুষ হবে সে।

তাকে দেখতে বড় সাধ হয়, কিন্তু সেই সময় বোধহয় এখনও হয়নি। সেই সময়েরই প্রতীক্ষায় থাকবেন তিনি।

রাজবল্লভ বলেন,—ততদিন ভূতের বোঝা বয়ে চল লালু। সবই কর্মফল। সেই কর্মফল-এর শেষ না হওয়া অবধি মানুষের করার কিছুই নেই।

তাঁর কথার সুরে হতাশাই ফুটে ওঠে।

॥ ১৪ ॥

জগৎমোহিনীর উপরই এই বড় বাড়ির সব ভার পড়েছে। ঈশ্বরচন্দ্রের অসুখও বেড়ে চলে। একদিন যিনি প্রতাপ-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে রাজ্যপাট চালিয়েছেন আজ তিনি নিঃস্ব।

বৈঠকখানার দরজাও বন্ধ, ধুলো পড়েছে মার্বেল পাথর বাঁধানো চত্বরে। কাছারিবাড়ি ধ্বসে পড়েছে। বাগানে আগাছার জঙ্গল। লোকজন আর নেই। দেউড়ীতে আজ পাহারাদারও নেই, শূন্যপুরী।

সন্ধ্যার আগে মন্দিরে পূজারী এসে ধূপদীপ জ্বেলে টিমটিম করে আরতি সেরে চলে যায়। প্রসাদের আয়োজনও নেই, ভক্তরাও আসে না। সন্ধ্যা থেকে স্তব্ধতা নামে, দু' চারটে শিয়াল অন্ধকারে শিকারের সন্ধানে এদিক ওদিক ঘোরে।

কেদার দেখে নাচঘরে আর গানের সুর ওঠে না।

যন্ত্রগুলো পড়ে আছে—তার ছিঁড়ে গেছে। সব সুর আজ আর্তনাদ হয়ে ওঠে। ঈশ্বরচন্দ্র

শয্যাশায়ী।

শেষ অবধি জগৎমোহিনীই শশী গোমস্তাকে দিয়ে কলকাতায় ভবানীপুরে তাঁর আত্মীয়দের অনুরোধ জানান যদি তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন সেখানে।

মহেশ মিত্রমুস্তাফি এই মিত্রবাড়ির এক শরিক। তাঁদের তরফে এখনও কিছু রয়েছে। এই ঈশ্বর মিত্রের মত তাঁদের সব জনবল-ধনবল এখনও নিঃশেষ হয়ে যায় নি। অন্য শরিকরা জগৎমোহিনীদের এই বিপদে এগিয়ে আসে নি, বরং খুশীই হয়েছে তারা। অনেকে আড়ালে বলে,—ঈশ্বর খুড়ো আয় না বুঝেই রাজত্বি করেছে, এখন বুঝুক মজা।

অন্য শরিকদের কেউ কেউ এবার তাদের খাস জমি-বাগান এসব দখলেরও মতলব আঁটছে।

এদিকে বাবার অসুখ। মহেশ মিত্রই বলেন,—কলকাতায় তোর মামাদের লেখ, এসময় লজ্জা করলে হবে না। মানুষটাকে বাঁচাতে হবে।

জগৎমোহিনী শশীকেই কলকাতায় পাঠায় ওই অনুরোধ করে। বাবার জন্য আজ পরের সাহায্যও নিতে হবে তাকে।

ভবানীপুরের আত্মীয়রা বোধহয় দয়াপরবশ হয়েই ঈশ্বরের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতি দিতে এবার জগৎমোহিনী মায়ের সঙ্গে বাবাকে পাঠাবার জন্য ব্যবস্থা করে। শশী গোমস্তাই নৌকা ভাড়া করে আনে, নিজেদের বজরাও আর নেই।

ঈশ্বর মিত্র এবার বুঝেছেন তাঁর দিন ফুরিয়ে আসছে।

আজ সর্বস্ব গেছে তাঁর, উলাগ্রাম ছেড়ে এবার চলে যেতে হবে। কেদার দেখছে দাদুকে। আজ মনে পড়ে তার নদীর ধারে ছিন্নমূল এক বিরাট বনস্পতির ছবি। তার ডালে বাস করতো কত পাখী, ছায়ায় আশ্রয় পেত কত পথিকজন। সেদিন ঝড়ে উপড়ে পড়ল আর্তনাদ করে, কলরব করে উড়ে গেল শাখাচ্যুত পাখীর দল। ছায়াতে আর পথিক দাঁড়ায় না।

অদৃশ্য কুঠার-এর আঘাতে সব শাখাপ্রশাখা নির্মূল হয়ে গেল। এখন সেখানে ধূ ধূ প্রান্তর, অন্তহীন শূন্যতা।

ঈশ্বর মিত্রের জীবনটাও তেমনি। মিত্র মশায় কাতর কণ্ঠে বলেন—আর কোথাও যাবো না জগৎ মা, এই মাটিতে জন্মেছি, এখানেই আমার সব গেছে, আমাকেও এই মাটিতে মিশিয়ে যেতে দে।

কিন্তু জগৎ বলে—তুমি সেরে উঠবে বাবা। কলকাতায় বড় ডাক্তার বদ্যি আছে। আবার সেরে ফিরবে।

—না রে মা।

তবু যেতে হয় তাঁকে। বলেন তিনি—সাবধানে থাকিস মা। ঈশ্বর তোদের সহায় হোন। কেদারকে কাছে টেনে নেন। আজ বৃদ্ধের চোখে জল নামে। বলেন—

আমার বংশের একমাত্র তুই-ই রইলি দাদুভাই। আমার যদি বিন্দুমাত্র পুণ্যিফল থাকে—তাও তোকেই দিয়ে গেলাম। জীবনে বড় হ, জগতে তোর নামযশ হোক, স্বর্গ থেকেও তা দেখে আমি খুশী হবো—আমার বংশের একজনও আমার আশা পূর্ণ করেছে।

নৌকা ছেড়ে দিল। চূর্ণির ছায়াঘেরা নদীর বুক চিরে ঈশ্বর মিত্র যাত্রা করলেন তাঁর উলাগ্রাম থেকে এক বিষণ্ণ সন্ধ্যায়। পাখীরা ঘরে ফেরে—ঘর ছেড়ে চলে গেল ঘরের মানুষ অজানা পথের সন্ধানে।

জীবন যেন নদীর মতই। কখনও তার গতিপথের দু'ধারে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ জনপদ-গঞ্জ, ঘরের আশ্বাস, মানুষের কলরব, জাগে ভাটিয়ালী গানের সুর—কখনও তার প্রবাহ চলে নির্জন

কাশবন, রিক্তশূন্য প্রান্তরের বুক চিরে যেখানে নিঃস্বতাই তার সঙ্গী।

কেদারের জীবনেও এমনি কত পূর্ণতা, হাসি, আনন্দের সুর ছিল এই বাড়িকে ঘিরে। দোল-এ চলতো রং-এর ফোয়ারা, মত্ত আনন্দ গানের সুর, পুজোর ক'দিন চণ্ডীমণ্ডপ গম্‌গম্‌ করতো বাদ্যিবাজনায়, লোকজনের ভিড়ে।

দাদা, কালিদা, হরিদাস সকলে লুকোচুরি খেলতো বাগানে—এই বড় বাড়িতে। আজ তারা সবাই চিরদিনের মত লুকিয়ে গেছে, আর সাড়া মেলে না তাদের।

মামাবাবুর এস্রাজের করুণ সুরও ওঠে না। নাচমহলও বন্ধ। বাবার সেই রামায়ণ-মহাভারতের গল্পও আর শোনা যাবে না।

হাতিশালাটা ভেঙে পড়েছে। শিবচন্দ্রের মৃত্যুটা মনে পড়ে। সেও চলে গেল।

ছিলেন দাদু। আজ এই নদীর প্রবাহে কোন নৌকায় তিনিও চলে গেলেন। বাড়িটা আজ শূন্য।

মা সে আর হেমলতা। তাদের ফেলে সবাই চলে গেল। কেদারকে একাই এবার থাকতে হবে এখানে। তাকে ফেলে গেছে সবাই জীবনের অজানা পথে। কি নীরব বেদনায় তার চোখে জল নামে।

মনে হয়—ঈশ্বর গড আল্লা—সবাইকে সে জিজ্ঞাসা করবে, কি তার দোষ? কেন তার এই শাস্তি?

জগন্নাথ বলে—এসবই চৈতন্যদেবের ইচ্ছে গো। যাকে আপন করে নিতে চান তার সর্বস্ব আগে কেড়ে নেন। সব হারালে তবেই তাকে পাওয়া যায় গো। তাঁকেই ডাকো।

ভবানীপুরে এসেছেন ঈশ্বর মিত্র। তাঁর চিকিৎসাও চলছে। কিন্তু সর্বস্ব হারিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র নিজেও বুঝেছেন তাঁর জীবন-প্রদীপের তেল ফুরিয়ে এসেছে। তাকে পলতে উস্‌কে জ্বালানো আর যাবে না।

কিন্তু তবু চেষ্টার বিরাম নেই। শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে তাঁর। উলাগ্রামেও খবর পাঠানো হল।

বাবাকে শেষ দেখা দেখার জন্যই জগৎমোহিনী কেদার হেমলতাকে নিয়ে মহেশবাবুকে সঙ্গে নিয়ে চলে এলো কলকাতার ভবানীপুরে।

কেদারের এই প্রথম কলকাতা দর্শন। মনে পড়ে কুমার মামার কথা। তিনিই বলতেন—কলকাতার কলেজে পড়তে যাবি তুই, আমিই তোকে পড়াবো সেখানে।

আজ সে কলকাতায় এসেছে পড়তে নয়। এসেছে মৃত্যুপথযাত্রী দাদুকে শেষদেখা দেখতে। সেই বিরাট মানুষটা আজ পঙ্গু-অসুস্থ। কালই তাঁর সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে।

কেদার দেখে ওই মানুষটিকে। কালীঘাটের গঙ্গায় অন্তর্জলি করা হয়েছে। তিলে তিলে শেষ হয়ে আসে জীবনের স্পন্দন। কোথায় ছায়াস্নিগ্ধ উলাগ্রাম, তার বিশাল বৈভব—সেই সব কিছু থেকে নির্বাসিত বঞ্চিত হয়ে মানুষটা অনাদৃতের মত চলে গেল দূর অজানা পরিবেশে। এখানেই যেন তাঁর জীবনের শেষ শয্যা রচিত হবার নির্দেশ ছিল।

শেষ কাজও হয়ে গেল গঙ্গাতীরে। রিক্তশূন্য পরিবার ফিরে গেল কলকাতা থেকে উলাগ্রামে। সেখানেই ঈশ্বর মিত্রের শ্রাদ্ধাদি হবে।

আজ বিশাল কোন আয়োজনও নেই। নেই বৃষোৎসর্গ, দানসাগর প্রভৃতি ব্যয়বহুল সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। বড় বাড়ির নিচু উঠানে আজ শ্রাদ্ধের আয়োজন হয়।

মন্ত্রধ্বনি ওঠে—আকাশ বাতাস মধুময় হোক, মধু বর্ষণ করুক আকাশ। ধরণীর ধূলিকণা

মধুময় হয়ে উঠুক—মধুময় হোক বনৌষধি। তোমার আত্মা সব জ্বালা যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভ করুক সেই মধুময় পরিবেশে।

মধু নক্তৌ ব পৃথ্বীঃ

পৃথিবী মধুময় হোক।

কেদারের চোখে অশ্রুধারা নামে।

এবার এই বড় বাড়িতে সেই একমাত্র পুরুষ। বাকী তার মা, বৃদ্ধা দিদিমা আর ছোট বোন হেমলতা। কেদারের উপরই যেন সব ভার এসে পড়েছে।

শশীগোমস্তাও বৃদ্ধ হয়েছে। এতদিন সে এই বাড়ির নিমক খেয়েছে, তাই এখনও ছেড়ে যেতে পারে নি। বৃদ্ধ আসে। আর এবার কেদারের মামাবাড়ির অন্য শরিকরাও যেন সুযোগ পেয়ে নানা দলিল দস্তাবেজ বের করে প্রমাণ করতে চায়—ওই জমি আমাদের। তোমার দাদুই দখল করেছিলেন।

বিশু মুখুয্যেও কোন হ্যাণ্ডনোট বের করে এনেছে। এখন তার অন্য মূর্তি। সে বলে—তোমার বাবাকে দু-হাজার টাকা দিয়েছিলাম ব্যবসা করতে। এবার সেটা দেবার ব্যবস্থা করো কেদার। যোগ্য সন্তান তুমি, পিতৃঋণ শোধ না করলে তাঁর আত্মার শান্তি হবে না।

কোন শরিক তো বাগানের কিছুটা জোর করেই দখল করতে চায়। অবশ্য ন্যাপা সর্দার এখনও এ বাড়িতে রয়েছে। শীতল তেওয়ারি রামভক্ত হনুমানের মতোই টিকে আছে এখনও।

ন্যাপা সর্দার বলে—বাগানে কেউ ঢুকলে লাশ দাখিল করে দেব।

তেওয়ারিও গর্জায়—এখনও আমরা মরিনি, দেখি কে আসে দখল নিতে! তারাই ঠেকিয়ে রেখেছে কোনমতে।

কেদার এবার জমিদারীর ঝড়তিপড়তি কাগজপত্র দেখে শশী গোমস্তার কাছে। সামান্য জমি, খাস জমি, বাগান পুকুর যা আছে তা দিয়ে কোনমতে দিন চলতে পারে মাত্র। আর সেই স্বচ্ছলতা প্রাচুর্য তাদের নেই।

অথচ এ বাড়ির নামডাকও এখনও রয়েছে। অনেকেই জানে মিত্রমুস্তাফি বাড়িতে গুপ্তধন রেখে গেছেন, সোনাদানার সঞ্চয়ও কম নেই। তাই চোরডাকাতদের মধ্যেও এ-বাড়ির কথাটা আলোচনা হয়। এই গ্রামের কিছু ধনী লোকও ডাকাতের দল পোষে, তারা এই সব গরীব মানুষদের দিয়ে চুরি ডাকাতি রাহাজানি এসব করিয়ে ওই ডাকাতদের কিছু ভাগ দেয়, আর বাকিটা তারাই আত্মসাৎ করে নিজেদের সম্পদ বাড়ায়।

তারাও তৎপর হয়ে ওঠে। এই বড় বাড়িতে আর পাইক পেয়াদার দল নেই, এবার এখানে নিরাপদে তারা হানা দিতে পারে।

তাই কেদারকেও তৎপর হতে হয়।

এবাড়ির অতন্দ্র প্রহরী শিবু ঝি বলে,

—আঁশবটি হাতের কাছেই রেখেছি, কোন মুখপোড়া এলে কুপিয়ে দু-আধখানাই করে দেব।

ন্যাপাসর্দার শীতল তেওয়ারিকে মাইনে দেবার সাধ্য কেদারের নাই। বাড়ির অনেকেই চলে গেছে।

ন্যাপা বলে—খোকাবাবু, আজ এ বাড়িতে কর্তাবাবা নাই, তাঁকে কথা দিয়েছিলাম যতদিন বাঁচবো তাঁর সেবাই করে যাবো। যা পেয়েছি এখান থেকে তাতে বাকী জীবন আমার কেটে যাবে, এখানেই থাকবো। আমাকে যেতে বল্লেও যাবো না।

শীতল এখন মন্দিরেই থাকে। সেই মন্দির সাফ করে ফুল তোলে, ভগবানের নাম নিয়েই

থাকে। সেও যায় নি।

রাতের অন্ধকারে ন্যাপা তার দু'চারজন সাকরেদকে নিয়ে লাঠিহাতে পাহারা দেয় এই বাড়িতে।

ডাকাত-চোর যারা এই এলাকায় এসব করে তারা জানে ন্যাপা সর্দার একাই একশো। তার লাঠিতে যাদু আছে। তাই ভয়ে তারা এদিকে এগোতে পারে না।

ঘরে বাইরে নানা সমস্যা। শরিকদের দু-একজন কোর্ট-কাছারিতে মামলাও করে—জমির স্বত্ব, পুকুরের স্বত্ব নিয়ে মামলা। জগৎমোহিনীও বিপদে পড়ে। বেশ বুঝেছে নরম মাটিতে বিড়াল আঁচড় কাটবেই। অভিভাবকহীন এই পরিবারের পিছনে তাই লেগেছে অনেকেই নানাভাবে। তাদের শান্তিতে থাকতে দেবে না।

কেদারকেও শশী গোমস্তার সঙ্গে কোর্টকাছারিতে যেতে হচ্ছে। খরচও বেশ হচ্ছে ওইসব মামলার জন্য, যদিও তাদের অনেকগুলোই মিথ্যা, সাজানো।

শশী গোমস্তা এ বাড়ির পুরোনো লোক। হরষিত নায়েব সর্বস্ব নিয়ে গেছে। এখন আবার কোন বাগান জমির দখলের জন্যও মামলা করেছে।

জগৎমোহিনী বিপদে পড়ে।—কি হবে মামা? মামলা মোকদ্দমা জুলুম আর কত সইবো?

শশী গোমস্তা বিচক্ষণ লোক। সে বুঝেছে ব্যাপারটা। এ নিয়ে সেও ভেবেছে। এই অসহায় পরিবারকে রক্ষা করা তার কর্তব্য। অথচ নিজেরও বয়স হচ্ছে, সেই শক্তি দৌড়ঝাঁপ করার ক্ষমতাও কমে আসছে।

শশী গোমস্তা বলে,—মা, এখন কেদারের মাথার উপর তেমন কেউ নেই, তাই এসব জুলুম করছে ওরা। আমি বলি কেদারের বিয়ে-থা দিয়ে দেন ভালো ঘরে, ওর শ্বশুর-সম্বন্ধীরা নামী লোক হলে তাদের ভয়েই এই সব চুনো চিংড়ির দল মিথ্যা মামলার দায়ে ফেলে বিষয়-আশয় নেবাব পথে পাও দেবে না। কড়া গার্জেন দরকার।

কথাটা মনে ধরে জগৎমোহিনীর। শিবুও বলে, মন্দ বলে নি দিদি শশীকাকা। মাথার উপর একটা ছাতা থাকলে রোদবৃষ্টি লাগে না। বিয়ের কথাই ভাবো কেদারের।

কেদারের বয়স তখন বারো বৎসর। বয়সের তুলনায় চেহারাটা বেশ বাড়বাড়ন্তই। আর পাঠশালাতে-স্কুলে সে কৃতি মেধাবী ছাত্র তো বটেই, জীবনের পাঠশালাতেও সে অনেক কিছুই শিখেছে। দেখেছে এই জগতের নিষ্ঠুর রূপটাকে।

শশী গোমস্তা এদিকে বেশ পাটোয়ারী বুদ্ধি ধরে। এই এলাকার অনেক বনেদী পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয়, সেসব জায়গায় তার যাতায়াতও আছে, চেনাজানাও কম নেই। তাছাড়া উলার মিত্রমুস্তাফি পরিবারের নামখ্যাতিও এদিকে প্রভূত। নামী পরিবার।

শশী গোমস্তা দু'চার জায়গায় সন্ধান করে। তখন সমাজে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। মেয়েদেরও কম বয়সে বিয়ে দেবার রীতি ছিল। তাকে বলা হতো গৌরীদান। সব মানী অভিভাবকই তাদের মেয়েদের ন-দশ বৎসর বয়সেই বিয়ের পাট চুকিয়ে দিতে চাইতেন।

রানাঘাটের মধুসূদন মিত্ররা ওই অঞ্চলের নামী পরিবার। অর্থ প্রতিষ্ঠা দাপট তাঁদের আছে। উলা বীরনগরের দিকেও তাঁদের মহাল মৌজা রয়েছে। তাঁরাও উলার ঈশ্বর মিত্র মুস্তাফিদের চেনেন।

তাই তাদের একমাত্র নাতির সঙ্গে মেয়ে সয়ামণির বিয়ের সম্বন্ধ আসতে তাঁরাও খুশী হন। মধুবাবু সদলবলে নিজের পানসীতে উলায় এসে পাত্র কেদারকেও দেখে যান। অপছন্দ হবার

কিছুই নেই। মিত্রবাড়ির দৌহিত্র আর কেদারের পিতৃবংশেরও নামডাক আছে কায়স্থ সমাজে। কায়স্থ সমাজে আন্দুল রাজবংশের খুবই সুনাম।

কেদারের পিতৃপুরুষ সেই বংশের সন্তান—তাঁদের অনেকেই কলকাতার পত্তনের সময় হাটখোলায় এসে বসবাস শুরু করেছিলেন। হাটখোলায় দত্ত পরিবারের বংশধর কেদার, তার পিতামহ রাজবল্লভ দত্ত মশায়ও উড়িষ্যার জমিদার। তাছাড়া লেখাপড়াতেও কেদারের খুবই সুনাম। সাহেবদের ইস্কুলে পড়া ছাত্র, ইংরাজীও ভালো জানে।

সুতরাং এ বিয়েতে আর অমত হয় না। জগৎমোহিনীও রাজী হয়। বলে শশীকে আর মহেশদাকে—তোমরা কি বলো?

মহেশ মিত্রই বিপদে আপদে এই পরিবারের পাশে দাঁড়ান। তিনি বলেন—

শশী ঠিকই সন্ধান এনেছে। মধুবাবু সৎ লোক, সুনাম প্রতিষ্ঠা আছে। নামী বংশ। তুমি এ বিয়েতে মত দাও। জগৎমোহিনীও মত দেয়।

—তাহলে তাই হোক। কিন্তু আমার মাথার উপর তো কেউ নেই তোমরা ছাড়া। তোমাদেরই সব দায় উদ্ধার করতে হবে মহেশদা।

॥ ১৪ ॥

জমিদারবাড়ির কাজ।

আয়পয় নেই, তবু তো ঠাটবাট বজায় রাখতে হবে।

জগৎমোহিনীর নিজের সঞ্চিত অর্থ কিছু ছিল। সুদিনে কিছু সঞ্চয় করে রেখেছিল জগৎমোহিনী। তখন সোনার দামও ছিল অনেক কম।

বাবাও তাকে বেশ কিছু গহনা দিয়েছিলেন।

জগৎমোহিনী তার থেকেই কিছু টাকা দিয়েছিল আনন্দমোহনকে। তার বেশীটা গেছে বিশু মুখুয্যের গ্রাসে। সেই টাকা আজও বিশু মুখুয্যে আর ফেরৎ দেয় নি। আরও কিছু টাকা দিয়েছিল জগৎমোহিনী স্বামীকে মুর্শিদাবাদে ব্যবসা করার সময়।

সেই টাকাও জলে গেছে। তাছাড়া বেশ কিছু টাকা বাবার অসুখে, সংসারের খর্চাতেও ঢুকে গেছে। বাকী রয়েছে সামান্যই। তবু একমাত্র ছেলের বিয়েতে উৎসব অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি রাখে না জগৎমোহিনী।

রানাঘাটের মিত্রবাড়িতেও অনুষ্ঠানের ত্রুটি হয় না।

রানাঘাট প্রাচীন জনপদ, ব্যবসার কেন্দ্র। সেখানের ব্যবসায়ীরা সকলেই প্রায় তিলি তামলী সম্প্রদায়ের। সকলেই ধনী—সম্পদশালী।

তাই জরিবসানো দামী মখমল ভেলভেটের পোশাক-আচকান পরে, কেউ বা চুনোট করা দামী বাহান্ন ইঞ্চির রেলপাড় ধুতি, সিল্কের বেনিয়ান মেরজাই পরে পাত্রপক্ষকে সম্বর্ধনা জানায়। গ্যাসের আলো গড়ের বাদ্যিবাজনাও আছে। নদীর ঘাট থেকে টানা রোশনি দিয়ে সাজানো হয়েছে পথটা।

দীয়তাং ভুজ্যতাং চলেছে।

জমিদারবাড়ির বিয়ের সব জাঁকজমকই হয়।

বিয়ের পর সয়ামণি নতুন বৌ-এর বেশে এল এই শূন্য প্রাসাদে। আজ এ বাড়িতে দাদু নেই—নেই কুমারমামা, বাবাও চলে গেছেন। কেদারের মনে পড়ে অজয়দা, কালিদা, হরিদাসদের

মুখগুলো। এই আনন্দের দিনে তারা আজ শুধু এক করুণ স্মৃতিতেই পরিণত হয়েছে।

সানাই বাজে। মাঙ্গলিকী সানাই।

তাতে যেন শূন্যতার সুরই ফুটে ওঠে। সেই শূন্যতার মাঝে কেদারের জীবনে এল সয়ামণি।

বড়লোকের আদুরে সন্তান। তার বয়সও এমন কিছু বেশী নয়। এখন থেকেই বাবা-মা'ও তাকে কাছছাড়া করতে রাজী নয়। স্বামীর ঘরে মেয়ে তো যাবেই, তবে একটু বড় হোক। ততদিন মা-বাবার কাছেই থাকবে সয়ামণি।

জগৎমোহিনীও কথাটা মেনে নেয়।

দ্বিরাগমনের পর সয়ামণি রানাঘাটেই রয়ে গেল বাবা-মায়ের ওখানে।

কেদার-এর পড়াশোনা আছে।

কেদার উলাতেই থেকে যায়। বিষয়-আশায় যা আছে তাই দেখাশোনা করতে হবে। জগৎমোহিনী জানে এবার তার পুঁজি যা ছিল বিয়েতেই শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।

জমিজায়গার উপরই এখন ভরসা।

আর হেমলতাও বড় হচ্ছে। এবার তার মেয়ের বিয়ের কথাও ভাবতে হবে।

বিয়ের উৎসব জাঁকজমক হৈচৈ এসব কেদারের ঠিক ভালো লাগে না। তার মনের অতলে সর্বদাই যেন কে বলে এগিয়ে যেতে হবে। তাই এখানে নয়—যেতে হবে অন্যত্র, অন্য কোনখানে। তার জানার শেখার করার অনেক কিছুই আছে। এই উলা গ্রামের শান্তসীমিত পরিবেশে বন্দী হয়ে সে থাকতে পারবে না।

মনে পড়ে ক'দিনের দেখা কলকাতা মহানগরীর কথা।

কলকাতাকে ভালোভাবে দেখার সময়ও তার ছিল না। দাদু মৃত্যুশয্যায়, কলকাতা ঘোরার মত মনের অবস্থাও ছিল না তখন। তবু দেখেছে সেখানের জীবনযাত্রাকে। বড় বড় বাড়ি পথেঘাটে কত দেশীবিদেশী মানুষ। বড় বড় স্কুলও দেখেছে। কিন্তু সেখানে যাবার পথ তার জানা নেই।

এই দূর নির্জন উলাগ্রামেই তাকে পড়ে থাকতে হবে। মাঝে মাঝে তান্ত্রিকের আস্তানায় যায়, গোলকবিহারীর কাছেও যায়। গ্রামে নানা উৎসবে তখনও যাত্রা-কবিগান হয়। কিন্তু মিত্রমুস্তাফি বাড়ির সব সুরই থেমে গেছে। আজ অন্ধকারে বাড়িটা একটা পোড়োবাড়ির নির্জনতা নিয়ে টিকে আছে।

গ্রামের অন্যদিকে তবু এখনও গানের সুরে প্রাণের সাড়া জাগে।

কেদার এই নির্বান্ধব পুরীতে সামান্য জমিজায়গার ভার নিয়ে পড়ে আছে। সারা মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এই ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাহীন বন্দীজীবনে।

জগৎমোহিনীও ছেলের এই হতাশাকে বোঝে। গ্রামের আরও অনেক ছেলেদের মত বিয়ে ঘরসংসার আর সন্ধ্যায় তাসপাশা নিয়ে মজে থাকার মত মানসিকতা তার নেই। পড়াশোনা করে মাত্র। দাদু-মামার সংগ্রহে কিছু ধর্মগ্রন্থ উপনিষদ এসব আছে তাই নিয়েই সময় কাটে কেদারের।

এমনি দিনে কলকাতা থেকে কেদারের মেসোমশাই কাশীপ্রসাদ ঘোষমশাই কয়েকদিনের জন্য উলাতে বেড়াতে এলেন। কাশীপ্রসাদ ঘোষ থাকেন কলকাতার হেদুয়া পুষ্করিণীর উত্তর দিকে। বিশাল বাড়ি—বনেদী বড়লোক তারা।

শুধু অর্থসম্পদেই বড় নন কাশীপ্রসাদ, পাণ্ডিত্যের মাপেও বেশ বড়সড় লোক। তখন কলকাতায় শিক্ষাব্যবস্থার আমূল রদবদল হয়ে গেছে। প্রথমে বিশিষ্ট নাগরিকরাই সমবেতভাবে ইংরাজী শিক্ষার জন্য স্কুল চালু করেছিলেন, কারণ তখন সমাজে নতুন শিক্ষাকে গ্রহণ করার

প্রবণতা দেখা দিয়েছে। মিশনারী সাহেবরাও এদেশে শিক্ষার প্রসারে হাত লাগিয়েছেন। রেভারেণ্ড ডাফ ও মিঃ ডাল প্রভৃতির নামও তখন চেনা।

আর ইংল্যাণ্ডে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও এদেশে গেড়ে বসার পরিকল্পনা শুরু করেছে। আগেও বিশেষ করে পলাশীর যুদ্ধের পরেও ইংরেজ ফার্সী ভাষাতেই সরকারি কাজকর্ম চালাতো।

তখনকার দিনে তাই আরবী ফার্সী ভাষা এবং সংস্কৃত ভাষাতেই শিক্ষার প্রচলন ছিল বেশী। তাদেরই বিদ্বান বলা হতো যার' ওই ভাষা জানতেন।

ক্রমশ ইংরেজী ভাষার প্রচলন শুরু করল ইংরেজ। সেকালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সাহেবের মত নিয়ে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন শুরু করল ইংরেজ। রামমোহন রয়ের মত বিদগ্ধ পণ্ডিত মূল আরবী ফার্সীই শিখেছিলেন, তারপর কাশীতে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন, পরবর্তীকালে ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বোধ করায় তিনি ইংরাজীও শেখেন। তা অনেক পরে।

দেখা যায় ইংরেজ তাদের স্বার্থে তাদের সাম্রাজ্য চালাবার জন্য, তাদের ভাবনা চিন্তাধারাকে সমর্থন করানোর জন্যই একটা বিশেষ শ্রেণীকে গড়ে তোলেন। তাই ইংরাজী শিক্ষা প্রচারের জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠলো।

এই বিষয়ে দেখা যায় দেওয়ান কার্তিকেয়চন্দ্র সিংহের মন্তব্যটি খুবই মূল্যবান।

"বহু যত্নের ও পরিশ্রমের ধন অপহৃত হইলে অথবা উপার্জনক্ষম পুত্র হারাইয়া যেরূপ দুঃখ হয়, সেইরূপ দুঃখ এই সংবাদে আমাদের মনে উপস্থিত হইল। অনেক পরিশ্রমপূর্বক যা কিছু শিখিয়াছিলাম তাহা মিথ্যা হইল এবং বিদ্বান বলিয়া যে খ্যাতিলাভের আশা ছিল তাহা নির্মূল হইয়া গেল। পূর্বে আমার পিসতুতো ভ্রাতা শ্রীপ্রসাদকে আমি পারস্য শিখাইতাম, তিনি আমাকে ইংরাজী পড়াইতেন। কিন্তু এ বিদ্যাশিক্ষায় আমার বিশেষ মনোযোগ ছিল না। এক্ষণে পারস্যবিদ্যার আলোচনায় এককালে বিরত হইয়া ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলাম।"

অর্থাৎ আগেকার ফার্সী সংস্কৃত এসবের শিক্ষার চেয়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনই শুরু হল সমাজে। ইংরেজের শিক্ষাই নয়, তাদের প্রবর্তিত আচার, রীতিনীতি, বেশবাস, আদবকায়দা— এমনকি তাদের খৃষ্টধর্মও এদেশের নব্যসমাজে গ্রহণীয় হয়ে উঠলো।

বড়ঘরের বেশ কিছু তরুণ হিন্দুধর্ম ছেড়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলো। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বনেদী ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান, মধুসূদন দত্ত গোড়া হিন্দু জমিদারতনয়—এঁরা খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে সমাজে আলোড়ন তুললেন।

হিন্দুধর্মের পাশাপাশি তখন ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাও হয়ে গেছে। রাজা রামমোহন তার প্রথম উদ্‌গাতা, তারপর জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারও ব্রাহ্মধর্মে যোগ দেন—এগিয়ে আসেন সমাজের উচ্চকোটির বহু মানুষ।

ক্রমশ সংবাদপত্রও প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সমাচার দর্পণ সোমপ্রকাশ আরও বেশ কিছু পত্রপত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষিত সমাজ তাদের মনোভাব ও মতামত, দেশের সমাজের অনেক খবরাখবরই প্রকাশ করতে শুরু করেন।

ক্রমশ ইংরেজী শিক্ষার প্রসার বাড়লো। সমাজের বুকে হিন্দুধর্ম ব্রাহ্মধর্ম খৃষ্টানধর্মের প্রসার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মতাদর্শের সংঘাতও শুরু হল। ইংরাজী পত্রপত্রিকার প্রকাশও চলছে—এই নব্য আন্দোলন-এর মধ্যে কাশীপ্রসাদ ঘোষের অবদানও কিছু ছিল।

কাশীপ্রসাদ নিজেও ইংরেজী ভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি। কলকাতার তদানীন্তন বিদ্বজন সমাজে তাঁর মেলামেশা ছিল ঘনিষ্ঠভাবেই। নিজেও ওই নব্য আন্দোলনের অন্যতম হোতা। তাঁর সম্পাদিত হিন্দু ইনটেলিজেন্সিয়া সাপ্তাহিক পত্রিকা সমাজে আদৃত হয়েছিল। তাঁর ওখানে অনেক নব্য ইংরেজী শিক্ষিত যুবকরা আসতেন লেখালেখির ব্যাপারে, নানা আলোচনাও হতো। আর

এই আলোচনা সভায় নিয়মিত আসতেন মেজর রিচার্ডসন। তিনি ছিলেন লর্ড বেণ্টিঙ্কের দেহরক্ষীদের প্রধান। ইংরেজী সাহিত্যে বিশেষ করে সেক্সপীয়রের নাট্যসাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল, তাই লোকে তাঁকে বলত সেক্সপীয়র রিচার্ডসন।

কাশীবাবু তখন কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের নামী লোক। তিনি উলাগ্রামে গিয়ে কেদারের সঙ্গে আলাপ করে বিস্মিত হন। কেদারের ইংরাজী লেখা—তার ভাবপ্রকাশ এসবের পরিচয় পেয়ে কাশীবাবু চমৎকৃত হন। কাশীবাবু সম্পাদক মানুষ, লেখকের সম্ভাবনার পরিচয় তিনিও পেয়েছেন, তাই বলেন জগৎমোহিনীকে—কেদারকে আরও পড়াও। ওর প্রতিভা এভাবে অজপল্লীগ্রামে পড়ে থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। ওকে কলকাতার স্কুল-কলেজে পড়াবার ব্যবস্থা করো।

জগৎমোহিনী জানে তার সংসারের অবস্থা। সামান্য আয়, তাতে কোনমতে সংসার চলে মাত্র। কলকাতায় পড়াবার খরচ যোগাবার সাধ্য তার নেই।

তাই বলে—জানেন তো আমাদের সংসারের অবস্থা। বাবা মারা যাবার পর জমিদারীও চলে গেছে। কোনমতে দিন চলছে। কলকাতায় পড়াবার ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। এখানেই পড়ে থাকতে হবে কেদারকে।

কাশীবাবু কি ভেবে বলে—তা হয় না জগৎ। কেদারের মত প্রতিভাকে নষ্ট হতে দেওয়া সামাজিক অপরাধ। হয়তো কালে ওর দ্বারাই দেশের কোন বিরাট কার্যই সম্পন্ন হতে পারে। ওকে আমিই কলকাতায় নিয়ে যাবো, আমার বাড়িতে থেকেই ও পড়াশোনা করবে।

—কিন্তু খরচাপত্র দেব কোত্থেকে? জগৎমোহিনী জানায় কাতরকণ্ঠে। মা সেও—স্বপ্ন দেখে তার সন্তান কৃতি হবে। কিন্তু সাধ থাকলেও সেই সাধ্য তার কই।

কাশীবাবু বলেন—খরচার জন্য ভেব না। ওর খরচ আমিই দেব। আর আমার বাড়িতে আমার ছেলের মতই থাকবে কেদার। তুমি অমত করো না।

জগৎমোহিনীর আর আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না।

কেদারও ভাবতে পারে না এইভাবে তার কলকাতায় পড়ার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

মনে হয় এ যেন দৈবেরই কৃপা। এতদিন সারা মন দিয়ে সে এই প্রার্থনা করেছিল দেবতার কাছে, দেবতা তার সেই মনোবাসনা এইভাবে পূর্ণ করেছেন।

ছুটে যায় কেদার জগন্নাথদার ওখানে।

শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তিতে আরতি করছিল তখন জগন্নাথ। প্রদীপের আভায় সেই মূর্তি তখন যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। কেদার লুটিয়ে পড়ে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তির সামনে—তুমি দয়াময় ঠাকুর। তোমার অশেষ কৃপা।

আজ এত দুঃখের অন্ধকারে তবু আলোর সন্ধান পায় কেদার। যে উলাগ্রাম সম্বন্ধে কেদার হতাশ হয়ে পড়েছিল, মনে মনে এখান থেকে বাইরের জগতে যাবার স্বপ্ন দেখতো, এবার সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে।

উলাগ্রাম ছেড়ে এবার যেতে হবে তাকে অজানা মহানগরীতে জীবনের বৃহত্তম সংগ্রামের ক্ষেত্রে। আজ এই ছায়াস্নিগ্ধ গ্রাম—ওলাই চণ্ডীতলা—সবুজ প্রান্তর নদীতীর, উৎসবমুখর সঙ্গীতমুখর গ্রামকে বড় ভালো লাগে।

হরু কবিয়াল, ভূধর পাল, বাউলের সুর, বাঁশবনে বৈকালের হলুদ রোদ, পাখীর কলরব—সন্ধ্যায় গ্রামে হরিকীর্তনের সুর, যাত্রার আখড়ায় ভীমের গর্জন সব কেমন ভালো লাগে।

কিন্তু সেই আকর্ষণ ছেড়ে মা, ছোট বোন হেমলতা, বৃদ্ধা দিদিমা, ন্যাপা সর্দার জগাদা সবাইকে ছেড়ে এক কুয়াসা-ঢাকা ভোরে নৌকায় উঠলো কেদার। দূরের যাত্রী সে। সে জগৎ

কেমন জানে না। তবু সেই অজানা জগতে তার ঠাঁই করে নিতে হবে। পথই যেন টেনে নিল তাকে। পথের গতিতে হারিয়ে গেল এক কিশোর। পিছনে পড়ে রইল ছায়াঘেরা গ্রামসীমা, কেদার বৃহত্তর জগতের পথে হারিয়ে গেল।

ঘাটের ওদিকে বাড়ির ছাদে মা-হেমলতা-দিদিমাদেরও দেখা যায় না। সব চোখের আড়ালে চলে গেছে। নৌকা চলেছে। ঝপ্‌ঝপ্ দাঁড়ের শব্দ ওঠে। কোন্ ভিনদেশী নাও চলেছে গাং-এ— মাঝির ভাটিয়ালী গানের সুর ওঠে। কোন্ বিরহিণী নায়িকা যেন ভাটির দেশে হারিয়ে যায়, প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে কি সুরের যাদুর বিস্তার করেছে।

নদী মেশে সমুদ্রে। তেমনি সব মানুষের স্রোত এসে মিশছে কলকাতা মহানগরীর জনসমুদ্রে। কলকাতার কাছাকাছি এসে কেদার নৌকা-ভড়-সুলুপের ভিড় দেখে। আহিরীটোলার ঘাটে এসে নৌকা থামে।

বাঙালী, উড়িয়া, বেহারী কত দেশের লোকের ভিড়। পাল্কীওয়ালারাও তৈরী। কলকাতার যানবাহন বলতে বেহারাদের পাল্কী আর কিছু ঘোড়ারগাড়ি।

কেদারদের মালপত্র তেমনি একটা ঘোড়ারগাড়িতে তুলে ওরা পাথরের ইট বসানো পাকা রাস্তা দিয়ে আসছে, খপ্ খপ্ শব্দ ওঠে ঘোড়ার খুরের। কোচম্যান হাঁক পাড়ে পথিকদের—তফাৎ যাও।

শহরে তখন কর্মব্যস্ততা শুরু হয়েছে।

গঙ্গাস্নান সেরে লোকজন ফিরছে, পশরা নিয়ে ফেরিওয়ালারা বের হয়। হাঁক ওঠে—চাই তপ্‌সে মাছ!

কেউ বের হয় ফুলমালার বেসাতি নিয়ে। পথের ধারে হালুইকরের দোকানে ঘিয়ের কচুরি হালুয়ার সুবাস ওঠে।

কলকাতাকে দেখছে কেদার বিস্মিত চাহনিতে। এখানে তার ভাগ্যকে গড়ে তুলতে হবে।

বড়বাড়ির বারান্দা থেকে হেদুয়ার টলটলে জলভরা পুকুরটা দেখা যায়। ওদিকে মিশনারীদের বিরাট প্রতিষ্ঠান, এপাশে বড় রাস্তায় লোকজনের ভিড়। ভিস্তিওয়ালারা বড় চামড়ার মশকে জল পুরে রাস্তা ধুচ্ছে। পাল্কীবেয়ারারা হুম্ হুম্ শব্দে পাল্কীতে সওয়ারী নিয়ে দৌড়চ্ছে। তার মাঝে তেজী ঘোড়ায় টানা কোন রইস আদমীর জুড়ি ছুটে যায়। পাদানীতে দাঁড়িয়ে সহিসরা সাবধানী হাঁক পাড়ে।

বৈকালের পড়ন্ত বেলায় শোনা যায়—কুলপি বরফ, চাই বেলফুলের মালা!

সৌখীন বাবুর দল কোচানো ধুতি গিলেকরা আদ্দির পাঞ্জাবি হাতে বাহারের ছড়ি নিয়ে তেড়ি কেটে গলায় পাকানো চাদর জড়িয়ে হেদুয়াতে হাওয়া খেতে এসেছেন।

কেদার মাঝে মাঝে সোজা পথ ধরে বের হয়, ওদিকে ছাতুবাবুর বাড়ির সামনের মাঠে বিকালে বহু লোক জমায়েত হয়, বুলবুলির লড়াইও চলে সেখানে।

বাজিও ধরা হয়। যার বুলবুলি লড়াই-এ হেরে যায় তার পাখীও যায় টাকাও যায় বেশ কিছু। মাঝে মাঝে কোন বাবুদের বার-বাড়িতে হাফআখড়াই কবিগানের আসর বসে।

দুই দলের কবির লড়াই।

আসরেই বাঁধনদার গান বেঁধে তার জবাব দেয়। প্রতিপক্ষও তৈরী। তারাও সেই জবাবের উত্তরে চাপান দিয়ে গান গায়। অবশ্য সে সব গান তেমন মার্জিত রুচির নয় আর অঙ্গভঙ্গী সহকারে যে নাচের পালা চলে তাতে রুচির পরিচয় বিশেষ মেলে না। তবু সাধারণ লোক ও

কিছু কাপ্তেন বাবু তা রসিয়ে উপভোগ করে।

কেদার সরে আসে।

এর চেয়ে তাদের উলাগ্রামের কবিয়ালদের গান অনেক তত্ত্ব আর তথ্যে ভরা থাকে। তাদের গানের তালমানলয়ও অনেক প্রশংসার দাবী রাখে।

কেদার ক্রমশ কাশীবাবুর লাইব্রেরীতেই বেশী সময় কাটাতে থাকে, সেখানে সংগ্রহ অনেক বিচিত্র পুস্তকের। হালফিল দর্শন-সাহিত্য বিশেষ করে পাশ্চাত্ত্যের এসব লেখার সঙ্গে কেদার উলাগ্রামে পরিচিত হবার সুযোগ পায় নি।

সেক্সপীয়র কীটস্ ওয়ার্ডসওয়ার্থ গ্রে এসবের কবিতা সংগ্রহের পাশাপাশি বেন্থাম, মিল, কেন্ট, হেগেল এসবের রচনাও তার নজরে আসে।

সংস্কৃত কাব্য, কিছু উপনিষদের বই, রামমোহনের কিছু রচনাও তার নজরে আসে। কেদার এমনিতেই পড়াশোনায় আগ্রহী, অত সম্পদ দেখে তার মন খুশীতে ভরে ওঠে।

এছাড়া কাশীবাবুর এখানে বেঙ্গল স্পেক্টেটর, হিন্দু প্যাট্রিয়ট, সমাচার দর্পণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও আসে। কেদার ওই সব পত্রপত্রিকাও মন দিয়ে পড়ে।

দেখে কাশীবাবুর 'হিন্দু ইনটেলিজেন্সিয়া' পত্রিকায় অনেক ইংরাজী নিবন্ধ আসে নানা বিষয়ে, কাশীবাবু সেসব লেখা পড়েন, সম্পাদনা করেন তারপর প্রেসে দেওয়া হয়।

কেদার ক্রমশ সেইসব লেখা পড়তে থাকে। নিজেরও মনে হয় লেখা দরকার। কিন্তু তার আগে চাই প্রস্তুতি। নিজের মতাদর্শ গড়ার জন্যই লেখাপড়া আরও করার দরকার। তাই পড়াশোনার কাজেই ব্যস্ত থাকে আর কাশীবাবুর ওই পত্রিকা সম্পাদনার কাজেও সাহায্য করতে থাকে।

কাশীবাবুও কেদারকে পড়াতে চান।

তখন এদিকে হিন্দু চ্যারিটেবিল ইনস্টিটিউশন স্কুলের নামডাক হয়েছে। স্থানীয় বেশ কিছু প্রতিষ্ঠাবান নাগরিকদের সহযোগিতায় এই স্কুল চলছে। এখানে বাংলা-সংস্কৃত-অঙ্ক এসব ছাড়াও ইংরাজী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হয়। কাশীবাবুরও এখানে অনেক পরিচিত বন্ধু আছেন। কেদারনাথকে এই স্কুলেই ভর্তি করা হল।

কলকাতার স্কুলে ইংরাজী শিক্ষার জগতে এসেছে কেদার। তার মনে পড়ে কুমারমামার কথা। আজ তিনি বেঁচে থাকলে সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন। কেদারের বাবা আনন্দমোহনবাবুও স্বপ্ন দেখতেন তাঁর ছেলে ভালো স্কুলে পড়বে—আজ তাঁরা কেউ-ই নেই।

তবু কেদারের মনে হয় তাদের আশা স্বপ্ন তাকে সার্থক করতেই হবে।

ঈশ্বরচন্দ্র মিত্রমুস্তাফির ঋণ কেদার জীবনে ভুলতে পারবে না। তিনি দাদুই ছিলেন না। কেদার এর মধ্যে অনেক মানুষকে দেখেছে, তাঁর মত মানুষ দেখে নি। দয়াবান হৃদয়বান মহৎ একটি মানুষ। শেষ জীবনে সর্বস্ব হারিয়েও কারও বিরুদ্ধে কোন অভিযোগও করেন নি। সাধ্যমত নিজের কর্তব্য করে গেছেন। দান করেছেন অকুণ্ঠভাবে। নিঃস্বতাকেও ভয় করেন নি।

কেদার এই স্কুলে এসে আর এক ঈশ্বরচন্দ্রের সাক্ষাৎ পায়। তিনি স্কুলের অন্যতম প্রাণপুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী—স্কুলের শিক্ষক।

কেদার স্কুলে আসে। এখানে কলকাতার অনেক ধনী পরিবারের সন্তানরা পড়ে। জুড়িগাড়িতে অনেকে স্কুলে আসে। এর আগে কেদার দেখেছে কৃষ্ণনগরের রাজকুমারকেও। বড়ঘরের ছেলে হলেও বিনয়ী, তার বিশেষ বন্ধুই হয়েছিল কুমার সতীশচন্দ্র।

কিন্তু কলকাতার কঠিন মাটিতে হৃদয়ের কোন কোমলতার স্পর্শ নেই। এখানে কেউ কাউকে

চেনে না, কেউ কারও খবরও রাখে না। সবাই এখানে একক—যেন এক-একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপ, মরুভূমির শূন্যতাই এখানে বিরাজমান।

কিন্তু মরুভূমির মধ্যেও কিছু মরূদ্যান থাকে। সেখানে থাকে এই রুক্ষতার মাঝেও স্নিগ্ধতার স্পর্শ—থাকে তৃষ্ণা মেটাবার জন্য পানীয় জল শান্ত আশ্রয়।

স্কুলে সেদিন ইংরাজীর ক্লাস চলেছে, সেক্সপীয়ারের নাটক নিয়ে পড়ানো হচ্ছে। শিক্ষক ঈশ্বর নন্দী মশায় ছাত্রদের প্রশ্ন করেন—সেক্সপীয়ারের কয়েকটি নাটকের নাম করো, বিশেষ করে একটি নাটকের কিছু সংলাপ তুলে বলেন—এটা কোন্ নাটকের সংলাপ বলতে হবে।

ছাত্ররা অনেকেই দু-একটা নাটকের নাম করে, কেউ চুপ করে থাকে। কেদারনাথ এখানে এসে কাশীবাবুর লাইব্রেরীতে বেশ কিছু সেক্সপীয়ারের নাটক পড়েছে, কাশীবাবুর বৈঠকখানাতে এসব আলোচনাও শুনেছে। কেদার একবার যা পড়ে তা মনে রাখতে পারে।

সেই এবার উঠে দাঁড়ায়।

ঈশ্বর নন্দী দেখছেন ওকে, চেহারায় তখনও কলকাতার ছাপ পড়েনি, গ্রাম্যভাব কিছু রয়েছে।

—তুমি জানো?

কেদার এবার সংলাপের বেশ কয়েক লাইন আবৃত্তি করে বলে—'হ্যামলেট' নাটকের সংলাপ এটা। আর সেক্সপীয়ারের বেশ কয়েকটা নাটকের নাম, তাদের বিষয়বস্তুও জানিয়ে দিতে ঈশ্বর নন্দী অবাক হন—এসব তুমি পড়েছ?

—কিছু কিছু পড়েছি স্যার। তবে সব ঠিকমত বুঝতে পারি না।

—আমার কাছে এসো সময় পেলে।

সেই থেকেই কেদার ঈশ্বর নন্দীর মত নামকরা শিক্ষকের নিবিড় সাহচর্য লাভ করে।

প্রায়ই যায় তাঁর বাড়িতে ছুটিছাটার দিন। ক্রমশ তাঁর কাছেই শেলি, মিলটন, কোলরিজ, কীটস্-এর কবিতা পড়তে শুরু করে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ গ্রে এসবের কবিতায় যে এত মাধুর্য ছিল তা জানত না। সংস্কৃত কাব্য নিয়েও আলোচনা হয়।

কবিতার ছন্দ ভাবপ্রকাশ প্রকৃতিপ্রেম কেদারের মনের অতলের সুপ্ত কবিভাবকে এবার জাগিয়ে তোলে। প্রকৃতির সবুজ প্রান্তর উলার নদীর ধার ছায়াঘেরা পাখীডাকা জগৎ আর সেখানের মানুষ সবকিছুর মধ্যেই জীবনের এক মহাকাব্যের অধরা সুরকে যেন সে অনুভব করতে পারে।

সাহিত্য, কবিতা, নাটকের সঙ্গে সঙ্গে এবার পাশ্চাত্ত্য দর্শন, মিল, হেগেল, কেন্ট এসবের বই, ইতিহাসের বইও পড়তে থাকে। তার মনে হয় জ্ঞান অর্জনের সীমা নেই। এক অনাবিষ্কৃত জগতের পথে সে যেন হারিয়ে যায়।

পড়াশোনা ছাড়া কাশীবাবুর কাগজের লেখাপত্রও দেখে, তাতে নিজেরও মনে হয় এসব ধরনের নিবন্ধ সেও লিখতে পারে। মনে মনে ইচ্ছা হয়, কবিতাও লিখবে।

স্কুলের এখন কৃতি ছাত্র সে। গ্রাম থেকে এসেছে কলকাতায়, কেদার কলকাতার রইস বাবুদের ছেলেদের মত বিলাসিতার ধার ধারে না। সে এসেছে এখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে, তাই পড়াই তার সাধনা।

স্কুলের পরীক্ষায় এবার সে প্রথম হয় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে আর স্কুল থেকে পদক দিয়ে সম্মানিত করা হয় তাকে।

কিন্তু কলকাতার জলহাওয়া যেন কেদারের সহ্য হয় না। পড়ার চাপও ছিল খুব। শরীরের দিকেও নজর দিতে পারে নি। ফলে পেটের অসুখও শুরু হল। আর পরীক্ষার পর সেই অসুখ

ক্রমশ কঠিন রক্তামাশয়ে পরিণত হয়। কাশীবাবুও ভাবনায় পড়েন।

কেদারের উপর তাঁরও আশা অনেক। স্কুলের পরীক্ষায় ভালো ফল করতে তিনিও খুশী। কাশীবাবুর স্ত্রী অর্থাৎ কেদারের মাসীমাও কেদারকে খুবই স্নেহ করেন। কলকাতাতে ওষুধপত্রও চলছে, কিন্তু রোগের কোন উপশমই হয় না। ডাক্তারও বলেন—জলহাওয়া বদল করলে ফল হতে পারে।

কলেজে ভর্তি হবার দেরী আছে। কাশীবাবু ভেবেচিন্তে বলেন—কেদার কিছুদিন বরং উলায় ফিরে যাক, যদি সেখানের জলে ওর পেটের অসুখ কমে। এখানে তো রোগ বেড়েই চলেছে।

মাসীমাও শুধোন—কি রে কেদার, যাবি দেশে?

বাড়ির জন্য, মা ও ছোটবোনের জন্য কেদারের মন কেমন করে। দিদিমাকেও কতদিন দেখেনি। পড়াশোনার চাপও এখন কম।

কেদার উলাতেই এল।

গ্রামে এসেও অসুখ তেমন সারে না।

কবিরাজী চিকিৎসা চলে। গ্রামের ওদিকে চন্দফকীরের আস্তানা। সে গোলকবিহারী সাধুর শিষ্য। চন্দফকীর গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘোরে, নানা দৈব চিকিৎসা করে, জড়িবুটির ওষুধও দেয়। আর তার ওষুধে বহুজনের বহু দুরারোগ্য ব্যাধিও সেরে গেছে।

চন্দফকীরকে ডাকিয়ে আনে জগৎমোহিনী।

বসন্ত তখনও এ বাড়িতে রয়েছে—ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। এবাড়ির প্রায় পুরোনো সবাই চলে গেছে।

মারা গেছে ন্যাপা সর্দার। তার ঘরটা ধসে পড়েছে। জগন্নাথ এখান থেকে কোথায় চলে গেছে। বড় বাড়ির সব কিছু এখন স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে। আর জগাদার কৃষ্ণনামও শোনা যায় না।

বসন্তই বলে—চন্দফকীরকেই ডেকে আনি মা। ওর ওষুধ কথা কয়। দেখবে ক'দিন খেলেই ছোটদাবাবুর সব রোগ সেরে যাবে।

জগৎমোহিনীও ভাবছে ছেলের জন্য। শরীর আধখানা হয়ে গেছে। এ বাড়ির উপরই আর তার আস্থা নেই। এখানের সব কিছুই যেন হারিয়ে যাবে। সব যায় যাক—তার একমাত্র সন্তান, শিবরাত্রির সলতে এই সন্তানকে সে হারাতে পারবে না।

চন্দফকীর কেদারকে দেখে ওষুধপত্রও দিয়ে যায়, বলে পথ্য দিতে হবে নিরামিষ। ভাত রান্না করে দিতে হবে পুরোনো তেঁতুল দিয়ে। আর কেদারকে ওষুধ ছাড়াও একটি মন্ত্র দিয়ে যায় জপ করার জন্য।

বলে—এই মন্ত্র জপ করলে নিশ্চয়ই সে কোন স্বপ্নও দেখবে। সেটাও জানাতে হবে, তারপর ব্যবস্থাদি নেওয়া হবে।

অসুস্থ কেদার ওষুধ-পথ্য খায় আর সেই মন্ত্র জপও করে।

সেদিন রাতে স্বপ্ন দেখে কেদার যে তার শরীর থেকে একটা কালো সাপ বের হয়ে কোথায় চলে গেল।

চন্দফকীরও সেই স্বপ্নের কথা শুনে বলে—খুব ভালো হয়েছে মা। দাদাবাবুর শরীর থেকে সব অকল্যাণ বিষ বের হয়ে গেছে। আর ভয় নাই। ওষুধপথ্য যা চলছে চলুক, কয়েক দিনের মধ্যেই দাদাবাবু সেরে উঠবেন গুরুর কৃপায়। সেরে উঠলে ওঁকে একদিন আমার গুরুদেবের কাছে নিয়ে যাবো। মস্ত বড় সাধক গো তিনি।

কেদার ওই জড়িবুটির চিকিৎসায় আর ওই পথ্য নিয়ে ক্রমশ আবার সুস্থ হয়ে ওঠে। জগৎমোহিনীও এবার নিশ্চিন্ত হয়।

চন্দফকীরের গুরু সেই গোলকবিহারী সাধু। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের সাধক সে। কেদার তাকে আগেও দেখেছে—এবার তার সাধনার কিছু প্রমাণ সে পায়। চন্দফকীর যেন তার গুরুর কৃপাতেই তার দুরারোগ্য ব্যাধিকে সারিয়ে তাকে সুস্থ করে তুলেছে।

কেদারকে দেখে গোলকবিহারীই শুধোয়—ভালো আছো তো এখন দাদাবাবু?

কেদার জানায়—হ্যাঁ।

—এখন তো মস্ত পণ্ডিত হতে চলেছ তুমি গো! তাই হও, আর এ গ্রামে থাকাও চলবে না তোমার।

আগেও গোলক এই কথাই বলেছিল। আজও তাকে এই কথা বলতে দেখে শুধোয়—কেন?

গোলকবিহারী শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। আজও বলে সে—এ গ্রাম মড়কে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে তুমি মস্ত মানী লোক হবে, দেবতার আশীর্বাদ রয়েছে তোমার উপর। তোমাকে তিনি পাঠিয়েছেন অনেক বড় কাজের জন্য গো।

এসবের অর্থ কেদার আজও বুঝতে পারে না। সাধুর কথাগুলো কেমন রহস্যময় বলেই বোধ হয়। প্রণাম করে বের হয়ে আসে আশ্রম থেকে। গোলকবিহারী আবার কি অন্তহীন স্তব্ধতার মাঝে হারিয়ে গেছে।

জগৎমোহিনী সংসারের সব দায়দায়িত্বই পালন করে চলেছে। কেদারের বিয়ে দিয়েছে। কেদারের অসুখের সময় কয়েকদিনের জন্য কেদারের নববধূ সয়ামণিকে এখানে এনেছিল। ছোট্ট মেয়েটা বড়লোকের মেয়ে, কাজকর্ম তেমন কিছু জানে না সংসারের।

তবু যতটুকু পারে অসুস্থ স্বামীর সেবা করে, জগৎমোহিনীর কাজে হাত লাগায়। বৃদ্ধা দিদিমা এখন সংসারের বোঝা। ছোট্ট মেয়েটি তার কাছেই থাকে।

কেদার ক্রমশ সেরে উঠতে এবার রানাঘাট থেকে মধুবাবুর লোকও এসেছে। ছোটমাকে নিয়ে যেতে হবে।

সয়ামণিও তখন ছোটই। বাবা-মায়ের সংসারেই থাকে—এখনও স্বামীর ঘরকে আপন করে নিতে পারে নি। কেদারও কেমন এড়িয়ে চলে তাকে।

সয়ামণি তার ওষুধ ও জল দিয়ে চলে যায়।

কেদারও বইপত্র নিয়েই ডুবে থাকে। কলকাতা থেকে আসার সময় কলেজের কিছু বই এনেছিল, পড়াশোনাটা এগিয়ে রাখার জন্য। সেগুলোই পড়াশোনা করে, আর এর মধ্যে কিছু লেখার চেষ্টাও করে। কবিতা লিখতে চায়—ইংরাজীতেই কবিতা লিখবে সে।

সয়ামণির দিকে নজর দেবার সময় তার নেই। তাই বাবার বাড়ি থেকে লোক আসতে সয়ামণিও চলে যায় রানাঘাটেই।

জগৎমোহিনীর মাথায় তখন কন্যাদায়ের বোঝা চেপেছে। হেমলতা বড় হয়ে উঠছে। মেয়ের বাড় বলে কথা—আর অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিতে পারলে সেও দায়মুক্ত হবে। কিন্তু অর্থসামর্থ্য তার সীমিত। কিছু জমিজায়গা এখনও রয়েছে, তারই কিছু বিক্রী করে মেয়ের বিয়ে দিতে চায় সে।

এদিকে পালটি ঘরের ছেলের সন্ধান করছে। শশী গোমস্তার বয়স হয়েছে, তবু বৃদ্ধ যথাসাধ্য চেষ্টা করছে। জগৎমোহিনী কলকাতায় বোনকেও লেখে যদি সেখানে তেমন পাত্র থাকে।

কাশীবাবুও এই পরিবারটির জন্য যথাসাধ্য করেন। তাঁর চেষ্টাতেই কলকাতায় একটি পাত্র

পাওয়া যায়। ভালো ঘর—দেনাপাওনারও দাবি বিশেষ নেই।

জগৎমোহিনীও রাজী হয়।

তাই কেদার হেমলতাকে নিয়ে কলকাতায় আসে। কাশীবাবুর এখান থেকেই বিয়ের সব ব্যবস্থা হয়ে যায়।

হেমলতার বিয়ে হয়ে গেল, বিয়ের পর দ্বিরাগমন-পর্বও সারা হতে জগৎমোহিনী হেমলতাকে নিয়ে উলাগ্রামে ফিরে গেল। কেদার রয়ে গেল কলকাতায়।

এবার স্কুলের পড়া শেষ হয়েছে তার। আরও পড়তে চায় কেদার। কাশীবাবুও তাই চান।

॥ ১৫ ॥

কলকাতা কেন, সারা ভারতের অন্যতম নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই হিন্দু স্কুল। কেদারের খুব ইচ্ছা ওখানেই ভর্তি হন। এর মধ্যে কেদার পড়াশোনার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন কাশীবাবুর লাইব্রেরীতে। মেটকাফ হলেও যাতায়াত করেন। কলকাতায় তখন নব্যযুবক-প্রাচীনপন্থীদের অনেক সংস্থা গড়ে উঠেছে। সেখানেও নানা আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। অনেক গুণীজ্ঞানী ব্যক্তি সেখানে নানা ধর্ম-সমাজতত্ত্ব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন। কেদারনাথ সেইসব সভাতেও যেতে শুরু করেন।

তখন তিনি যুবক। সুন্দর সুপুরুষ চেহারাও হয়েছে। ইংরাজীতে প্রবন্ধও লেখেন কাশীবাবুর সম্পাদিত লিটারারী গেজেট এবং ইন্‌টেলিজেন্সিয়া পত্রিকাতে। আর একটা কাজও শুরু করেন।

ইংরাজীতে একটা মহাকাব্য রচনার কাজেও হাত দেন। রাজা পুরু যিনি আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন, সেই পুরুকে নিয়েই তাঁর মহাকাব্য রচিত হবে। নামও করেছেন 'Poriade'। বারো খণ্ডে এই মহাকাব্য রচিত হবে। এর মধ্যেই দুই খণ্ড মহাকাব্য রচনার কাজও শেষ করেছেন। কিছু পত্রপত্রিকায় তাঁর কবিতাও প্রকাশিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে কলকাতার শিক্ষিত সমাজেও প্রবেশ অধিকার পাচ্ছেন কেদারনাথ।

এই সময় কলকাতার নব্যশিক্ষিত সমাজ গড়ে উঠেছে হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করেই। 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর সভ্যরা বেশীর ভাগ কলকাতার ধনীসমাজেরই সন্তান।

সমাজে এতদিন রক্ষণশীল হিন্দুদেরই প্রাধান্য ছিল। সেই সমাজ-এর নানা কুসংস্কার, অন্ধ গোড়ামীর শিকার হতো বহু নরনারী। সতীদাহ বহুবিবাহপ্রথা কৌলীন্য প্রথার প্রভাবই ছিল বেশী।

বল্লাল সেনের আমল থেকেই ব্রাহ্মণসমাজে এই কৌলীন্যপ্রথার প্রবর্তন ঘটে। কুলীন ব্রাহ্মণদের কুলমর্যাদা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। তার আর কোন যোগ্যতা থাক বা না থাক—কুলীন বংশে জন্মগ্রহণ করলেই সে এই মর্যাদা পাবে।

সকলেই তাকে কন্যাদান করে সম্মানিত হবে। সমাজে এই রীতিই চলতো সামন্ততান্ত্রিক যুগে। সেদিন প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ পেশাতেই রুজিরোজকারের চেষ্টা করতো। জমিদারী প্রথায় সমাজের এই সব শাসনশোষণগুলোই কায়েম ছিল।

ইংরেজ এদেশে শাসনব্যবস্থা কায়েম করার পর থেকেই নিজের স্বার্থে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করলো—আর ইংরেজের বাণিজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের অর্থনৈতিক পরিবর্তনও সূচিত হলো। অনেকেই তাদের হৌসে নানা কাজ করতে শুরু করলো। কলকাতার বাজারে বেশ কিছু টাকার আমদানী, লেনদেন শুরু হতে ক্রমশ এখানের অনেক সাধারণ মানুষও ধনী হয়ে

উঠলো; দূর গ্রাম অঞ্চল থেকেও অনেক মানুষ তাদের এতদিনের বংশগত পেশা ছেড়ে নতুন বৃত্তি অবলম্বন করেও প্রচুর অর্থ রোজগার করতে শুরু করলো।

এদিকে নব্যসমাজ ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজদের মত মদ্যপান ইত্যাদিও রপ্ত করলো অনেকে। তাদের কাছে মনে হলো এতদিন তারা অন্ধকূপে বন্দী ছিল। হিন্দুধর্মের সব কিছুকেই তারা হেয় প্রতিপন্ন করে আঘাত করার মধ্যেই যেন মহাকৃতিত্বের সন্ধান পেল।

আর এই অবকাশে কিছু খৃষ্টান মিশনারীও হিন্দুধর্মের উপর বিরূপ সমালোচনা শুরু করে ভাষণ দিতে শুরু করলো। তারা অবশ্য শিক্ষা দেবার বাহ্যিক একটা কাজ লোক দেখানোর মত করলেও অন্তরে তারা হিন্দু যুবকদের মধ্যে এই হিন্দুধর্মবিদ্বেষীর বেদনাকে উস্‌কে দিতে চেষ্টা করতো।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্তের মত নামীদামী ঘরের ছেলেরা তখন খৃষ্টান হয়েছেন। আরও অনেকেই হয়েছেন। সমাজে এই নিয়ে তুমুল আলোড়নও চলেছে।

এই ধর্মান্তরকে রুখতে হিন্দুধর্মের থেকেই একটা শাখা বের হয়ে গেল। রাজা রামমোহন নিজে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাতে যথেষ্ট শিক্ষিত ছিলেন। সংস্কৃত-বেদান্ত-বেদ-উপনিষদ-ন্যায়েরও ছাত্র। তিনিই প্রথম ব্রাহ্মধর্মের বীজ বপন করেন।

হিন্দুসমাজের গোড়ামী কুসংস্কারগুলোকে মুক্ত করে তারা এই নবধর্মমতের মাধ্যমে কিছু তরুণ শিক্ষিত সমাজকে তখন দলে আনার চেষ্টা করছেন।

হিন্দুসমাজের মধ্যে তখন রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ গড়ে উঠেছে, ওদিকে ইয়ং বেঙ্গলও থেমে থাকার পাত্র নয়। তারাও রাজা রামমোহন প্রবর্তিত আত্মীয়সভার মারফৎ প্রতিবাদ করতে শুরু করল।

সাধারণ মানুষ এই দুই দলকে বলতেন 'শীতল সভা' আর হিন্দুধর্মের ধর্মসভাকে বলতেন গুড়ুম সভা। ব্রাহ্মসমাজের মানুষেরা প্রতিটি বিষয় আলোচনা করে ধীরস্থিরভাবে গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত করতেন ঠাণ্ডা মাথায় আর হিন্দু রক্ষণশীল সভায় অনেক জোরালো তোপধ্বনি করে প্রতিবাদ করা হত বেশ কড়া ভাষায়। তাই তাদের বলা হতো 'গুড়ুম সভা'।

এর মধ্যে সতীদাহপ্রথা আইন করে বন্ধ করা হয়েছে, এদিকে খৃষ্টদের ধর্মান্তরিতকরণের প্রতিবাদেও সভা হচ্ছে। খৃষ্টান মিশনারী ডাফ সাহেব কলকাতায় এসে তখন শিক্ষা বিস্তারের কাজে নেমেছেন।

হিন্দু রক্ষণশীল সভা ডাফ সাহেবের এই প্রচেষ্টাকে বানচাল করার চেষ্টাও শুরু করলো।

বিশেষ করে রক্ষণশীল হিন্দুদের আক্রমণের মূল লক্ষ্য হল হিন্দু কলেজ। ওখানেই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নব্য যুবকবা যথেচ্ছ অনাচার শুরু করেছে। এদের প্রভাবেই কৃষ্ণমোহন, মধুসূদন দত্ত—আরও অনেকে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। সর্বনাশ আসছে সমাজে এই কুশিক্ষা থেকেই—যার পীঠস্থান এই হিন্দু কলেজ।

ডিরোজিওর মত শিক্ষকের বিরুদ্ধেও তাঁরা প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন। তখনকার পত্রিকা 'সমাচার চন্দ্রিকা'তেও ধর্মসভাপন্থীদের এইসব প্রতিবাদপত্র ছাপা হতে শুরু হয়। আর প্রতিপক্ষও তাঁদের প্রতিবাদপত্র ছাপতে শুরু করলেন 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকাতে।

ঈশ্বরচন্দ্র তখন কলকাতায় এসেছেন। গ্রাম থেকে আসা সেই তরুণও দেখছেন এঁদের এই ধর্ম নিয়ে লড়াই।

পরে রামমোহন রায়-এর আত্মীয়সভাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে ব্রাহ্মসমাজ। ওদিকে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ তখনও তাদের মতাদর্শ নিয়েই টিকে থাকে। দুই পক্ষের সংঘাতও চলতে থাকে, পাশাপাশি খৃষ্টান মিশনারীদের প্রভাবও বাড়তে থাকে সমাজে. এমন কি শিক্ষার ক্ষেত্রে।

তখন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার কলকাতার বিশিষ্ট পরিবারদের অন্যতম, বরং অগ্রণীই বলা যেতে পারে। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের বংশধরদের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই পরিচিত, সম্মানিত ব্যক্তি। তাঁদের বাড়িতে কলকাতার বিদগ্ধ সমাজের বহুজন তো যেতেনই, বিদেশীদের অনেকেই আসতেন। সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থানই ছিল এটি। দেবেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশ শুরু হয়। ঈশ্বরচন্দ্র, অক্ষয়কুমার দত্ত এঁরাও যাতায়াত করেন সেখানে ওই পত্রিকাকে কেন্দ্র করে।

কেদারনাথ ক্রমশ এই বাড়ির ছেলে সত্যেন ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। তিনিও কেদারনাথকে তাঁদের বাড়িতে নিয়ে যান। বিশাল বাড়ি।

সেখানেই দেখেন কেদারনাথ সত্যেন ঠাকুরের বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। ঋষিকল্প এই মানুষটিকে কেদারনাথও নিজের বড়দার মতই সম্মান করতে থাকেন। ক্রমশ তাঁদের ঘনিষ্ঠতাও বাড়তে থাকে। দ্বিজেন ঠাকুরের সান্নিধ্যে এসে কেদারনাথের মনের সব দুঃখহতাশা দূর হয়ে যায়, যেন এক নতুন আশায় উৎসাহে প্রদীপ্ত হয়ে ওঠেন তিনি। ঠাকুরবাড়িতে ব্রাহ্মধর্মসভা হয়। সেখানেও তাঁদের মতামত আলোচনা শোনেন কেদারনাথ।

আবার খৃষ্টান পাদরীদের সান্নিধ্যেও এসেছেন কেদারনাথ। রেভারেণ্ড ডাফ সাহেব, রেভারেণ্ড গ্রীভস্-এর সান্নিধ্যে এসে তখন এডিশন এডওয়ার্ড ইয়ং প্রভৃতি লেখকের লেখাও পড়েছেন। মিশনারীদের সঙ্গে বাইবেল, খৃষ্টচরিত তার দর্শন নিয়েও আলোচনা করেন।

বাড়িতে হিন্দুধর্ম-উপনিষদ-বেদান্ত এসবের উপরও পড়াশোনা করছেন। পড়েছেন রামমোহনের লেখা গ্রন্থাদি, শঙ্কর-ভাষ্যও পড়েছেন।

এই বয়সে পড়াশোনাই করে চলেন। লেখার কাজে আর কলকাতার নব্যসমাজের বিভিন্ন মানুষদের আলোচনা শোনেন।

কিন্তু কোন মতকেই তখনও হৃদয়ের সঙ্গে গ্রহণ করে তা প্রচারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন নি। যদিও ব্রাহ্মসমাজেই তাঁর তরুণ বন্ধুদের সংখ্যা বেশী ছিল, তাঁরাও চাইত কেদারকে সেখানে নিয়ে যেতে, তাঁদের ধর্মমত প্রচারের কাজে লাগাতে। কিন্তু কেদারনাথ কোনদিকেই ঝুঁকে পড়েন নি।

এ বিষয়ে মনে হতো তাঁর কাজ এ নয়,—হয়তো অন্য কিছু। তাঁকে এখানেই আবদ্ধ হলে চলবে না। বাবা ও কুমারমামার কথা মনে পড়ে। তাঁকে আরও বড় হতে হবে, আরও বৃহৎ মহৎ কোন কাজে ব্রতী হতে হবে। তার জন্যই চলেছে তাঁর প্রস্তুতি-পর্ব।

সামাজিক পরিবেশ তখন কলকাতায় এক বিচিত্ররূপে প্রকাশিত। বাবু কালচারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে নব্যযুগের সভ্যতা।

ইংরাজী শিক্ষার প্রথম টালমাটাল কাটিয়ে উঠে সমাজ তখন গঠনমূলক এক স্থিতিশীলতায় আসতে চাইছে। এমনি দিনে কেদারনাথ ভর্তি হলেন ইংরাজী শিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজে।

শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীমশায় কেদারকে ইংরাজি সাহিত্যেই নয়, হিন্দুধর্মশাস্ত্র-ন্যায়-মীমাংসা-কাব্য ইত্যাদিতেও পারদর্শী করে তুলেছিলেন। কেদারনাথ হিন্দু কলেজে এসে সহপাঠীদের মধ্যে পেলেন কৃষ্ণদাস পাল, তারকনাথ পালিত, সত্যেন ঠাকুর প্রভৃতিদের।

এর মধ্যে কেদারনাথের বিভিন্ন রচনা কলকাতার নামীদামী পত্রিকাতেও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বন্ধুদেরও নজরে পড়ে সেসব নিবন্ধ কবিতা।

এই সময় হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন জর্জ রিচার্ডসন। তিনি ছিলেন ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সভ্য। নিজেও ভালো বক্তা এবং লেখক।

কেদারনাথ মিঃ রিচার্ডসনের নজরেও পড়েন। তিনিই কেদারনাথকে তর্কসভায় যোগ দিতে বলেন আর বাগ্মিতার প্রকাশ কি ভাবে করা যায় সে সম্বন্ধে নিজের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথাই বলেন।

তিনি বলেন—আগে তেমন ভালোভাবে জোরালো বক্তৃতা দিতেই পারতাম না। পার্লামেন্টে ভাষণ দিতে হবে, গ্রামের পথে যেতে যেতে বার্লি—না হয় সাগুর ক্ষেতের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবতাম এই গাছগুলোই আমার পার্লামেন্টের শ্রোতা, তাদের উদ্দেশ্যে বেশ জোরালো ভাষণ দিতে সুরু করতাম। এইভাবেই ক্রমশ ভাষণ দেবার সাহস ও মনোবল বেড়ে গেল।

কেদারনাথও বন্ধুদের চাপে পড়ে বিভিন্ন সভাসমিতিতে যান আর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আর অর্জিত বিদ্যার পুঁজি নিয়ে সারগর্ভ আলোচনাই করেন—যা শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

তারকনাথ পালিত পরবর্তীকালে সায়েন্স কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন, তিনি তখন তরুণ কৃতি ছাত্র। তিনি তখনকার রাজা জমিদার সম্ভ্রান্ত লোকদের নিয়ে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটির সভ্য। কেদারনাথকে তিনি এই সভাতে নিয়ে যান। কেদারনাথ সেখানেও বস্তুবাদ এবং অধ্যাত্মবাদ প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করেন।

অধ্যাত্মবাদ ক্রমশ সেই ইংরাজী শিক্ষার পরিবেশেও তরুণ কেদারনাথের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

তাঁর ভাষণেই নয়, চিন্তনে-মননেও বস্তুবাদ-এর থেকে অধ্যাত্মবাদই প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। কিশোর কেদারও উলাগ্রামে মাধব পাল, বাচস্পতিমশায়, পরশুরাম দাদু, জগাইদার কাছেও এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে এসেছেন—কে আমি? আত্মতত্ত্ব জানার আগ্রহ তাঁর কাছে চিরন্তন এক প্রশ্ন রয়ে গেছে।

তার লেখাতেও সেই প্রশ্ন ধ্বনিত হয়। Poraid কাব্যের ছত্রেও দেখা যায় সেই প্রশ্ন। রাজা পুরু শিকারে গিয়ে একটি হরিণকে বধ করেন, তারপর সেই মৃত হরিণকে দেখে মনে হয় বস্তুবাদের জগৎ অসত্য—তাহলে সত্য কোথায়?

Now sad reflection clouds his mental realm, And Questions past our thought his heart o'erwhelm. 'From whom is life and whence this frame of man ? What mighty power has formed this mighty plan ? Why live we here and why desire and feel ? For what we turn with Time's revolving wheel ?'

সেই চিরন্তন প্রশ্ন আত্মানুসন্ধান চলেছে তরুণ কেদারনাথের মনে। বাহ্যিক জগতের বিষয়সুখ—এই সমাজের বিকৃত ভোগবিলাস সবই তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়। তাঁর কাছে মনে হয় এহ বাহ্য—আগে কহ আর।

অর্থাৎ হেথা নয় হেথা নয়—অন্য কোনখানে তাঁর আসল কর্মক্ষেত্রের অবকাশ রয়েছে, তাই এই পথ তাঁকে অতিক্রম করে যেতে হবে।

রেভারেণ্ড ডাফ সাহেব তাকে মিল্টন পড়তে দেন—মহাকবি মিলটনের কবিতা ছন্দ কেদারের মনকে আচ্ছন্ন করে তোলে। নতুন এক ছন্দরীতির প্রবর্তনের কথাও ভাবতে থাকেন তিনি। এই সঙ্গে কার্লাইল, হেগল, থিয়োডোর পার্কার, ট্যানিং, নিউম্যান প্রভৃতি চিন্তাবিদদের লেখাও পড়তে থাকেন। কোরাণও পড়া শুরু করেন।

সর্ব ধর্মগ্রন্থের মূল তত্ত্ব আর তথ্যকে জানার আগ্রহ নিয়ে পড়তে থাকেন, এই সঙ্গে লিটারারী গেজেটে লেখা ও ছাপা হতে থাকে। বন্ধুমহলেও কেদারের সববিষয়ে পড়ার আগ্রহ দেখে বন্ধুরা তাঁকে বলতেন Mr. ABC—

অর্থাৎ বাছবিচার নেই—যা পান তাই পড়েন—তাঁকে অনেক কিছু জানতে হবে।

এই লেখাপড়ার কাজেই ডুবে আছেন কেদারনাথ, কলেজের পড়াও চলেছে।

এর মধ্যে হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আগের ব্যাচে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়রা প্রথম বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তী বৎসরের পরীক্ষার প্রস্তুতি চলেছে।

তখন ভাদ্র মাস। বর্ষার কালো মেঘের দল কলকাতার আকাশে ভিড় করে আসে। নামে অঝোরে বৃষ্টি। আবার বৃষ্টির পরে রোদের আভাস জাগে কলেজ স্কোয়ারের গাছে পাতায়। হাওয়া কাঁপে নারকেলগাছের পাতায়।

কেদারের মাঝে মাঝে উলার কথা মনে পড়ে। মা, ছোট বোন হেমলতা সেখানে রয়েছে, রয়েছেন বৃদ্ধা দিদিমা। এখন কোনমতে দিন চলে তাঁদের। কেদার এখনও রোজগারের মুখ দেখেন নি। পরের আশ্রয়ে পড়াশোনার মধ্যেই রয়েছেন।

উলা থেকে মহেশমামা সপরিবারে ভবানীপুরে তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছেন শুনে কেদারনাথও দেখা করতে যান তাঁদের সঙ্গে। মহেশমামার শরীর ভালো নেই—তাঁরা সবাই কম বেশী অসুস্থ। অসুখ নিয়েই এসেছেন উলা থেকে। বাড়ির কথা বিশেষ হয় না, মা-বোন-দিদিমার কথাপ্রসঙ্গে তেমন কোন কথা হয় না। মহেশমামা প্রসঙ্গটা যেন এড়িয়ে যেতে চান। সংক্ষেপেই জানান—আছে সবাই এক রকম।

কেদার ফিরে আসে মেসোর বাড়িতে। কিন্তু মন কেমন করে। ভাদ্র শেষ হয়ে আশ্বিন আসছে—বাংলার বুকে এসেছে শরতের কাশফুল, শিউলির সুবাস। গ্রামের জন্য মায়ের জন্য কেদারের মন কেমন করে। কতদিন গ্রামে যান নি! কলেজের ছুটি হতেই কেদার বের হয়ে পড়েন।

জলপথে আসছেন রানাঘাটে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে। সেখানে রয়েছে তাঁর স্ত্রী। আশ্বিন মাস। হঠাৎ গঙ্গায় নৌকায় আসার সময় শুরু হল প্রচণ্ড ঝড়তুফান। আকাশ ছেয়ে গেছে কালো মেঘে আর আকাশবাতাস কেঁপে ওঠে ঝড়ের মত্ত গর্জনে, বজ্রের নির্ঘোষে।

নৌকাটা মোচার খোলার মত দুলছে। যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যাবে মত্ত নদীর অতলে। আরোহীদের মধ্যে কান্নার রোল ওঠে।

জলের ঝাপটায় সর্বাঙ্গ ভিজে যায়। মনে হয় কেদারের, যেন নৌকা থেকে ছিটকে পড়বেন নদীতে—সব শেষ হয়ে যাবে।

কালিঢালা অন্ধকারে যেন চকিতের মধ্যে এক আলোর আভাস দেখলেন কেদার। মৃত্যুর তমসার মাঝে জাগে সারা অন্তরে কি আশার আশ্বাস। জীবনের ভয়ও তাঁর হারিয়ে যায়, সব কিছুকেই যেন সহজভাবে গ্রহণ করার এক চেতনা জাগে তাঁর অন্তরে।

ঝড় সমানে চলেছে—নৌকায় ওঠে কান্নার রোল। উন্মাদ উত্তাল ঢেউ নৌকাটাকে নিয়ে লোফালুফি করছে। তার মাঝে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছেন কেদারনাথ, অন্তরে সেই সদ্যজাগ্রত এক বিচিত্র অনুভূতি। বেশ বুঝছেন তাঁর কোনও বিপদ হবে না।

ঝড় থামে। নৌকা এসে রানাঘাটে পৌঁছায়, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে।

কেদারনাথ বেশ কিছুদিন পর শ্বশুরবাড়িতে গেছেন। মহা হৈ-চৈ পড়ে যায়। সয়ারাণিও স্বামীকে দেখে আনন্দিত। কিন্তু কেদারের মন পড়ে আছে বাড়ির দিকে, উলাতেই যেতে হবে তাকে।

কিন্তু সেই রাত্রে আর যাওয়া সম্ভব হয় না। শ্বশুরমশায়ও বলেন, এতটা পথ এসেছ, আজ

বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে যাবে উলাতে।

রাত্রিবাস করতে হল রানাঘাটেই।

স্ত্রী সয়ারাণীরও শরীর ভালো নেই, পেটের অসুখে ভুগে তখনও সারে নি ঠিকমত।

পরদিন সকালে নৌকায় করে উলার ঘাটে গিয়ে পৌঁছলেন কেদারনাথ। আগে নৌকার ঘাটেই বেশ কিছু দোকানপশার বসতো, লোকজনের সমাবেশ হতো—আজ ঘাটের দোকানপত্রও বন্ধ, লোকজনও বিশেষ নেই।

ওদিকে দূরে শ্মশানে ধোঁয়া উঠছে, বেশ কিছু শবদাহের চিতা জ্বালানো হয়েছে। আর গাছতলায় কয়েকজন লোককে দেখা যায়, তারা সুস্থ অবস্থাতেও নেই—মদের নেশায় টলছে। কে গর্জন করে ওঠে—সব পুড়িয়ে ছাই করে দেব! শালাদের কত আর পোড়াবো, দে টেনে চূর্ণির জলে ফেলে—ভেসে যাক! জয় কালী—

কেদার গ্রামের দিকে এগোতেই ক্রমশ চমকে ওঠে। সারাগ্রাম যেন পরিত্যক্ত। আকাশে উড়ছে শকুনের দল। বাতাসে ওঠে পুঁতিগন্ধ, কুকুরগুলো কোন ঝোপের মধ্যে পড়ে থাকা মৃতদেহের দখলদারী নিয়ে লড়াই বাধিয়েছে। ঘরে ঘরে কান্নার রোল। পথে দেখা যায় হরিধ্বনি দিয়ে কারা একটার পর একটা মৃতদেহ নিয়ে চলেছে।

গ্রামের সেই সুখী চেহারাটার ছবি ভেসে ওঠে। কোথাও হতো হরিকীর্তন, কোন আটচালায় তাসপাশার আসর বসতো—কলরব উঠতো। দত্তদের বৈঠকখানাতে উঠতো গানের সুর—পাখোয়াজের গুরু গুরু শব্দ।

আজ সেখানে কেউ নেই। কলেরা মহামারীতে গ্রাম উজাড় হয়ে গেছে। পথে দেখা যায় অনেক গৃহস্থ সামান্য সম্বল নিয়েই গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কেউ বলে—এ গেরামে অভিশাপ লেগেছে, কোন তান্ত্রিক ওখানে অভিশাপ দিয়ে কালো ছাগলকে ছেড়ে দিয়েছে, যেখানে সে যাবে মৃত্যুই ঘটবে। গাঁয়ে যেও না বাবা—পালাও।

তারাও পালায়।

সেনবাড়িও নিঃঝুম। কারা সেখানে মৃত্যুর দিন গুনছে। রোগের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে।

কেদার দেখছে তাঁর সুখের দিনের উলা গ্রামের আজকের বিধ্বংসী রূপ। সুর-আনন্দ-গান আজ হারিয়ে গেছে মৃত্যুর বিভীষিকায়।

কেদার জানেন না তাঁর বাড়ির কি অবস্থা। জগৎমোহিনী দেবী ছেলেকেও খবর দিতে চাননি। তিনি নিজেই পড়েছিলেন অসুখে—বৃদ্ধ মাও অসুস্থ। আরও চরম সর্বনাশই ঘটে গেছে এই সংসারে। এই বড় বাড়িটা যেন পরিণত হয়েছে মৃত্যুপুরীতে।

কেদারকে দেখে জগৎমোহিনী আর্তকান্নায় ভেঙে পড়েন। বৃদ্ধার চোখেও জল নামে। মা-দিদিমা কোনমতে কালব্যাধির আক্রমণ থেকে বাঁচলেও তাঁর প্রিয় ছোটবোন হেমলতাকে তারা বাঁচাতে পারেন নি। হেমলতা কলেরা মহামারীতে মারা গেছে। সে আর নেই।

—মা, কি বলছ? কেদার আর্তনাদ করে ওঠেন। তাঁর দাদাদের, ছোটভাইকে মারা যেতে দেখেছে, চলে গেছেন কুমারমামা, তাঁরা বাবা ও দাদুও নেই। ভাইবোনদের মধ্যে তবু বেঁচে ছিলেন তাঁরা দুজনে। আজ ঈশ্বর একজনকে ছিনিয়ে নিল—কেদার রইলেন একা। ওই ঝড়ের রাতে তিনিও তো শেষ হয়ে যেতে পারতেন—তা যান নি, হারিয়ে গেল তাঁর বোন হেমলতা।

গ্রামের বহু বাড়ি পরিত্যক্ত। শিয়াল-কুকুরের দল ঘুরছে। বাতাসে ওঠে পুঁতিগন্ধ। সন্ধ্যার পর নামে তমসার মাঝে মৃত্যুর বিভীষিকা।

আজ কেদারনাথের মনে হয় সেই সাধু গোলকদাসের কথা। সাধুই বলেছিল—উলাগ্রাম

মহামারীতে উজাড় হয়ে যাবে। এখানে বাস করা যাবে না। তবে কালে তুমি হবে মৃত্যুঞ্জয়ী মহাপুরুষ—পরম বৈষ্ণব।

পরের কথা পরে, এখন বুঝছেন কেদার যে এখানে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে অসহায় মা-দিদিমাকে ফেলে যাওয়া ঠিক হবে না।

বসন্ত তখনও টিকে আছে। তার উপরই এই বাড়ির ভার দিয়ে কেদার মা-দিদিমাকে নিয়ে যেতে চান কলকাতায়।

জগৎমোহিনী বলেন—তোর মেসোর ওখানে গিয়ে তাঁদের অসুবিধা করবো?

কেদার বলেন—মাসী এসব শুনলে তোমাদের নিয়ে যাই নি বলে আমাকেই বকবেন। তাছাড়া দু'চারদিনের জন্য সেখানে যেতে দোষ কি মা? বিপদ-আপদের সময় এসব কথা ভাবলে চলে না। এখানে তোমাদের ফেলে যেতে পারবো না। যদি কিছু হয়ে যায়, মেসোমশাইও আমাকে বকবেন। চলো কলকাতায়।

বৃদ্ধা ছিলেন একদিন রাজরানী। আজ তাঁর সব হারিয়ে গেছে। স্বামী-যোগ্যপুত্র-বিষয়সম্পদ সবই। পরের দয়াতে আজ তাঁকে দিনাতিপাত করতে হচ্ছে। কেদারও বোঝেন দিদিমার দুঃখটা। কিন্তু তবুও জীবনকে মেনে নিতেই হবে,—এই তাঁর জীবনদেবতার নির্দেশ।

॥ ১৬ ॥

স্ত্রী সয়ামণি রইল রানাঘাটে বাপের বাড়িতে, কেদার উলা থেকে মা-দিদিমাকে নিয়ে এলেন কলকাতায়।

কাশীনাথবাবুও সব খবরই পেয়েছেন, তাঁর স্ত্রীও কেদারকে নিজের সন্তানের মতই দেখেন। দিদির এই চরম বিপদের কথা শুনে তিনিও ভাবনায় ছিলেন। স্বামীকে বলেন তিনি—একবার উলাতে খবব নাও, কি সর্বনাশ হয়েছে সেখানে কে জানে? কেদারও ফিরল না।

এমনি দিনে কেদার মাকে নিয়ে আসতে মাসীমাও দিদিকে পেয়ে খুশী হয়। বলে, এও তোমারই বাড়ি দিদি, এতবড় বাড়ি পড়ে আছে, তবু তোমরা এসেছ ভালো হয়েছে। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম।

জগৎমোহিনী মাকে নিয়ে এখানে থেকে গেল।

কেদার আবার নিজের লেখাপড়ার কাজে ডুবে যান। তাঁর কাব্যগ্রন্থের দুটো খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে ঠাকুরবাড়িতেও যাতায়াত করেন, ক্রমশ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সান্নিধ্যেও আসেন তিনি, দ্বিজেন ঠাকুরের সঙ্গে আলোচনাও হয়। কেন্ট, হেগেল, গোয়থে, হিউম, শোপেনহাওয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের লেখাও পড়ছেন তবু মন ভরে না।

সনাতন হিন্দুধর্ম—শঙ্কর ভাষ্য—বেদান্ত আর পাশ্চাত্ত্যদর্শন তাঁর মনের দ্বন্দ্বকে আরও প্রকট করে তোলে। নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে তিনি রামমোহন রায়ের লেখাও পড়েছেন। যে নীতিকে ব্রাহ্মধর্ম অন্ধের মত অনুসরণ করে চলেছে সেটাকেও কেদারনাথ মেনে নিতে পারেন না।

রামমোহন সনাতন হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা সঠিক করেন নি—এই বিশ্বাসই তাঁর মনে হয়।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটিতে তিনি ভাষণ দেন ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে। কামনার নিবৃত্তিই প্রকৃত শান্তির সন্ধান দিতে পারে। এই ভাষণ নিয়ে তিনি যুক্তিও দেন, তাঁর এই আলোচনার সমালোচনাও হয়।

কেদারনাথ ক্রমশ নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে নিজের পথই যেন খুঁজতে থাকেন। পথের সন্ধান সেদিন ব্রাহ্মধর্ম তাঁকে দিতে পারে নি।

ওই সভায় তিনি বেতাল পঞ্চবিংশতির ইংরাজী অনুবাদও পাঠ করেন, আর তা খুবই সমাদৃত হয়।

ক্রমশ কেদারনাথের কবিখ্যাতি—আলোচনার সারগর্ভতার জন্য কলকাতার বৃহত্তম জ্ঞানীগুণী সমাজে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতিও ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। তাঁর হিন্দুধর্ম-কেন্দ্রিক ভাষণগুলো নিয়ে বেশ তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রেও তিনি সুপণ্ডিত, তাই তর্কযুদ্ধেও তাঁকে পরাজিত করা সহজ ছিল না। নিজের বক্তব্যের স্বপক্ষে তাঁর জোরালো যুক্তির সামনে প্রতিপক্ষ হার মানতে বাধ্য হতো। ব্রাহ্মধর্মের বেশ কিছু নেতা তাই তেজস্বী বিদ্বান কেদারকে বিশেষ স্নেহ করতেন—কিছু বন্ধুও চাইত কেদার তাদের দলেই আসুক।

তখন কেশব সেনও ব্রাহ্মধর্মের এক বিশিষ্ট কর্মী। কেদারের পরিচিত, কিন্তু কেদারনাথ সব দলেই আছেন নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে।

মিশনারীদের সঙ্গেও তাঁর মেলামেশা। যীশুর জীবনচরিত তাঁকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে, তাঁর প্রেম ত্যাগ কেদারকে উদ্বুদ্ধ করে।

কেদারের কবিতা লেখার কাজও চলেছে। মনে পড়ে পরিত্যক্ত সেই মৃত্যুর বিভীষিকাময় উলাগ্রামের কথা। আগেকার সেই সমৃদ্ধ জনপদের ছবিগুলো মনে ভেসে ওঠে। স্মৃতির সঞ্চয়। কেদারনাথ এবার বাংলাতেই কবিতা রচনা শুরু করলেন ১৮৫৭ সালে—

কাব্যের নাম দিলেন—বিজনগ্রাম।

প্রতি ছত্রে ছত্রে সেই সমৃদ্ধ সুখী জনপদের রূপটাই ফুটে উঠলো। বলেন ওলাইচণ্ডী দেবীর স্থানের কথা।

মনোহর নদীকূলে রাঁধে সদাগর
পরিমাণ শিলাখণ্ড—সুন্দর প্রস্তর।
শোভিত বটবিটপী, সিন্দূরে মণ্ডিয়া
আহা কি সুন্দর শোভা! রাখিলা লইয়া
তাহা বেদীর উপরে জনপদবাসী-
গণ, পূজিতে দেবীরে বর অভিলাষী।

গ্রামের চতুষ্পাঠীর ছবিও এঁকেছেন

—কোথাও ব্রাহ্মণগণ বেলা অবসান
দেখি, চতুষ্পাঠী ছাড়ি করিত প্রস্থান
নস্যের শামুক করে চলিতেন সবে
পথমধ্যে কতশত তর্ক কলরবে
ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত লইয়া
ঘোরতর দ্বন্দ্বানল উঠিত জ্বলিয়া,
যাহার কণ্ঠের স্বর অতি বলবান
ব্যাকরণে জয়ী সেই, কে তার সমান?

গ্রামের পুরনারীদের কথাও মনে পড়ে, তাদেরও কবিতায় আনেন—

—অদূর হইতে দৃশ্য পল্লীর কামিনী-
গণ, সরোবরতটে লইবারে বারি
আসিত সকলি মিলি হয়ে সারি সারি।
সুখেদুখে যেই রূপ হয় দিনকর,
সংসারের কথা সব কহি পরস্পর

চলিত সভয়ে সদা দেখিত যখন
পরপুরুষের মুখ, লাজে অচেতন
হয়ে লুকাইত তরুদের পাশে।
মেঘেতে তড়িৎ যেন লুকায় আকাশে।

গ্রামীণ সমাজের আনন্দভোজের কথাও লেখেন তিনি—

—দেখিয়াছি গ্রাম্যভোজ! নিমিত্ত ঘটনে
পংক্তি পংক্তি বসিতেন গ্রামবাসীগণে
কলাপাতা বিছারিয়া, বামে ধরি জল
হৃষ্টমনে। অন্ন, শাক, ব্যঞ্জনসকল,
ডাল, ডালনা, চচ্চড়ী, মোচাঘণ্ট, ভাজা
শাক, অম্ল, দধি, ক্ষীর, গোল্লা, গজা, ভাজা
খাইতেন বহুতর।

সেই আনন্দ-প্রাচুর্য আর পূর্ণতায় ভরা গ্রামের পরের সেই করুণ দৃশ্যগুলোও সজীব হয়ে ওঠে তাঁর বর্ণনায়।

...আলোক প্রবেশে
জনপদে বাহিরিয়া, দেখি অবশেষে
যমপুরী যেন গ্রাম! হাহাকার স্বর
শুনিয়া সকল দিকে, কাঁপিল অন্তর।
দেখিলাম গৃহে গৃহে কুকুরের গণ
ভীষণ আকৃতি সব, আরক্ত নয়ন
ভ্রমিতেছে স্থানে স্থানে, নির্ভয় অন্তরে,
নরমাংস খেয়ে খেয়ে নাহি ডরে নরে।

... ...

দেখিলাম কোন গৃহে মৃতশিশু কোলে
শুইয়া রয়েছে মাতা মহাত্বর ভোগে
অচেতন ; নাহি জানে কখন ঘটিল
ঘোরতর সে আপদ,—বালক মরিল
করিতে করিতে স্তন্যপান! জনশূন্য কত
পড়ি আছে অট্টালিকা দেখি শত শত
নাহি আছে রুদ্ধদ্বার ; পথের ভিতর
পড়ি আছে মৃতকায়া, লোকাভাব তরে
না হয় সৎকার শব। নিরানন্দময়
হইয়াছে এবে সেই সুখের আলয়।

এই কাব্যে দেখা যায়, তিনি পয়ার ছন্দকে একটি বিলম্বিত পর্যায়ে নিয়ে গেছেন, ইতিপূর্বে কোন বাংলার কোন কবি এই নতুন ছন্দ প্রয়োগে কাব্য রচনা করেননি।

একে বলা যেতে পারে বিলম্বিত পয়ার, অমিত্রাক্ষর ছন্দের সূত্রপাত এর থেকেই তা অনুমান করা যায়।

এর কিছু পরে ১৮৬০ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে—১৮৬১-৬২ সালে রচিত মেঘনাদবধ কাব্যে এই ছন্দেরই প্রকাশ দেখি, যা অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলেই সমধিক

পরিচিত হয়েছিল।

কিন্তু যে কোন কারণেই হোক, কেদারনাথ এই নবতম ছন্দরীতির প্রবর্তক বলে স্বীকৃতি পাননি—অবশ্য এ নিয়ে কেদারনাথেরও কোন ক্ষোভ ছিল না। কারণ তাঁর পরবর্তী জীবনে তিনি অন্যপথেই গিয়েছিলেন যা তাঁকে আজও অমর, স্মরণীয়, বরণীয় করে রেখেছে।

সে যুগে তিনি এই কাব্য রচনা করেছিলেন সে যুগ তখন শুধু বাংলাই নয়, সারাভারতের বুকে এক দুর্বার ঝড়ের তাণ্ডব এনেছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে সামাজিক বিবর্তনও সুরু হয়েছে। এসেছে সমাজের বুকে নবচেতনার প্রকাশ। তারই ছোঁয়া লেগেছিল সাধারণ মানুষের মনে। তাই সকলেই যেন নিজস্ব মত—ধর্ম—সংস্কারকে রক্ষা করার মানসিকতা ফিরে পেয়েছিল।

এইসময় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের শাসন-শোষণও বাড়তে থাকে। নিজেদের মধ্যেও লোভী অসাধু অনেক কর্মচারীই জুটেছিল যারা কোম্পানীর স্বার্থ ছাড়া নিজেদের স্বার্থও বেশী করে দেখতো। তাই শাসন-শোষণের পরিমাণটাও বেড়ে উঠেছিল। তার প্রতিক্রিয়াও শুরু হয়েছিল, আর এরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে গেল একটা ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সামরিক বাহিনীর মধ্যেও।

তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বিদেশী সেনাদের সঙ্গে দিশী পল্টনও রাখতো। বাংলাদেশের ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্টেও বেশ কিছু দিশী সেনা থাকতো।

এছাড়া দিল্লী-মিরাট-এলাহাবাদ-লক্ষ্ণৌ-কানপুর এসব ছাউনিতেও অনেক সেনা থাকতো। কোম্পানী এক নতুন ধরনের এনফিল্ড রাইফেল-এর প্রচলন করে। তার কার্টিজটাকে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ব্যারেলে পুরতে হতো। ক্রমশ রটে গেল যে এই কার্টিজে গরু আর শুয়োরের চর্বি মেশানো আছে।

গরুর চর্বি হিন্দু সিপাহীদের কাছে খুবই অপবিত্র আর শুয়োরের চর্বি মুসলমান সৈন্যদের কাছে সমান অপবিত্র। তাই তারা ওই কার্টিজ ব্যবহারে রাজী হল না। প্রতিবাদ জানাতে ইংরেজরাও ক্ষেপে গেল এই প্রতিবাদে। তাদেরও সম্মানে বাধে, তাদের হুকুম অমান্য করার জন্য ইংরেজ সেনাধ্যক্ষরাও শাস্তি দিতে চাইল সেনাদের।

ব্যারাকপুরে সূচনা হল এই প্রতিবাদের। মঙ্গল পাণ্ডে হল প্রথম শহীদ। দিশী সৈন্যরাও ক্ষেপে উঠল, লক্ষ্ণৌ-কানপুর-মীরাট এসব ছাউনিতে এদেশী সৈন্যরাও তাদের অধ্যক্ষদের মেরে ফেলে প্রকাশ্যে এবার বিদ্রোহে সামিল হলো। সারা বাংলা থেকে উত্তরভারতে ছড়িয়ে পড়ল এই বিদ্রোহের দাবানল।

ভীত ত্রস্ত ইংরেজদের অনেকেই সপরিবারে প্রাণ দিল বিদ্রোহীদের হাতে। দেশের বেশ কিছু মানুষও গোপনে তাদের সাহায্য করতে শুরু করলো।

এই প্রথম বিদ্রোহের সূচনা হল ইংরেজদের বিরুদ্ধে, যদিও এটা ব্যাপক ছিল না, সীমিত ছিল বিশেষ একটা ক্ষেত্রেই, তার কারণ সারা দেশের সাধারণ মানুষ এই সুযোগে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে এ দেশ থেকে তাড়াবার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না।

তাই এই বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিল কোম্পানী। কিন্তু তবুও এই বিদ্রোহের খবর দেশের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে।

কেদারনাথ যান তখন ঠাকুরবাড়িতে। দ্বিজেন ঠাকুরের ওখানেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকা আসে—সেইসব খবর নিয়ে আলোচনাও হয়।

কলকাতায় তখন অনেক গোরা সৈন্য। ইংরেজ নাগরিক সিপাহীদের ভয়ে এসে আশ্রয়

নিয়েছে—এই নিয়ে লোকমুখে নানা খবর ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহের আঁচ কিছুটা তখন কলকাতার সমাজেও এসে লেগেছে।

কিন্তু কোম্পানী সেই বিদ্রোহকে দমন করে, আর এবার ইংরেজদেরও মনে হয়, এদেশের শাসনভার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে রাখা নিরাপদ নয়। তাই এই ভারতবর্ষকে তারা ইংরেজের রাজার অধীনে এনে তার উপর পুরোপুরি দখল কায়েম করতে চায়।

এতে অবশ্য সারা ভারতের রাজামহারাজাদেরও তারা সামিল করতে চায়—তাদেরও করদরাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়া হল।

দেশের শাসনব্যবস্থাতেও কিছু পরিবর্তন এলো। কিন্তু সাধারণ মানুষ এ নিয়ে সেদিন মাথা ঘামায় নি। তারা তাদের সেই বাবুগিরি—হাফআখড়াই গান—বাঈজীবিলাস নিয়েই রইল। আর ধর্মসভাগুলোও হিন্দু-ব্রাহ্ম ধর্মের মতবাদের লড়াই সমানে চালাতে থাকলেন। খৃষ্টান মিশনারীদেরই বরং এতে সুবিধা হলো, শাসকদের ধর্মপ্রচারক তারা—বিশেষ কিছু সুবিধাও পেল তারা।

গঙ্গার তীরে দক্ষিণেশ্বরের পরিত্যক্ত ভূমিতে তখন হিন্দুধর্মের এক নব রূপায়ণের রূপকার নিভৃতে সাধনা করে চলেছেন। ক্রমশ তাঁর নামও পরিচিত হচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণও এই যুগসন্ধিক্ষণে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলার বুকে এক নতুন আলোকরশ্মির পূর্ণপ্রকাশ নিয়ে।

কেদারনাথ তখন কলকাতার শিক্ষাসংস্কৃতির জগতে পরিচিত হচ্ছেন। তাঁর ইংরাজী কাব্য Poraude এর মধ্যে সুনাম অর্জন করেছে। এই সময় কেদারনাথ মিসেস ই-লক্ নামে এক ইংরাজ কবির সঙ্গে পরিচিত হন। ওই ভদ্রমহিলার কিছু কবিতার বইও নাম করেছে, কবি মহিলা আত্মা প্ল্যানচেট এসবেও খুব বিশ্বাস করতেন। কেদারনাথ-এর কবিতারও গুণমুগ্ধা ছিলেন তিনি, কেদারনাথের সঙ্গে কবিতা নিয়ে আলোচনা ছাড়াও প্ল্যানচেট—ভূত-প্রেত এসব নিয়েও আলোচনা হতো। তিনি নাকি প্ল্যানচেটে ভূতকে দেখতে পেতেন। কিন্তু এও সেই উলা গ্রামের মড়ার দুধগঙ্গাজল খেয়ে হাসার মতই ব্যাপার। কেদারনাথ অবশ্য তাঁর পাশে থেকেও ভূতপ্রেতের টিকিটিও দেখতে পাননি কোনদিন।

কবি হিসাবে ভদ্রমহিলার অবদান অনেক ছিল। তাকেই Poraude এক খণ্ড উৎসর্গ করেন কেদারনাথ। কাব্যরচনা চলছে।

দোলপূর্ণিমার আগে বর্ধমানের মহারাজা প্রতাপচন্দ্র মহাতাব তরুণ কবি কেদারনাথকে বর্ধমানে সসম্মানে নিয়ে যান। মহারাজা নিজে ছিলেন গুণগ্রাহী, প্রকৃত গুণীজনের সমাদর করতেন। কেদারনাথও মহারাজার আমন্ত্রণে বর্ধমানে এসে তাঁর সমাদরে মুগ্ধ হন।

মহারাজকে তাঁর কাব্যগ্রন্থ Poraude উপহার দেন, মহারাজও তাঁর কবিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

বর্ধমান থেকে কেদারনাথ যেন রাজ্যজয় করার আনন্দ নিয়ে কলকাতায় ফেরেন। মহারাজার উৎসাহও তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে, সেই আনন্দে অধীর হয়ে বাড়ি ফেরেন বেশ কয়েকদিন পর।

কিন্তু বিধি বাম।

বাড়িতে গেছেন যখন বৈকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামছে। কেউ নেই বাড়িতে। মা জগৎমোহিনীই দরজা খুলে বলেন—মায়ের শেষ মুহূর্ত। তাঁকে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে অর্ন্তজলী করা হয়েছে। যদি শেষ দেখা দেখতে চাও, নিমতলার ঘাটে যাও।

কেদারের মনে হয়, এ যেন বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়েছে। কবিতার রাজ্য থেকে ফিরে আসেন

তিনি কঠিন বাস্তবে। আবার সেই মৃত্যুর পদধ্বনি শোনেন তিনি।

গঙ্গাতীরে আনা হয়েছে দিদিমাকে।

তাঁর শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে। কেদারনাথ এসে দাঁড়ান। মনে পড়ে উলার সেই প্রাচুর্যের দিনের কথা। তিনি ছিলেন রাজরাজেশ্বরী। সেই স্মৃতি—সব সুর—আনন্দের মুহূর্তগুলো মনে পড়ে। এক গৌরবময় অতীতের সাক্ষী ছিলেন ওই দিদিমা, আজ সব শেষ হয়ে গেল।

চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল তাঁর নশ্বর দেহ। ধন-জন-বৈভব—সবকিছু মিথ্যা—সত্য ওই পরিণতি। তবে মানুষ বাঁচে কেন—আসেই বা কেন এই জগতে, আবার নিঃস্ব হয়ে চলে যায় মৃত্যুর অন্ধকারে! এই মৃত্যুকে জয় করার সাধ্য তাঁর নেই—সব হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতলে।

এইভাবে মৃত্যুর কাছে হার মানতে রাজী নন তিনি।

দিদিমাও চলে গেলেন। শেষ হয়ে গেল এক গৌরবময় অধ্যায়। কেদার তখনও কোন রোজগারের মুখ দেখেন নি, মাকে নিয়ে রয়েছেন মেসোর বাড়িতে, এদিকে স্ত্রীও এবার বড় হয়ে উঠছে। সব মেয়েরই কামনাবাসনা থাকে নিজের একটি নীড় রচনা করতে, সংসারের স্বপ্ন নিয়ে, স্বামী-পরিজনদের নিয়ে সে বাঁচবে।

সয়ামণির চিঠি আসে রানাঘাট থেকে। এবার সেও আর বাবার আশ্রয়ে নয়, স্বামীর ঘরে আসতে চায়, নিজের ঘর বাঁধতে চায়।

কেদারনাথ এবার চিন্তায় পড়েন।

অর্থ রোজগার করার চিন্তাটা ছিল না, কিন্তু এবার সেই কঠিন বাস্তব জগতের কথাই ভাবতে হচ্ছে তাঁকে।

মা'ও বলেন—কেদার, এবার ঘরসংসার কর বাবা। বৌমাকেও নিয়ে আয়!

উলাগ্রামে আর যাবার ইচ্ছা নাই মায়ের।

জগৎমোহিনী সেই শূন্যপুরীতে আর ফিরে যেতে চান না। সব তাঁর হারিয়ে গেছে, কেদারকে নিয়েই তিনিও বাঁচার স্বপ্ন দেখেন।

চাকরি চাই। জীবিকার সংস্থান কিছু করতে হবে, শুধুমাত্র কবিতা আর ওই বিতর্কসভায় মানখাতির পেলেই চলবে না, সাংসারিক দায়দায়িত্বও নিতে হবে।

এদিকে এখান-ওখানে চেষ্টায়ও তেমন করে লাভ হয় না।

শেষ অবধি কাশীবাবুর চেষ্টায় কেদার শিক্ষকতার চাকরি পেলেন তাঁরই পুরানো স্কুল হিন্দু চ্যারিটেবল স্কুলে। সেখানকার তিনি ছিলেন কৃতী ছাত্র, তাই সেই প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকতার পদ পেলেন, মাইনে খুব বেশী নয়, মাসে পনেরো টাকা মাত্র।

অবশ্য তখন ছিল খুবই সস্তাগণ্ডার দিন। ওই টাকাতেই অনেকে সংসার নির্বাহ করে যেতেন। কেদারনাথও সেই ভাবেই সংসার চালাবেন। তবু এ তাঁর নিজের উপার্জন, এতেই চালাতে হবে।

এতদিন পর ওই অঞ্চলেই একটা ছোট্ট বাসা নিয়ে সংসার পাতলেন কেদারনাথ। মাকে নিয়ে এলেন তাঁর নিজের ঘরে আর স্ত্রীকে আনালেন রানাঘাট থেকে। কেদারনাথের শিক্ষকতার জীবন শুরু হলো।

কেদারনাথের মা ছিলেন বিরাট ধনীর মেয়ে, স্ত্রীর বাবার সম্পদও কম নয়। প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁরা দিন কাটিয়েছেন বিরাট প্রাসাদে দাসদাসী পরিবৃতা হয়ে। আজ ছোট এই ঘরে তাঁদের থাকতে হয়। দুটো তক্তপোষ দু'ঘরে, একদিকে একটা টেবিল, দু'খানা চেয়ার আর একটা র‍্যাক। কেদারের বইপত্র সব টেবিলে র‍্যাকে ছড়ানো।

আর সামান্য এই টাকায় কোনমতে চলে তিনটি প্রাণীর। কেদারনাথ সেই ইংরাজ কবিমহিলাকে দেখেছেন তখন থেকেই তাঁর মনে হয়েছে বিশেষ পরিচিতি বা খ্যাতিপ্রতিষ্ঠা পেতে গেলে বিদেশেও প্রচার চাই। বৃহত্তর বিশ্বে পৌঁছতে হবে তাঁদের, শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের পরিধি যে অনেক বড় এটা তখনই অনুধাবন করেন কেদারনাথ।

সংসারের দাবী মেটানো যে কঠিন তা ক্রমশ বুঝছেন কেদারনাথ। তাঁর লেখাপড়া, স্কুলের কাজের সঙ্গেও সংসারের সব দায় তিনি বয়ে চলেছেন। সংসারী জীবের কাছে সংসারের সব দায়দায়িত্ব পালন করা বিশেষ ধর্ম।

কিন্তু তবুও বাড়তি রোজগার নেই, এই সামান্য মাইনেতে সংসার চলে না। বাসাভাড়াও বাকী পড়ছে। সংসারের এদিকে আনতে ওদিকে কুলোয় না।

জগৎমোহিনীর ঘাড়েই এই সংসার।

জীবনে তিনি যেন বোঝা টানতেই এসেছেন। নিজের স্বামীর ঘর করার অবকাশ হয় নি, বাবার সংসারেই ছিলেন, শেষের দিকে দেখেছেন অভাবের ছায়াটাকে।

এখানেও তাই।

তবু ছেলেকে জানতে দেন নি। কেদার যা দিয়েছে তার সঙ্গে নিজের সঞ্চয় থেকে কিছু দিয়ে সংসার চালিয়েছেন।

বাড়িওয়ালার ক'মাসের ভাড়া বাকী। ভাড়ার টাকা দিতে পারেন নি। বাড়িওয়ালাও এবার এসে তাড়া সুরু করেছে। জগৎমোহিনী বলেন—কেদারকে বলবেন না, আমি যেভাবে হোক আপনার টাকার ব্যবস্থা করবো।

বাড়িওয়ালাও নাছোড়বান্দা। সে বলে—সাতদিনের মধ্যে আমার বাকী টাকা চাই-ই, নাহলে ভালো হবে না।

জগৎমোহিনীও ভাবনায় পড়েন।

তাঁর সঞ্চয়ও ফুরিয়ে আসছে। মনে পড়ে তাঁর গহনার মধ্যে একছড়া হার এখনও রয়েছে।

সেটা নিয়েই বের হন কোন স্বর্ণকারের দোকানে।

বাড়িওয়ালাও আজ তৈরী হয়ে এসেছে, টাকা তার চাই। নাহলে বেশ কড়া কথা শুনিয়ে, বাড়ি ছাড়ার কথাই বলে যাবে।

কিন্তু নগদ টাকাই সব পায় সে।

কেদার বাড়ি ফিরছে, দেখে মা টাকা দিয়ে বিদেয় করছে বাড়িওয়ালাকে। মা বলেন—কেদার মাইনে পেয়েছে, নিন আপনার টাকা।

কেদার শোনে কথাটা। বেশ বুঝেছে এই টাকা মা-ই কোথা থেকে সংগ্রহ করেছে। আর পরে সেটাও জানতে পারে।

—তোমার গলার হারটা দেখছি না মা?

ক্রমশ জেরার মুখে মা বলেন—ওটাতে কি আর হবে বাবা? তবু সংসারের কাজেই লাগলো। আমার অলংকার তো তুই বাবা।

কেদার চুপ করে থাকেন। মনে হয় এভাবে ওই চাকরি নিয়ে পড়ে থাকা চলবে না। সংসারের জন্য তাঁকে আরও টাকা রোজগার করতেই হবে।

তাই এবার অন্য চাকরির সন্ধান করতে থাকেন কেদারনাথ।

চাকরি একটা জুটেও গেল তাঁর, এক চিনির মহাজনের গদিতে ম্যানেজারির কাজ পেলেন। মাইনে অবশ্য কিছু বেশীই।

এতদিন লেখাপড়া আর শিক্ষকতার কাজ নিয়েই ছিলেন কেদারনাথ। এবার এলেন এক নতুন পরিবেশে।

ব্যবসাদারীর কথাই চলে এখানে। গুদামে মাল এলে তার হিসাব রাখা, চালানের হিসাব—মাল কেনার জন্য মহাজনরা আসে, চিনির দরদাম নিয়েও আলোচনা হয়। জাহাজ আসে চিনি বোঝাই হয়ে, তখনই চিনি কিনে গুদামজাত করতে হয়, চিনি পাইকারী দরে শ' শ' বস্তা কেনা হয়, আবার চালানও যায় চারিদিকের পাইকেরদের কাছে।

এ যেন চিনির বলদের কাজ।

তবু সংসারের মুখ চেয়ে কেদারনাথ চিনির মহাজনের লাভ-লোকসানের হিসাব রাখতে থাকেন, চিনির দরদস্তুরও জানতে হয়।

সেবার জাহাজে প্রচুর চিনি এসেছে। এক সাপ্লায়ার-এর কাছ থেকে কেদারনাথ বেশ কয়েকশো বস্তা চিনি কিনে গুদামে তোলান। দেখা যায় সেই যোগানদার কেদারনাথকে একবস্তা চিনি দিয়ে যান।

অবাক হন কেদার—এটা কি হবে?

মহাজন এ-হেন ম্যানেজার যেন এই প্রথম দেখলেন, তবুও বলেন—ওটা আপনার।

একবস্তা চিনি রেখে চলে গেল সে। কেদারনাথ ওই বস্তাভর্তি মাল নিয়ে এবার বিপদে পড়েন। এটা কেন তাঁর প্রাপ্য হবে তাও বোঝেন না। এইভাবে অযাচিতভাবে কিছু নিতেও অভ্যস্ত নন তিনি।

তাই মালিক শেঠজীর কাছে গিয়ে বলেন,—একবস্তা চিনি ওই মহাজন রেখে গেলেন, বলেন ওটা আমাকে নিতে। কিন্তু কেন নেব? ওটা গুদামেই তুলে দিয়েছি শেঠজী। ওসবে আমার দরকার নাই।

শেঠজী এর মধ্যেই চিনেছেন সৎ ওই তরুণকে। আজও দেখেছেন সে ওই দস্তুরিও নেন নি। শেঠজী বুঝেছেন এই জগতের পাটোয়ারি বুদ্ধি এর নেই। তিনি বলেন,—বাবুজী, আপনি শিক্ষকতা করছিলেন না এর আগে?

কেদারনাথ বলেন—হ্যাঁ।

—সেই রকম কোন শিক্ষকতার চাকরিই করুন। যতদিন না তেমনি কোন চাকরি পান এখানের কাজ দেখবেন। তবে এই পথ আপনার নয়, ওই শিক্ষকতার পথে—পড়াশোনাব জগতেই ফিরে যান। সেই আপনার মত লোকের যোগ্য কাজ হবে।

কেদারনাথ ওঁর কথাটার গুরুত্ব দেন।

তিনি নিজেও দেখেছেন এখানে ম্যানেজার থেকে মুন্সী মায় গুদামের কুলি অবধি মাল সরায়, কম ওজন লিখে দস্তুরি নেয়, নানা অসৎ পথে রোজগার করে। এই পরিবেশও তাঁর ভালো লাগে না। অন্য চাকরিই খুঁজতে থাকেন কেদারনাথ।

কিন্তু তখন স্কুলের সংখ্যাও সীমিত। আর বেশ কিছু যুবক ইংরাজী শিখেছে—তারা সেখানেই আগে থেকে বহাল হয়ে গেছে।

ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কাছে কাজ পাওয়া যায়, কিন্তু কেদারনাথ ওই ব্যবসার জগতে যেতে চান না। ধনী পরিচিতজনের সংখ্যাও কম নয়, কিন্তু তাঁর আত্মসম্মানে বাধে কারও অনুগ্রহ নিতেও আর তা যদি নিতেই হয়, যাবে তেমনি এক মহাপুরুষের কাছেই, সাধারণ ধনীর কাছে নয়।

• ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছাত্র তিনি।

ঈশ্বরচন্দ্র এই নামটা কেদারনাথের জীবনে এক পুণ্যনাম। তাঁর দাদুর কথা মনে পড়ে। বিরাট হৃদয়বান একটি মানুষ। আর এক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীকে দেখেছিলেন স্কুলে, মহাজ্ঞানী এক তাপসপ্রতিম আচার্য, তাঁর ঋণ জীবনে ভুলতে পারবেন না কেদার।

সেদিন এক সভায় কেদার এসেছেন বিদ্যাসাগর মশায়ের ভাষণ শুনতে।

সমাজের বুকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তখন এক আলোড়নের সৃষ্টি করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহের আগে থেকেই বিদ্যাসাগরও সমাজের বুকে আর এক বিদ্রোহের সূত্রপাত করেছেন।

এতকাল ধরে সমাজে গৌরীদানের প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন পাঁচ-সাত বছরেই মেয়ের বিয়ে দেওয়াটা বাবা-মা পুণ্যের কাজ বলেই জানতেন।

আর সমাজের বুকে তখনও কৌলীন্যপ্রথার প্রচলন রয়েছে। কুলীনবংশে জন্মালেই তাকে দেবতুল্য বলে ভাবা হতো। তাদের হাতে কন্যা সম্প্রদান করাও ছিল পুণ্যের কাজ—এই প্রচারই করেছিল স্বার্থপর কুলীনসমাজ।

তাই বৃদ্ধ গঙ্গাযাত্রী কুলীনের সঙ্গেও মেয়ের বিয়ে দিয়ে অনেকে ধন্য হতো। আর এক এক কুলীন পুঙ্গবের পত্নীসংখ্যা যে কত ছিল তা সঠিক সেই তথাকথিত পতিদেবতাও জানতেন না। ফলে একজন কুলীন পুঙ্গবের মৃত্যুর পর কয়েকগণ্ডা, এমনকি শতখানেক বালবিধবার সংখ্যা বাড়তো সমাজে, তারা বিনা অপরাধে বাকী জীবন পরের গলগ্রহ হয়ে দিনাতিপাত করতো—অনেকে কাশী বৃন্দাবনে গিয়ে ভিক্ষা করে দিন কাটাতো।

বিদ্যাসাগর এই বিধবাদের আবার বিবাহ দিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলেন—আর বহুবিবাহপ্রথাও আইন করে রদ করার কাজে হাত দিলেন।

এতেই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজে ধর্ম রসাতলে গেল এই রব উঠেছে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে হিন্দুধর্মের অনেক শিরোমণি এবার বিদ্যাসাগরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন। তত্ত্ববোধিনী, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি পত্রিকাতেও বাদপ্রতিবাদ চলেছে—

সাধারণ মানুষও বিস্মিত। তারাও গানে-ছড়ায় বিদ্যাসাগরের এই মহান প্রচেষ্টাকে ব্যঙ্গ করতে থাকে।

সিপাহী বিদ্রোহের আগেই এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। দেশের বহু পণ্ডিত লিখিত ভাবে সরকারের কাছে বিদ্যাসাগরের এই কাজের প্রতিবাদ জানান। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই আন্দোলন কিছুটা চাপা থাকলেও পরবর্তীকালে তা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

সমাচার সুধাবর্ষণ পত্রিকায় ব্যঙ্গকবিতাও ছাপা হয়েছিল,

—আমরা বলিয়া রাখি বিধবারা সবে।
শঙ্খ শাড়ি পড়িয়া প্রস্তুতভাবে রবে॥
পড়িবেন ঈশ্বর এ বিবাহের মন্ত্র।
খাটিবে না আর কারো তালমান যন্ত্র॥

আবার কোন কবি গেয়ে ওঠে,

বাধিয়াছে দলাদলি লাগিয়াছে গোল।
বিধবার বিয়ে হবে, বাজিয়াছে ঢোল॥
কত বাদী প্রতিবাদী করে কত রব।
ছেলে বুড়ি আদি করি মাতিয়াছে সব॥

বিধবাবিবাহ নিয়ে সেদিন সমাজও উত্তাল হয়ে ওঠে। পথেঘাটে সঙ-ও বের হয়। তাদের মুখে ছড়াগানেও সেই বিধবা বিবাহ আর বিদ্যাসাগরের প্রতি ভ্রূকুটি।

—বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে করেছে রিপোর্ট, বিধবাদের হবে বিয়ে,
কবে হবে এমন দিন প্রচার হবে ল আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরুবে হুকুম,
বিধবা রমণীর বিয়ের লেগে যাবে ধূম॥

রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃত্বেও এই বিধবাবিবাহের বিরোধিতা শুরু হল। কিন্তু বিদ্যাসাগর অবিচল রইলেন। তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য দিয়ে যে যুক্তি অবতীর্ণ করলেন তাকে খণ্ডন করার পথও পান না এঁরা।

এমনি এক সভায় কেদারনাথকে দেখেন বিদ্যাসাগর। কেদার তখন শিক্ষকতার কাজের সন্ধান করছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কেদারের যোগ্যতার খবর রাখতেন, ছাত্র হিসাবেও চিনতেন তাঁকে, ঈশ্বরচন্দ্রই বলেন—বাড়িতে এসো একদিন, দেখি তোমার জন্য কিছু করা যায় কিনা। তোমার মত তরুণদের শিক্ষার জগতে আসার প্রয়োজন আছে।

বিদ্যাসাগর মশায় নিজে শুধু আদর্শ শিক্ষকই ছিলেন না, তখনকার কালে শিক্ষাপ্রসারে অনেক কাজ করেছেন। অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, নানাভাবে তাদের সাহায্য সহযোগিতা করেছেন আর তাঁর বহু কৃতী ছাত্রদেরও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার কাজে পাঠিয়েছেন যাতে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার ঘটে।

তখন বাংলা বিহার উড়িষ্যা ছিল এক প্রদেশের অন্তর্গত। আর শিক্ষাবিভাগের পদস্থ দিশী-বিদেশী কর্মচারীরাও বিদ্যাসাগর মশায়কে চিনতেন, শ্রদ্ধা করতেন। তাই তাঁর সুপারিশে যারাই যেতেন তাদের শিক্ষকতার পদে নেওয়া হতো। এইভাবে তিনি বহু যোগ্য শিক্ষকও তৈরী করেছিলেন।

তখন উড়িষ্যার শিক্ষাবিভাগ ছিল ইন্‌সপেকটার অব স্কুলস, সাউথ বেঙ্গল ডিভিশনের অধীনে। সেই পদে বহাল ছিলেন ডঃ রোয়ার নামে এক ইংরেজ।

বিদ্যাসাগর মশায় কেদারনাথকে চিঠি দিয়ে কটকে ডঃ রোয়ারের কাছে পাঠালেন—তাঁকে যেন কোন স্কুলে বহাল করা হয়।

বিদ্যাসাগর মশায়ের সুপারিশ দেখে ডঃ রোয়ারও কেদারনাথকে কেন্দ্রাপাড়ার স্কুলে শিক্ষকতার কাজে বহাল করলেন। আর কেদারনাথকে বলেন—বাবু, শিক্ষকতার কাজেই যদি থাকতে চাও, তাহলে পুরীতে গিয়ে টিচার্স ট্রেনিং কোর্সও করে নাও, এতে তোমার ভালোই হবে।

কথাটা কেদারনাথেরও মনে ধরে।

তিনি শিক্ষকতার কাজে পুরোপুরিভাবে লাগবেন মনস্থ করেছেন, তাই এই কোর্সটাও করার কথা ভাবলেন।

একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে। খুশিমনে সুখবর নিয়ে তিনি কলকাতায় ফেরেন, তখন মা-স্ত্রী কলকাতাতেই রয়েছেন। আর এখানে এসেই খবরটা পান।

এতদিন ধরে উড়িষ্যার দাদু রাজবল্লভ দত্তের সঙ্গে চিঠিপত্রেরই আদানপ্রদান ছিল মাত্র, বাবা মারা যাবার পরও কেদারনাথকে সেই জমিদারী নিতে হয়নি। জগৎমোহিনীরও সেই জমিদারীতে তেমন আগ্রহ ছিল না। তাঁর স্বামী যে সম্পদ ভোগ করতে পারেন নি, জীবনের শেষদিনে তাঁর মালিক হলেও সেই সম্পদ এঁরা কেউ ভোগ করতে যান নি।

রাজবল্লভ দত্ত একাই ছিলেন উড়িষ্যার নিভৃত পল্লী ছোট গোবিন্দপুরে, সেই সম্পত্তির দখলীদার হয়েও তিনি সন্ন্যাসীর মতই নিরাসক্ত জীবনযাপন করতেন। একাহারী স্বল্পাহারী ত্যাগী মানুষ। দেবসেবা অতিথিসেবা আর দিনরাত্রি জপধ্যান করেই দিন কাটতো তাঁর।

এবার রাজবল্লভ দত্ত মশায় চিঠি দিয়েছেন তাঁর দিন শেষ হয়ে এসেছে। মৃত্যুর পূর্বে নাতি-নাতবৌ—বৌমাকে শেষ দেখা দেখতে চান। যদি তারা আসে তাঁর জীবনের শেষ অপূর্ণ বাসনাটুকু পূর্ণ হবে।

জগৎমোহিনী শ্বশুরের এই শেষ অনুরোধ রক্ষা করতে চান, তাঁর নাতি-নাতবৌকেও নিতে হবে তাঁর মত মহান মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

তাই বলেন তিনি, ওখানে চল কেদার আর উড়িষ্যাতেই চাকরি করবি। এখানেই বা কলকাতায় কোথায় থাকবো! তবু তোর কাছাকাছিই থাকা যাবে আর বাবাও চান তাঁর অবর্তমানে সেখানের বিষয়-আশয়ের ভার তুই নিবি। তাঁর আর তো কেউ-ই নেই।

কেদার বলেন—বিষয়-আশয়ের ভার নিতে হবে মা?

মা বলেন—এই তাঁর শেষ অনুরোধ। ওখানে চল—তারপর দেখা যাবে। কবে আছেন কবে নেই তিনি—তাঁর শেষ অনুরোধটুকু রাখ বাবা।

মায়ের আদেশ কেদারনাথ অগ্রাহ্য করতে পারেন না। আর কেন্দ্রাপাড়ার চাকরিতে যোগ দিতেও দেরী আছে, তাই মায়ের কথামত ওঁদের নিয়ে ছোট গোবিন্দপুরে যাবার দিন জানিয়ে চিঠিও দিলেন কেদারনাথ।

কলকাতা মহানগরীতে জীবনের বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে কেদারের। শিক্ষা-সংস্কৃতির এই পীঠস্থানে থেকে আরও অনেক কিছু কাজ করতে চেয়েছিলেন তিনি। এখানে বহুগুণীজনের সান্নিধ্য পেয়েছেন, অর্জন করেছেন বেশ কিছু অভিজ্ঞতা—লেখার কাজও এখানেই করা সহজ।

ব্রাহ্মধর্ম-হিন্দুসভা-মিশনারীদের পরিবেশ সব কিছু থেকেই তিনি নিজের মতবাদকে গড়ে তুলতে পেরেছেন। দেখেছেন একটি যুগসন্ধিক্ষণকে।

দেখেছেন মানবতাবাদী এক মহাপুরুষকে—বিদ্যাসাগর মশায়, যেন এই নবজাগরণের অন্যতম এক পথিকৃৎ। রামমোহন রায়ও চেয়েছিলেন বেদ-উপনিষদ-বেদান্তকে উদ্‌ঘাটন করতে, যদিও কেদারনাথের মতের সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যা অনেক ক্ষেত্রে মেলে না। তবু অতীতকে আবিষ্কার করার প্রচেষ্টা এই নবজাগরণের অন্যতম সুফল তা মানতেন।

বিদ্যাসাগর মশায়ও সেই অতীত সম্পদকে পূণঃ প্রচার করার কাজে নামেন। এ যেন নবজাগরণের যুগধর্মই, প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্য-কাব্য-ঐতিহ্যকে পুনরাবিষ্কার করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করার কাজই শুরু হয়েছে।

কিন্তু এই যুগসন্ধিক্ষণে মহানগরীর এই কর্মমুখর পরিবেশ—এই কর্মযজ্ঞ থেকে তাকে সামান্য শিক্ষকতা নিয়ে জীবিকা অর্জনের জন্যই দূরে চলে যেতে হচ্ছে। একা হলে যেভাবে হোক কলকাতায় থাকতেন, কিন্তু সংসারের দাবীও মেটাতে হবে।

তাই এই স্বেচ্ছা নির্বাসনকে মেনে নিতেই হবে। তবু জীবন-দেবতার কাছে প্রার্থনা জানান—এভাবে অপরিচিতের মত শেষ হয়ে যেতে যেন না হয় দূর প্রবাসে। জীবনের শূন্য পৃষ্ঠায় যেন স্বর্ণাক্ষরে কিছু লিখে রেখে যেতে পারেন।

জানেন না জীবনদেবতার কি নির্দেশ! তবু কেদারনাথ এক সন্ধ্যায় সপরিবারে কলকাতা থেকে যাত্রা করলেন পরবাসে। মহানগরীতে তার অন্নসংস্থান হল না, তাই পাড়ি দিতে হল অজানার পথে কোন্ ভাগ্যদেবতার অমোঘ নির্দেশে।

অচেনা পথ। স্টেশনে নেমেও কোন লোকজন বা গাড়ি পাল্কী কিছুই দেখেন না কেদারনাথ। মা-স্ত্রীকে নিয়ে অজানা জায়গায় এসে পড়েছেন। ভেবেছিলেন দাদু নিশ্চয়ই লোকজন পাঠাবেন তাঁদের পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু সে-সব ব্যবস্থা কিছুই নেই।

তবু এতদিন পর এতদূরে এসে ফিরে যেতেও মন চায় না তাঁদের। কে জানে হয়তো কোন বিপদই ঘটেছে সেখানে।

কেদারনাথ লোকজনের সন্ধান করে গাড়ি একটা ভাড়া করে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে চলেছেন দুরু দুরু বুকে ছোট গোবিন্দপুরের উদ্দেশে।

অনেকখানি পথ, চলেছেন তাঁরা। ছোট গোবিন্দপুরের কাছাকাছি আসতে দেখা যায় দুটো পাল্কী চলেছে, লোকজনও সঙ্গে রয়েছে।

কেদারনাথ তাদের জিজ্ঞাসা করতে জানতে পারেন যে দাদুই পাঠিয়েছেন তাদের। খবরটা সময়মত না পৌঁছানোর জন্যই এই কাণ্ড।

শেষ অবধি তাঁরা পৌঁছলেন ছোট গোবিন্দপুরে। রাজবল্লভ দত্তকে দেখে এগিয়ে যান কেদারনাথ।

এককালে এই বাড়িতেই তাঁর বাবাও থাকতেন, কিন্তু চলে গেছলেন, না হলে হয়তো এ বাড়িতে সেই-ই থাকতো।

রাজবল্লভ বেশ সুস্থই রয়েছেন। দেখে মনে হয় সুস্থ মানুষই, তাদের এইভাবে ডেকে পাঠানোতে কেদারনাথও অবাক হন।

রাজবল্লভ দত্তের ওসব কথা ভাবার সময় নেই। তিনিও ওদের জন্য অধীর প্রতীক্ষাতেই রয়েছেন। এতদিন ওদের জন্য ব্যাকুল হয়ে ছিলেন, কেদারনাথকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরেন। বৃদ্ধ মানুষটির দু'চোখে নামে আনন্দের অশ্রু। জগৎমোহিনী-সয়ামণিও প্রণাম করেন ওই ঋষিতুল্য মানুষটিকে। আজ দীর্ঘদিন পর জীবনের শেষপ্রান্তে এসে তিনি যেন হারানিধি ফিরে পেয়েছেন।

সুন্দর একটি গ্রাম। রাজবল্লভ দত্তের সাজানো সুখী সংসার। গোয়ালে অনেক গরু, চাষবাসও হয়, আর দুধেরও অভাব নেই।

ওদিকে কাছারিবাড়ি।

বিশাল দিঘির পাশে ছায়াঘন পরিবেশে রাজবল্লভ জগন্নাথদেবের মন্দির তৈরী করেছেন। মন্দির-নাটমন্দির—ওদিকে সদাব্রত অতিথিশালা সব ব্যবস্থাই রয়েছে।

রাজবল্লভ দত্ত মশায় দেবসেবা ধ্যানজ্ঞান নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। এতদিন সেই সব নিয়েই ছিলেন। তিনিই কেদারনাথের কোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন। তাঁর দিব্যদৃষ্টির সামনে কেদারনাথের ভবিষ্যৎ-এর গৌরবময় ছবিটাও ফুটে ওঠে, নিজের ভবিষ্যৎও তাঁর জানা। তাই বলেন কেদারকে,—আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে কেদার।

কেদারনাথ অবাক হন, বলেন তিনি,—আপনি তো সম্পূর্ণ সুস্থ।

হাসেন রাজবল্লভ। বলেন,—সময়েই তা জানতে পারবে। তবে সেদিন তোমার বাবাকেও বলেছিলাম, আজ তোমাকে বলছি, তোমার প্রকৃত কর্মারম্ভের সময় হবে তোমার সাতাশ বছর পূর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে। তার জন্য তোমাকে তৈরী হতে হবে, তোমার সামনে বিরাট কর্ম। আমার মৃত্যুর পর বেশীদিন তুমি এখানে না থেকে নিজের কাজে যোগ দেবে। মা-বৌমা এখানে থেকে যাবেন।

জগৎমোহিনীও শোনেন বৃদ্ধের কথা। তিনি বলেন—এসব কি বলছেন বাবা?

—হ্যাঁ মা। তুমি জেনে রেখো। আর এ গ্রামের বিষয়-আশয় যা আছে দেখেশুনে চলতে পারলে তোমাদের দিন চলে যাবে। আর কালে কেদার এই বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে মা। ওর

উপর রয়েছে দেবতার পরম আশীর্বাদ।

মৃত্যুর ছায়াকে দেখেছেন কেদারনাথ বার বার।

সেই রূপটা মোটেই সুখপ্রদ নয়। যেন আতঙ্কের আর পরম দুঃখেরই। এবার দেখেন মৃত্যুর এক সুন্দর রূপ। জীবনের সঙ্গে মৃত্যুর এ যেন প্রেমের রাখীবন্ধন।

রাজবল্লভ দত্ত সম্পূর্ণ সুস্থ। নাতি-বৌমাদের ডাকেন। ইষ্টনাম জপ করছেন। শান্ত একটি ব্যক্তিত্ব। ধ্যান গম্ভীরতায় সমাহিত। বলেন,—আমি চললাম কেদার, ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। স্তব্ধ হয়ে যান তিনি চিরসমাধিতে। কোথাও যন্ত্রণার কোন বিকার নেই, শান্ত আনন্দময় কোন অসীম জগতের পথে তিনি হারিয়ে গেলেন।

সারা অঞ্চলের মানুষজন জমায়েত হয়। এখন কান্নার রোল নেই, সমবেত কণ্ঠে হরি ধ্বনি ওঠে। আকাশবাতাস মুখরিত হয় সেই নামগানে।

—হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরেরাম হরেরাম রাম রাম হরে হরে॥

নদীতীরে মুখাগ্নি করেন কেদার, তাঁর হাতে এই শেষাগ্নি স্পর্শের জন্যই রাজবল্লভ এতদিন অপেক্ষা করে ছিলেন।

জগৎমোহিনীর উপর এতদিন পর আবার সেই জমিদারী দেখাশোনার ভার পড়ে। বৌমা সয়ামণিও ক্রমশ মায়ের সঙ্গে সংসারের কাজে হাত দেয়।

কেদারনাথ দাদু মারা যাবার পর এখানে কিছুদিন থাকতে বাধ্য হন। এখানের বিষয় আশয়-এর হিসাব করা, পরিচালনার ব্যবস্থা করা এসব কাজের জন্য রয়ে গেলেন। কেদারনাথ দেখেন ওই বিশাল মন্দির-অতিথিশালা ইত্যাদির খরচ বাবদ দাদু বেশ কিছু জমির ব্যবস্থা করেছেন। আর কিছু মোহান্ত-বৈষ্ণবও রয়েছেন সেখানে সেবা-পূজাদির জন্য। অতিথিদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাও আছে, পথিকজন-ভক্তদের আহার-আশ্রয় দেবার কথা বলেছেন দত্তমশায়।

কিন্তু রাজবল্লভ দত্ত গত হবার পরই সেই মন্দিরের মোহান্ত যেন নিজে মালিক সেজে বসতে চান। বৃষ্টির রাত, কয়েকজন অতিথি এসেছে আশ্রয়ের আশায়। এখানে সকলের জন্য অবারিত দ্বার। কিন্তু মোহান্ত মহারাজ তাদের আশ্রয় না দিয়েই তাড়িয়ে দেন। এখন থেকে এসব বাজে খরচা আর করা চলবে না।

কথাটা কেদারনাথের কানে যেতে তিনিও ক্ষুব্ধ হন। বেশ বুঝেছেন, দাদুর সব সৎ কাজকে এরা এবার বন্ধ করে নিজেদের অধিকারই কায়েম করতে চায়।

ধর্মের নামে এই ভণ্ডামি, স্বার্থপরতাকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। মন্দিরের ওই মোহান্ত বাবাজী এর মধ্যে এখানের কিছু লোকদেরও হাতে করেছেন।

কিন্তু কেদারনাথের মনে একদিন কাঠিন্য জাগে। এই অনাচার বন্ধ করবেন তিনি, তার জন্য যে কোন মূল্য দিতে হয় দেবেন।

এখানে তিনি নতুন, স্ত্রী সয়ামণিও বলে,—ওরা এখানের মানুষ, ওদের দলবল আছে, ওদের সঙ্গে সংঘাত করা কি ঠিক হবে? তুমি চলে গেলে মা আর আমাকে এখানে থাকতে হবে—যদি কোন ক্ষতি করেন?

কেদারনাথের মনে আজ একটা দৃঢ় বিশ্বাসই আসে। অন্যায়ের প্রতিবাদ করবেনই, তাই মোহান্ত মহারাজকে গিয়ে স্পষ্ট ভাষায় জানান কেদারনাথ—আমার দাদু এসবের মালিক, তিনিই আপনাদের রেখেছেন যাতে দেবসেবা অতিথিসেবা ঠিকমত চলে, অথচ অতিথিসেবা তুলে দিতে

চান। কালও ঝড়বৃষ্টির রাতে ক'জনকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। দাদুর ইচ্ছার বিরোধী এমন কাজ যদি করেন, তাঁর ওয়ারিশান হিসাবে আমিই আপনাদের এখান থেকে উৎখাত করে নিজের হাতে এবার মন্দিরের ভার নেব, সেইমত চালাবো।

এই তরুণের কণ্ঠে কি এক তেজ—এ যেন রাজবল্লভের মতই তেজস্বী ভাষায় কথা বলেন। এর মধ্যে গ্রামের বেশ কিছু প্রতিষ্ঠাবান মানুষও এসে গেছেন, কেদারের এই কথায় তাঁরাও সমর্থন করেন,—এ ঠিক কথা।

কেদার মোহান্তকে বলেন,—শেষবারের মত আপনাদের সাবধান করে দিচ্ছি, ধর্মের নামে, দেবতার নামে এসব ভণ্ডামি স্বার্থপরতা আমি সইব না। আমাকে ওই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করবেন না।

মোহান্তও বুঝেছেন এ বড় কঠিন ঠাঁই। এখানে বেশী বাড়াবাড়ি করতে গেলে তাঁকেই বিদায় নিতে হবে, তাই বলেন তিনি—আর এসব হবে না। আপনাকে কথা দিচ্ছি। অপরাধ হয়ে গেছে, অতিথিসেবার আর কোন ত্রুটি হবে না।

কেদারনাথ অনুভব করেন সত্যের জন্য, ধর্ম-ন্যায়ের জন্য প্রয়োজনে কঠিন হবার এই নতুন এক শক্তি তার মধ্যে কোথা থেকে প্রসারিত হয়েছে। নতুন জীবনপথে এগিয়ে যাবার জন্যই জীবনদেবতার নির্দেশ।

জগৎমোহিনী ছেলের এই কাজে খুবই খুশী হন,—তুই ঠিক করেছিস বাবা। অন্যায় অধর্মের বিরুদ্ধে চিরকাল তুই মাথা তুলে দাঁড়াবি, দেখবি ঈশ্বর তোকে এই শক্তি দেবেন।

জমিদারের মেয়ে তিনি, দেখেছেন জমিদারীর হালচাল। এখানেও দু'একজন সৎ কর্মচারী রয়েছে। সেই পরমেশ্বর মহান্তিও বেঁচে আছেন। আজ সেই বৃদ্ধও খুশী হন।

—মা আপনি এসেছেন, এতদিন পর আবার মাকে ফিরে পেয়েছি, আপনি থাকুন, এই বুড়ো সন্তান আপনার সেবায় তবু শেষ জীবনটা কাটিয়ে দেবে।

কেদারকে এবার নিজের কাজে যেতে হবে। দাদুর কথা মনে পড়ে, তাই এখানের ভার মায়ের হাতে দিয়ে স্ত্রীকে এখানে রেখে তাকে চলে যেতে হয় কেন্দ্রাপাড়ায় শিক্ষকতার কাজে।

বৃদ্ধ পরমেশ্বর মহান্তি বলে,—আপনি নিশ্চিন্তে যান দাদাবাবু, আমি রইলাম। মা-বৌমাদের কোন অসুবিধা হবে না এখানে।

॥ ১৭ ॥

কেদারনাথের আবার শুরু হল শিক্ষকতার জীবন। সেই ডঃ রোয়ারের পরামর্শমত পুরীতে এলেন তিনি টিচার্স ট্রেনিং কোর্স শেষ করতে।

এই প্রথম এলেন কেদারনাথ পুরীধামে। অবশ্য তিনি তীর্থযাত্রীর বেশে আসেন নি, এসেছেন ভাগ্য অন্বেষণে। পুরীতেই পড়াশোনা করতে হয় ট্রেনিং কলেজে, তবু অবকাশ পেলেই তিনি জগন্নাথদেবের মন্দিরে এসে উপস্থিত হন। এখানেই দেখেন সেই স্থান যেখান থেকে দাঁড়িয়ে শ্রীচৈতন্যদেব জগন্নাথদেবকে দর্শন করতেন।

উলা গ্রামের জগাদার কথা মনে পড়ে। তাঁর পূজিত দেবতা ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব, সংসার ত্যাগ করে প্রেমধর্ম প্রচারের জন্য তিনি এসেছিলেন পুরীধামে, জগন্নাথদেবের চরণপ্রান্তে নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তাঁর কাতর প্রার্থনা যেন আজও ধ্বনিত হয় এই মন্দির-চত্বরে।

জগন্নাথ স্বামী নয়নপথগামী

ভবতু মে—

আজও পুরীর রাজপথে ধ্বনিত হয় চৈতন্যদেবের সেই কীর্তনের সুর—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে—

রথযাত্রার দিনও তিনি কীর্তনে যোগ দিতেন রথের অগ্রভাগে। সেই গুণ্ডিচাবাড়ি-গম্ভীরা-সিদ্ধবকুল-টোটা গোপীনাথের মন্দির-সমুদ্রতীর সবই রয়েছে। কেদারনাথের মনে হয় এই কীর্তনানন্দে মগ্ন মহাপ্রভুর সুর যেন সে শুনেছে—আজও মিশিয়ে আছে এখানের আকাশে বাতাসে, শতসহস্র ভক্তজনের অন্তর-মনে। এ যেন এক বিচিত্র অনুভূতি।

কেদারনাথের তর্কশাস্ত্র পড়া যুক্তিবাদী মন, পাশ্চাত্ত্য দর্শনের লব্ধ জ্ঞান দিয়েও এই অনুভূতির স্পর্শসুখ এড়াতে পারেন না। চৈতন্যদেব—তাঁর ধর্মতত্ত্ব—এসব জানার অদম্য কৌতূহল জাগে তাঁর মনে।

রামমোহন রায়ের কিছু লেখা পড়েছেন কেদার। তাঁর মনে হয় রামমোহন রায় চৈতন্যদেবের ধর্মমতকে ঠিক সমর্থন করেন নি তাঁর পশ্চিমের শিক্ষায় শিক্ষিত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে।

কেদারনাথের মনে কৌতূহল জাগে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মমতকে জানতে—তাঁর দর্শনকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে।

কিন্তু তখন সময় তত নেই। কলেজের পড়ার চাপ রয়েছে। কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করতেই হবে তাঁকে। এ সংসারধর্ম পালনের অঙ্গ—এই ধর্মকেও বিসর্জন দিতে পারেন না, পারেন না তিনি সংসারের দায় এড়াতে।

সম্মানের সঙ্গে টিচার্স ট্রেনিং কোর্স শেষ করলেন। তখন পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরে চন্দনযাত্রা উৎসব চলছে। হাজারো ভক্ত এসেছে সারা ভারতের দূরদূরান্ত থেকে। এসেছে বাংলাদেশ থেকেও বহু বৈষ্ণব। কীর্তন চলেছে—সেই হরিনামের বন্যায় যেন ভেসে গেছে তারা। কারও চোখে জল—শ্রীকৃষ্ণের নামে যেন ভক্তির বন্যা বইছে, এ যেন মহাদেবতার চরণে এক নিঃশেষ ভক্তিবিনম্রচিত্তে আত্মসমর্পণের প্রতীক।

কেদারনাথের মনে পড়ে উলার সেই জগাদার কথা। নামকীর্তন করার সময় তাঁর চোখে নামত অশ্রুধারা। ভক্তিমার্গের এই আত্মসাধনার এক অপরূপ প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে কেদারনাথের সামনে।

তর্ক নেই—যুক্তির কচকচি নেই—পাণ্ডিত্যের গর্জন নেই—আছে নিঃশেষে আত্মনিবেদন। এ যেন অতি আপনার জনকে আপনতম করে পাওয়ার আকৃতি।

বৈষ্ণবধর্মের এই অন্তরতম হওয়ার এক নূতন দিক কেদারনাথের মনে কি আলোড়ন আনে। অনুরাগ নিয়ে কৃষ্ণভজনা করেই এরা যেন সেই পরমতমের সান্নিধ্য পেয়ে ধন্য হয়েছে। বৈষ্ণবতত্ত্বের এই ভক্তিমার্গের সঙ্গে এখানেই তাঁর পরিচয় ঘটে।

আগ্রহ বাড়ে বৈষ্ণবতত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য।

সেই আগ্রহ নিয়েই এবার ভ্রমণকারীর মত বের হয়ে পড়েন কেদারনাথ। উড়িষ্যার পথে-প্রান্তরে বহু শতাব্দী ধরে ধর্মচিন্তার ধারা প্রবাহিত। সেই ধর্মচেতনা ঘটেছিল বিভিন্ন যুগে—তাদের উপাস্য দেবতাও ভিন্ন ভিন্ন। কেউ ছিলেন সূর্যউপাসক, কোন রাজা ছিলেন শৈব, কেউ অন্য যুগের বৈষ্ণব। আর বৌদ্ধ অনুপ্রবেশও দেখা যায়। তাই ধর্মচেতনার প্রকাশ ঘটেছিল বিভিন্ন রূপে, বিভিন্ন মন্দিরে, বিশাল মন্দিরশৈলীতে, গুহাগাত্রের চিত্রাঙ্কনে।

তাই গড়ে উঠেছিল কোনারকের সমুদ্র এবং চন্দ্রভাগা নদীর সঙ্গমে বিশাল সূর্যমন্দির, ভুবনেশ্বরে গড়ে উঠেছিল সুবিশাল লিঙ্গরাজের মন্দির, উদয়গিরি খণ্ডগিরির গুহাগাত্রে গড়ে উঠেছিল বৌদ্ধযুগের চিত্রকলার পরিচয়। উড়িষ্যার দূর-দূরান্তরের বিভিন্ন মঠ, মন্দির ঘুরে ঘুরে

দেখেছিলেন কেদারনাথ কি অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে!

নবজাগরণের দিন তরুণ সমাজ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠল। কিন্তু বিকৃতিও এসেছিল তার সমাজজীবনে। সেটা একটা আংশিক দিক মাত্র। শিক্ষার প্রথম আলোর ঝলসানি কেটে যাবার পর সেই তরুণদের মাঝে অনেকেই যেন নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সংস্কৃতি ইতিহাস ধর্মকে নতুন করে আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠেছিল।

অবশ্য এর সূচনা হয়েছিল রামমোহনের যুগ থেকেই। বিদ্যাসাগর মশায় সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের মণিমঞ্জুষা থেকে উদ্ধার করেছিলেন অনেক সম্পদ। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে কেদারনাথের মনেও সেই অনুসন্ধিৎসু মন জেগে উঠেছিল।

কলম্বাসও এমনি আবিষ্কারের নেশাতেই পাড়ি দিয়েছিলেন উত্তাল সমুদ্র বয়ে অজানাপথে। একালের মানুষ কেদারনাথও তেমনি এই মন নিয়েই বের হয়েছিলেন উড়িষ্যার পথে-প্রান্তরে অতীতকে জানতে—কিছু হারানো ইতিহাসকে পুনরুদ্ধার করতে।

তাঁর মনে হয়েছিল এসব তথ্যের বহুল প্রচারের প্রয়োজন। দেশের মধ্যেই নয়—বিদেশীদের কাছেও ভারতের এইসব সম্পদের কথা জানানোর দরকার। তাই ইংরাজীতেই এইসব তথ্য নিয়ে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনার কথাও ভাবতে থাকেন।

এই ভ্রমণপর্ব শেষ করে তিনি ফিরে এলেন ছোট গোবিন্দপুরে, মা-স্ত্রী সেখানে রয়েছে। তারাও খুশী হয় কেদারকে দেখে।

ছোট গোবিন্দপুরের বিষয়আশয় থেকে যা আয় হয় তাতেই চলছে। এমনি দিনে খবর আসে কেদারনাথকে স্কুল বোর্ড থেকে কটক শহরের এক স্কুলে শিক্ষকতার কাজে নিয়োগ করা হয়েছে। মাসিক মাইনে কুড়ি টাকা।

তখন কটকে বেশ সস্তাই ছিল সবকিছু। এতে এদের দিন চলে যাবে। মায়ের শরীরও ভালো যাচ্ছে না। জগৎমোহিনীর মাঝে মাঝে মূর্ছাও হয়। চিকিৎসাপত্র করানো দরকার। তাই কেদারনাথ মা-স্ত্রীকে নিয়ে এবার কটক শহরে এসে একটা বাসা ভাড়া করে সংসার পাতলেন। শুরু হল এখানকার স্কুলে শিক্ষকতার কাজ।

কটক তখন উড়িষ্যার বিদ্যাচর্চা, সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র। এখানে বেশ একটি সমাজও গড়ে উঠেছে। কলকাতার সমাজ থেকে বাইরে এসে কেদারনাথও নিজেকে আরও চিনতে চেষ্টা করেন। কলকাতার হিন্দুসমাজ-ব্রাহ্মসমাজ-মিশনারীদের পরিবেশে, শিক্ষার হাটে বসে নিজের বিদ্যার পুঁজির পরিমাপ করতে পারেন নি।

প্রতি সম্প্রদায়ই চেয়েছে কেদারনাথ তাদের প্রবক্তা হয়ে উঠুক। তাই তার মতামতকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছে হয়তো অকারণেই।

এখানে এসে কেদারনাথ নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিজের একটা মতই গড়ে তুলেছেন। চৈতন্যদেবের ভক্তিমার্গের কথা এবার তার চিত্তকে প্রভাবিত করেছে। পুরীর বহু প্রতিষ্ঠানে বেশকিছু ধর্মগ্রন্থও পড়েছেন। ভগবৎ-চিন্তা ভাগবৎ-কথা তাঁর মনে কি প্রসন্নতা আনে!

ধীরে ধীরে বহুধা মতাদর্শের মধ্য থেকে কেদারনাথের মন একটি নিজস্ব পথের সন্ধান করে চলেছে।

কটক শহরে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের প্রাধান্যই বেশী। কেদার তাদের আয়োজিত সভায় হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করেন। সনাতন হিন্দুধর্মের ধারা কালের প্রভাবে বহু পরবর্তী মানুষের অপব্যাখ্যায় যে রূপান্তরিত হয়েছে সেই প্রসঙ্গে কিছু তথ্যপূর্ণ আলোচনা করেন।

বাগ্মিতায় কেদারনাথ পারদর্শী। নিজের পড়াশোনাও আছে। আছে নিজস্ব ধারার চিন্তন-

মনন, এছাড়া সুবক্তাও। এই বক্তৃতা দেবার শিক্ষা পেয়েছিলেন তাঁর কলেজের অধ্যক্ষ ভূতপূর্ব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের প্রতিনিধি মিঃ রিচার্ডসনের কাছে। ইংরাজীতে অনর্গল বলতে পারতেন। জ্ঞানের ভাঁড়ারও কম ছিল না। তাঁর ভাষণে থাকত আত্মবিশ্বাসের কাঠিন্য, তাই তাঁর যুক্তিও থাকতো জোরালো আর তথ্যপূর্ণ।

কেদারনাথ কটকে এর মধ্যে আলোচিত একটি নাম। এই সময় কটকের সহকারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আর শিক্ষাবিভাগের প্রধান ছিলেন মিঃ হ্যালি। মিঃ হ্যালি নিজেও ছিলেন সুপণ্ডিত। নানা বিষয়ে তার পড়াশোনা ছিল। পাশ্চাত্ত্য দর্শন ছাড়াও ভারতীয় ধর্ম-দর্শন নিয়েও পড়াশোনা করতেন।

কেদারনাথের বাগ্মিতা—তাঁর তথ্য এবং তত্ত্ববহুল ভাষণ মিঃ হ্যালিকে মুগ্ধ করে। মিঃ হ্যালি নিজে কেদারনাথের সঙ্গে একটা সভায় আলাপ করেন। মিঃ হ্যালির কথাবার্তা ব্যবহার, ভারতকে জানার আগ্রহ কেদারনাথেরও ভালো লাগে। ক্রমশ কেদারনাথ মিঃ হ্যালির বাংলোতেও আসেন।

তাঁর কাছেই কেদারনাথ পান এডিশনের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Europe'। দুজনে বই নিয়েও অনেক আলোচনা করেন, আর কটক স্কুল লাইব্রেরী থেকেও সংগৃহীত ধর্ম-দর্শন ইত্যাদির বইও পড়তেন, দুজনে একত্রে এইসব গভীর আলোচনা হতো। মিঃ হ্যালি ক্রমশ কেদারনাথের গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন।

কেদারনাথ তখন কটক স্কুলের কুড়ি টাকার শিক্ষক। স্ত্রী-মাকে নিয়ে সংসার চালান কোনমতে। ওই টাকায় কোনমতে দিন চলে মাত্র, কোন বিলাসিতা চলে না। অবশ্য কেদারনাথ জীবনে ভোগবিলাস বস্তুটিকে অর্থহীন বলেই মনে করেন। দেখেছেন বাল্যকালে রাজার সম্পদ, ভোগবিলাস, হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া, জুড়িগাড়ি, কি ছিল না? কিন্তু সবই হারিয়ে গেছে।

শঙ্করাচার্যের শ্রীচৈতন্যদেবকে অগ্রাহ্য করাটা মানতে পারেন নি কেদারনাথ। তাঁর মতাদর্শের স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজছেন, কিন্তু শঙ্করাচার্যের এই কথাটা যে বাস্তব সত্য তা মানেন

—মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্বং
কালঃ নিমেষাৎ হরতি সর্বং।

কালের যাত্রাপথে এই ধন জন যৌবনের কোন গর্বই নেই। তা অর্থহীন। তাই জীবনে বৈভবপ্রাচুর্য বিলাসকে এড়িয়ে চলেন, এই শিক্ষা জীবনই তাঁকে দিয়েছে। তাই এই অল্প টাকাতেই তিনি কোনমতে সামান্য শিক্ষকতা নিয়েই রয়েছেন।

মিঃ হ্যালি সেদিন স্কুলে এসেছেন স্কুল পরিদর্শন করতে। দেখেন তিনি কেদারনাথকে। তাঁকে অধস্তন শিক্ষক হিসেবে দেখে তিনি অবাকই হন। অথচ তাঁর পাণ্ডিত্য-যোগ্যতার পরিচয় জানেন মিঃ হ্যালি।

আরও অবাক হন তিনি কেদারনাথের ব্যক্তিত্বে। বহু তথাকথিত শিক্ষক তাঁর কাছে আসেন তাঁদের পদোন্নতি, ভালো স্কুলে বদলির আবেদন নিয়ে, কিন্তু কেদারনাথ এতদিন ধরে তাঁর বাংলোয় আসেন, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁদের আলাপ আলোচনা হয় সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন নিয়ে কিন্তু কোনদিন কেদারনাথ তাঁর নিজের জন্য কোন অনুরোধই করেন নি। এই অবস্থায় পড়ে থাকার জন্য কোন অতৃপ্তিও নজরে আসে নি মিঃ হ্যালির। এই আত্মসম্মানবোধ হ্যালিকে মুগ্ধ করে। তাই নিজেই কেদারনাথের এই যোগ্যতার মূল্য দেবার কথা ভাবতে থাকেন।

এরপরই সুযোগও এসে গেল। ভদ্রক উড়িষ্যার প্রাচীন শহর। সেখানের ভদ্রা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় মিঃ হ্যালি কেদারনাথকে সেই পদেই বহাল করলেন।

তাঁকে এবার কটক ছেড়ে ভদ্রকেই যেতে হবে। অবশ্য সেখানে তাঁর পদমর্যাদাও বাড়লো আর মাইনেও হল তখনকার দিনে পঁয়তাল্লিশ টাকা।

মিঃ হ্যালি বলেন—বাবু, ভদ্রকেই যাবে তুমি। এখানে আপাতত তেমন কোন পদ খালি নেই। সেখানেও শিক্ষার বিস্তারে তুমি কিছু কাজ করো তাই চাই।

কেদারনাথের জীবন যেন এমনি এক গতিময়তার ছন্দেই বাঁধা পড়লো। এক ঠাঁই থেকে অন্য ঠাঁই। বহু স্থান—বহু মানুষ—বহু অভিজ্ঞতায় ভরা তার জীবন। কুড়ি টাকা থেকে মাসমাইনে বেড়ে হল পঁয়তাল্লিশ টাকা।

ভদ্রক ছোট্ট শহর হলেও মনোরম শান্তিপূর্ণ এর পরিবেশ। ভালো লেগে গেল কেদারনাথের। এই গ্রামের শান্ত পরিবেশে নিজের একটা ছোট বাড়ি তৈরী করিয়ে কেদারনাথ মা-স্ত্রীকে নিয়ে এলেন ভদ্রকে।

স্কুলের কাজ চলছে। মায়ের শরীর ভেঙে পড়ে। জগৎমোহিনীর দেহমনের উপর দিয়ে অনেক ঝড় বয়ে গেছে। দেখেছেন তিনি বহু সর্বনাশ, বহু মৃত্যু আর পালাবদল। অনেক অভাব দুঃখকষ্টের সঙ্গে সংগ্রাম করে এবার ক্লান্ত পরিশ্রান্ত।

ক্রমশ দিন বদলাচ্ছে। কেদারনাথের অভাবের দিন বদলাচ্ছে, কিন্তু মায়ের শরীরও ভেঙে পড়ছে। মাঝে মাঝে মূর্ছা যান, চিকিৎসাতেও কোন ফল হয় না।

কেদারনাথ দেখেন পাশের মন্দিরে এক ব্রাহ্মণ রামায়ণ পাঠ করেন। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রাম-কথা বলেন যেন বেদপাঠের পবিত্রতা নিয়ে।

তিনিই শোনেন মায়ের অসুখের কথা। চিন্তিত কেদারনাথকে বলেন তিনি—আপনি ভাববেন না, মা সুস্থ হয়ে উঠবেন। আমি ওষুধ দিচ্ছি, শ্রীরামচন্দ্রের দয়ায় মা ভালো হবেন।

শঙ্খচূর্ণ চন্দন আরও কি সব ওষুধ মিশিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরী করে ব্যবহার করতে দেন। কেদারনাথও ভক্তিভরে তা নিয়ে গিয়ে মাকে দেন।

কয়েক সপ্তাহ সেই ওষুধ ব্যবহার করা হোল, ভক্তিভরে রামনামও করেন জগৎমোহিনী। দেখা যায় ওই ওষুধ যেন মন্ত্রের মতই কাজ করে। মা সম্পূর্ণ সেরে ওঠেন।

এ ওষুধের গুণ, না শ্রীরামচন্দ্রের নামমহিমা তা বুঝতে পারেন না কেদারনাথ। এ যেন তাঁর কাছে এক বিস্ময় বলেই বোধ হয়।

প্রকৃত ভক্তি যে অনেক সময় অসাধ্যসাধন করতে পারে তাই মনে হয়। সেই ব্রাহ্মণকে বেশ কিছু টাকা দিতে চান, কিন্তু নির্লোভ ব্রাহ্মণ সামান্যমাত্র গ্রহণ করেন, বেশীতে তাঁর প্রয়োজনও নেই। বলেন—সেই পরমেশ্বরকেই ভক্তিভরে ডাকুন, তিনিই সব কিছুর মূল, দুঃখ-সুখ সব তাঁরই বিধান।

এই সময় ভদ্রকে কাজের অবকাশে কেদারনাথ এবার লিখতে থাকেন উড়িষ্যার মন্দির-মঠ, তাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি নিয়ে একটি গ্রন্থ। এ তাঁর অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধারই নিদর্শন। এই বিষয়, এই ইতিহাস বৃহত্তর পৃথিবীকে জানাবার জন্যই তিনি ইংরাজীতে লিখতে শুরু করেন। এতে বহু তত্ত্ব এবং ইতিহাসের কথাও লেখেন। প্রকাশিত হল তাঁর 'Maths of Orissa'।

বইটি প্রকাশিত হবার পর খুবই সমাদর লাভ করে। বিশেষ করে প্রখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক স্যার উইলিয়াম হান্টার তাঁর 'Orissa' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখার সময় বার বার কেদারনাথের এই গ্রন্থটির কথা উল্লেখ করেন। তিনি এই গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য গ্রন্থ বলেই গণ্য করে এর থেকে বেশ কিছু তথ্যও গ্রহণ করেন।

তিনি স্বীকার করেন—In 1860 a Pamphlet was putforth by native gentleman (Kedarnath Dutt) who had visited all the larger monasteries of Orissa and who was himself a landholder in that province. With regard to a little monastery in his own estate, the author adopted an even more procedure.

কেদারনাথ এই গ্রন্থের জন্য ভারতেই নয়, বহির্ভারতেও স্বীকৃতি লাভ করেন।

ভদ্রকেই তাঁর প্রথম সন্তান অন্নদার জন্ম হয়। মাও সেরে উঠেছেন। নাতির মুখ দেখে তিনিও খুশী হন। সয়ামণি স্বামী সন্তান শাশুড়িকে নিয়ে ঘর বেঁধেছে। কেদারনাথ লেখাপড়ার কাজেই ব্যস্ত। ভদ্রকের শান্ত পরিবেশ তাঁর কাজের পক্ষে সুবিধাজনকই বোধ হয়।

কিন্তু এবার বদলির হুকুম আসে। ভদ্রক থেকে আসতে হবে মেদিনীপুর স্কুলে। সরকারী চাকরির এই নিয়ম। এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে যেতে হবে। পশরা নিয়ে যেতে হবে এক হাট থেকে অন্য হাটে।

তবু কলকাতা মহানগরীর কাছে—যোগাযোগটা থাকবে মহানগরীর সঙ্গে। কেদারনাথ এলেন মেদিনীপুরে।

কংসাবতী নদীর তীরে সবুজ শালবন ঘেরা ছায়াচ্ছন্ন সুন্দর একটি জলপদ। স্বাস্থ্যকর স্থান। কেদারনাথ এখানে এসে তবু একটু বিভ্রান্তির মধ্যেই পড়লেন। ভদ্রকের পরিবেশ ছিল শান্ত ভক্তিরসাপ্লুত, মধুর।

এই মেদিনীপুরে তখন নব্যসমাজের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের বেশ বড় আখড়া গড়ে উঠেছে। আর রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের বেশকিছু সভাসমিতিও আছে। তাদের বাদানুবাদে এখানের আধ্যাত্মিক পরিবেশ বেশ উত্তপ্তই।

ব্রাহ্মসমাজের লোকরা এখানে রামমোহন রায়ের মতাদর্শকেই প্রচার করে পরম সত্য এবং সার্থক বলে। কেদারনাথ এই মতবাদকে জানেন—তাঁর মেসোমশাই কাশীবাবুর কাছে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও শুনেছেন এসব কথা। কেদারনাথের মনে এখন নিজস্ব একটা চিন্তাধারা. মতাদর্শের বিশ্বাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর মনে তাঁর অজান্তেই তা রোপিত হয়েছিল। দেখেছিলেন জগাদাকে হরিকীর্তনের সময়, দু'চোখে তাঁর অশ্রু নামত। নিজেও শিশু কেদার সেই ভক্তির বন্যায় যেন প্রবাহিত হতেন, এই নামগান তাঁর মনেও আনতো কি তৃপ্তি। শ্রীচৈতন্যদেবের নাম তাঁকে শান্তি দিত।

আবার দেখেছেন পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তদের অকৃত্রিম ভক্তির প্রবাহ। নিঃসঙ্কোচ আত্মসমর্পণ তাঁর পাদপদ্মে মানুষকে কি অমর শান্তির স্পর্শ এনে দিতে পারে! যা এতদিনের অর্জিত পাণ্ডিত্যের মাঝেও তার কণামাত্র তিনি পান নি। তাই মন ক্রমশ সেই ভক্তিমার্গের দিকেই চলেছে।

রামমোহন রায়ের মতামতকে তিনি মেনে নিতে পারেন নি। রামমোহন রায় পাশ্চাত্ত্য দর্শন পড়েছেন। এরিস্টটল, হিউম লক্, আর পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের লেখা পড়ে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের বেদ-পুরাণকেও আমল দিতে চান না, বলেন—এসব অর্থহীন সংস্কারের বাঁধনে বদ্ধ। তিনি সতীদাহপ্রথা জাতিভেদের কথা তুলে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারের কথাই বলেন—জাতিভেদ বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধেও তাঁর জেহাদ।

এমনকি শ্রীচৈতন্যদেবকেও তিনি অগ্রাহ্য করেন। চৈতন্যদেব যে জাতিভেদ ভুলে বৈষ্ণবসমাজ গড়তে চেয়েছিলেন, উদার মতের পথিক ছিলেন সেকথাও স্বীকার করেন না রাজা

রামমোহন। আর ভাগবৎ যার সার নিয়েই চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা সেই শ্রীমৎ ভাগবৎকেও রামমোহন যথার্থ স্বীকৃতি দেন নি।

ফলে হিন্দুরা তো বটেই, তৎকালীন গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ যা কোনমতে ক্ষীণতম অস্তিত্ব নিয়ে টিকে ছিল, তারাও রামমোহনকে মানতে পারল না।

তাই মেদিনীপুরে অনেক ধর্মসভায় এই ব্রাহ্ম আর রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের মধ্যে সংঘাত লেগেই থাকতো—আলোচনা থেকে উত্তেজনাও বাড়তো।

কলকাতা বিশাল শহর। বহু মানুষের বাস বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। নানা ধরনের সমস্যা সেখানে। তাই আলোচনা সভার উত্তেজনাটা সীমিত পরিসরেই থাকে। সমাজের বৃহত্তর অংশে তেমন প্রভাব পড়ে না। কিন্তু মেদিনীপুর অনেক ছোট শহর। সেখানে এসব উত্তেজনা আলোচনার প্রভাব সমাজের উপর বেশীই পড়ে। তাই কেদারনাথ মেদিনীপুরের সমাজজীবনের মূলস্রোতে ক্রমশ যত মিশিয়ে পড়েন—এই সংঘাত, রামমোহনের বৈষ্ণবধর্মের ওপর অহেতুক আক্রমণটাও তত স্পষ্টতর হয়ে ওঠে।

নানা কারণে বৈষ্ণবধর্ম শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মমত সেদিন সমাজের হিন্দুসমাজ আর ব্রাহ্মধর্মের চাপে পড়ে অবলুপ্ত হয়ে গেছল। উচ্চকোটির সমাজে বাস্তবে সেদিন কোন ঠাঁই-ই ছিল না এর। প্রভুত্ব ছিল এই রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ আর ব্রাহ্মদেরই।

স্কুলের সংস্কৃতের শিক্ষক জনার্দন পঞ্চতীর্থমশায় সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ। শিখাকণ্ঠি ধারণ করতেন। বৈষ্ণব বংশের সন্তান। তাঁদের বংশে বৈষ্ণবধর্মের ধারাই প্রবর্তিত। এর জন্য তাঁকে উভয়দলই বেশ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। শিখা কর্তনের শাসানিও শুনতে হতো নিরীহ পণ্ডিতটিকে।

কেদারনাথ ক্রমশ জনার্দন পঞ্চতীর্থের সান্নিধ্যে আসেন। তাঁর কাছেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্মমত জাতিভেদ অগ্রাহ্য করার কথাও শোনেন। তিনিই জানান বৈষ্ণবতত্ত্বের মূল, শ্রীমৎ ভাগবৎ তার থেকেই মূল উপাদান নিয়ে শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্ম-দর্শন-জীবনী মহাগ্রন্থ রচিত হয়েছে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

কেদারনাথ বহু আগ্রহ নিয়ে বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থাদি, চৈতন্যচরিতামৃতের সন্ধান করতে থাকেন। শ্রীমৎ ভাগবৎ-এর সন্ধান করেন। কলকাতাতেও সন্ধান করেন, কিন্তু মেলে না। দেখা যায় ১৮৩০ সাল অবধি বাংলার পুস্তকপ্রকাশকরা কিছু ধর্মগ্রন্থ বৈষ্ণবসাহিত্য প্রকাশ করেছিলেন, তখন প্রকাশিত হয়েছিল নরোত্তম বিলাস, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, হরিভক্তিবিলাস, শ্রীমৎভাগবৎ প্রভৃতি। তারপর সমাজের উচ্চকোটির মানুষ পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আর রাজা রামমোহনের বৈষ্ণবধর্ম প্রসঙ্গে এইসব মন্তব্যে বৈষ্ণবধর্মকে ভুলতে বসলেন, রক্ষণশীল সনাতন হিন্দুধর্ম, শৈব, শাক্তরাও বৈষ্ণবধর্ম তার জাতিভেদরহিত নীতিকে মেনে নিতে পারে নি। ফলে বৈষ্ণবধর্ম সমাজের বুক থেকে প্রায় মুছে গেল।

সেই শূন্যস্থান দখল করলো ব্রাহ্ম, শাক্ত, শৈবরা, আর মিশনারীরাও খৃষ্টধর্মের প্রচার শুরু করলেন।

তাই বৈষ্ণবগ্রন্থাদির প্রকাশ-প্রচারও পরবর্তীকালে বন্ধ হয়ে গেল। প্রকাশকরা তখন 'বড়তলা' অঞ্চলেই ব্যবসার পত্তন করেছেন। বই-এর বাজার বলতে ওই 'বড়তলা'। সেখানের প্রকাশকরা ওসব গ্রন্থ আর ছাপেন না, ছাপেন 'সহজিয়া' মতের কিছু বই—যা সহজ প্রেম আর আদিরসের সম্ভার নিয়ে গ্রামগঞ্জে চলে। কে শ্রীকৃষ্ণধারার প্রেমকাহিনী পড়ে? কৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে কোন আলোচনাও হয় না। তাদের নিয়ে আদিরসের লীলাব্যবসা চলেছে।

ফলে কেদারনাথ এইসব বইও পান না। বারবার ব্যাকুলতা জাগে মনে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়ার জন্য। শ্রীমৎভাগবৎ যদি পেতেন। ভক্তিমার্গের পথিক যেন রত্নখনির ব্যর্থ সন্ধানে মত্ত—মেলে না কিছুই।

কেদার দেখেছেন গ্রামাঞ্চলে এইসব সহজিয়া ধরনের বই বৈষ্ণবধর্মের বিকৃতিই আনে। গ্রামের সাধারণ মানুষ বৈষ্ণব ধর্মের বিকৃত তথ্য এবং ব্যাখ্যা শুনে বৈষ্ণবধর্মকে আর সেই মর্যাদাও দেয় না। কারণ প্রকৃত বৈষ্ণবগ্রন্থাদির কোন প্রচলনই নেই—তা বিস্মৃত এবং প্রায় অবলুপ্তই হয়ে গেছে।

কেদারনাথের অনুসন্ধিৎসু মন সেই অবলুপ্ত গ্রন্থাদি পুনরুদ্ধারের কথাই ভাবে। জনার্দন পণ্ডিতও বলেন—প্রকৃত ধর্মপুস্তকাদি থাকলে বৈষ্ণবধর্ম আবার স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। শতসহস্র মানুষ প্রকৃত মর্ম জেনে উদ্ধারের পথনির্দেশ পাবে।

কিন্তু কে দেবে সেই সন্ধান? কে আনবে ভগীরথের মত গঙ্গার পুণ্যধারাকে—যাতে ষাট হাজার সগরসন্তান উদ্ধার হয়েছিল? কেদারনাথের মনে কথাটা বদ্ধমূল হয়—কে হবেন এ কালের সেই ভগীরথ, যিনি বৈষ্ণবধর্মের প্রকৃত অমৃতধারাকে আবার জগৎসমাজে নবধারায় প্রবাহিত করবেন, যার স্পর্শে মানুষ শোকতাপমোহ ভুলে উদ্ধার পাবে মহাশান্তির জগতে?

কেদারনাথ মেদিনীপুরে সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমশ সেখানে বেশ কিছুসংখ্যক সভ্যও এসে যান। তাঁরা কেদারনাথের পাণ্ডিত্যে-বাগ্মিতায় শ্রদ্ধাবান। কেদারনাথ সে-সব সভায় রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত সেই হিন্দুধর্ম-বেদ-উপনিষদকে নস্যাৎ করার কঠিন জবাব দিতে থাকেন, বৈষ্ণবধর্ম শ্রীমৎভাগবৎ ইত্যাদি অগ্রাহ্য করার বিপক্ষেও কঠিন যুক্তিজাল খাড়া করে ভাষণ দিতে থাকেন।

তাঁর বাগ্মিতায় মুগ্ধ হয়ে অনেক শ্রোতাই সমবেত হন আর তাঁর যুক্তিপূর্ণ সারগর্ভ আলোচনা শহরের বহুস্থানে বহুজনের মনে আলোড়ন তোলে।

এখানের ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিতরা এবার প্রমাদ গণেন। তাঁরা মাত্র ক'খানা পুস্তক পড়ে আর আচার্যদের মুখনিঃসৃত বাণী শুনে জোরালো ভাষণ দিয়ে হিন্দুধর্ম বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মুণ্ডুপাত করে নিজেদের প্রাধান্য জাহির করেছেন, এখন তাঁদের পুঁজিতেও টান পড়েছে। কেদারনাথের বাগ্মিতা, তাঁর তথ্যবহুল যুক্তিসম্পন্ন মতবাদকে খণ্ডন করার মত পাণ্ডিত্য তাঁদের নেই।

তর্কের শেষ পথ গায়ের জোর। তাই ওই দলের পাণ্ডারা এবার কেদারনাথকে ধরেন। —আপনি এসব অশাস্ত্রীয় ভাষণ দেবেন না।

কেদারনাথ বলেন—শাস্ত্র তো আপনারাই নস্যাৎ করেছেন, মানেন না। অশাস্ত্রীয় ভাষণ দেন আপনারাই। আমার সব কথাই শাস্ত্রসম্মত। তা যে নয় প্রমাণ করুন আপনারাই। সত্য হলে আমিও তা মেনে নেব।

কিন্তু ব্রাহ্মদল ওপথে যান না। তাঁরা জানান—এসব কাজ করলে আপনাকে বিপদে পড়তে হবে বলে যাচ্ছি।

তাঁরা শাসিয়েই যান। কিন্তু কেদারনাথ যেন তাঁর অন্তরে কি এক শক্তিকে অনুভব করেন—যা তাঁকে সব অন্যায়কে প্রতিরোধ করার সাহস দেয়।

বন্ধুরাও সব শুনেছেন। তাঁরাও বলেন—ওরা সব করতে পারে, সাবধানে থাকবেন। কেদারনাথ তাঁর ভাষণ, আলোচনা তবুও বন্ধ করেন না। ওপক্ষও রাগে ফুঁসতে থাকে, আঘাতই হানবে। কিন্তু ঈশ্বর কেদারনাথের সহায়। তাঁর বন্ধুরাও কেদারনাথকে সব সময়েই ঘিরে থাকেন। ফলে ওপথে তারা তেমন আঘাত হানার সুযোগও পায় না।

অবিচলিত কেদারনাথ নিজের পথেই চলেন।

কেদারনাথ মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন। মিশনারী মিঃ ডাল সাহেবের কাছে খৃষ্টের আলোচনা শোনেন। মানবিকতার পূজারী প্রেমের দেবতা যীশুকেও তাঁর ভালো লাগে। দ্বিজেন ঠাকুরের কাছে যান তাঁর সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম নিয়ে কথা হয়। কিন্তু সেই মতকে কেদারনাথ যেন অন্তর থেকে মেনে নিতে পারেন না। জ্ঞান নয়, ভক্তিই তাঁর কাছে যেন মুক্তির প্রধান পথ বলেই প্রতিভাত হতে থাকে।

সংসারবদ্ধ জীব তিনি। নিজের কাজ ছাড়া সংসারের পথেও বহু চড়াই-উৎরাই-এর মোকাবিলা করতে হয়েছে তাঁকে। কঠিন মৃত্যু, অভাব সবই দেখেছেন বার বার। জীবনদেবতা তাঁকে নিয়ে যেন এক খেলাই খেলে চলেছেন—বার বার তাঁকে পরীক্ষা করেছেন!

স্ত্রী সয়ামণি এই সময় অসুস্থ হয়ে পড়েন। কেদারনাথের সংসারে বৃদ্ধা মা, স্ত্রী আর কয়েকমাসের শিশুপুত্র অন্নদা। এর মধ্যে স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লে সংসার যেন অচল হয়ে ওঠে।

কেদারনাথ তাঁর সব কাজের মধ্যেই অসুস্থ স্ত্রীর সেবাচিকিৎসার ব্যবস্থাদিও করেন। কেদারনাথও সকলের প্রতিই তাঁর কর্তব্য করে চলেছেন অক্লান্তভাবে।

কিন্তু সয়ামণিকে বাঁচানো গেল না। এতদিনের সুখদুঃখের সাথী স্ত্রীও তাঁকে ছেড়ে চলে গেল, রেখে গেলে দশমাসের শিশুপুত্রকে। জগৎমোহিনীরও বয়স হয়েছে। বৌমার মৃত্যুর পর এই কচি বাচ্চাকে দেখভাল করা, সংসারের কাজ করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর হয়ে ওঠে।

কেদারনাথ নিজেও সংসারের কাজে হাত লাগান। সংসার যেন শূন্য বোধ হয়। জীবনের পথে চলতে গিয়ে তিনি দেখেছেন পদে পদে সব হারানোর দিনগুলোকেই—বার বার শুনেছেন সংসারে মৃত্যুর পদধ্বনি, দেখেছেন দুঃখের অমানিশা।

তবু নির্ভীক সাহসী সৈনিকের মত সংসারেও তিনি প্রাণপণ সংগ্রাম করেছেন। কোনদিন হতাশার অন্ধকারে হারিয়ে যান নি, বরং মনে হয়েছে অন্ধকার রাত্রির পরই আসে আলোকোজ্জ্বল দিনের সম্ভাবনা।

এই কঠিন সংগ্রাম-তমসার মাঝেও তাঁর পড়াশোনা চিন্তন-মননের কাজ চলতে থাকে। তাঁর মনে হয় এ যেন জীবনদেবতারই নিষ্ঠুর পরীক্ষা চলেছে তাকে নিয়ে। সোনাকে নিখাদ করতে গেলে তাঁকে পোড়াতে হয়, তেমনি তাঁকেও অগ্নিশুদ্ধ করার জন্যই যেন ঈশ্বর এইভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন।

এই সময় তাঁর মনে সেই বিশ্বাসই গভীরতর হয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, আর কিছু দিব্য অনুভূতির স্পর্শ পান তিনি যা তাঁর চিত্তকে এক আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত করতে সাহায্য করে। সে এক বিচিত্র দর্শন—বহু বিচিত্র সেই অনুভূতি যা তাঁর শূন্য জীবনপাত্রকে কি সম্পদে পূর্ণ করেছিল।

প্রত্যহের সেই দিনযাপন, সংসারের দায়দায়িত্ব নিয়ে জগৎমোহিনী ক্লান্ত। কেদারনাথ মাকে এই বয়সে একটু বিশ্রাম দেবার কথাও ভাবছেন।

ছোট্ট ছেলেকে নিয়ে জগৎমোহিনী বিপদে পড়েছেন। নিজেরও শরীর ভালো নয়, জ্বরে প্রায় বেহুঁশ অবস্থা।

কেদারনাথ স্কুল থেকে ফিরে দেখেন মায়ের এই অবস্থা, ওষুধ-পথ্য করার লোকও নেই, ছেলেটাও খিদেয় কান্নাকাটি করছে।

কেদারনাথ এতদিন কথাটার কোন গুরুত্বই দেননি। সংসার করার বাসনাও তার ছিল না।

কিন্তু একবার সংসার করে তার দায়দায়িত্ব এড়াতে তিনি চান না, তাঁর বিবেক কর্তব্যবোধ তাঁকে এবার নির্দেশ দেয়—তার মা ও এই মাতৃহারা সন্তানের জন্য সংসারের দায় তাঁকে মেনে নিতে হবে।

মা'ও বলেছিলেন—কেদার, বাবা, আবার বিয়ে-থা কর। সংসারটা না হলে ভেসে যাবে। কি হবে এই দুধের বাচ্চার?

কেদার এবার ওদের জন্যই দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে সম্মত হন।

অবশ্য আত্মীয়বর্গ অনেকেই এতে ঠিক সায় দিতে পারে না। তারা বলে—ছেলেটার সৎমা এলে ও পর হয়ে যাবে।

কিন্তু কেদারনাথ জানেন, একজন কেউ না থাকলে ছেলেটাকে বাঁচানো যাবে না। বৃদ্ধা মায়ের সেবাযত্নও হবে না। তাই যোগ্য পাত্রীর সন্ধান করতে থাকেন—যার হাতে সংসারের ভার দিয়ে তিনি তাঁর কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবেন।

খোঁজখবরও চলতে থাকে। শেষ অবধি বিয়ের স্থির হলো যকপুরের জ্ঞানময় রায়ের মেয়ের সঙ্গে। ভালো বংশ, মেয়েটিও শান্ত লক্ষ্মীশ্রীমণ্ডিতা। জ্ঞানময় রায়রাও বনেদী পরিবার, বৈষ্ণবধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান, বাড়িতে নিত্যসেবাপূজা হয়।

কেদারনাথের ঘরে এলেন ভগবতী দেবী। তিনি এসে এই ছন্নছাড়া সংসারের ভার নিলেন, অসীম স্নেহে বুকে টেনে নিলেন শিশু অন্নদাকে। অন্নদাও যেন তার হারানো মাকে ফিরে পেয়েছে।

জগৎমোহিনী দেবীও খুশী হন। ঠাকুর কেদারনাথকে যোগ্য স্ত্রীই দিয়েছেন। পরম ভক্তিমতী সেবাপরায়ণী ভগবতী দেবী এই সংসারের সব দায়দায়িত্ব তুলে নেন, কেদারনাথও নিশ্চিন্ত হন। মনে মনে জীবনদেবতাকে অজস্র প্রণাম জানান—তাঁকে এক মহাবিপদ থেকে দেবতাই উদ্ধার করেছেন।

॥ ১৮ ॥

মেদিনীপুরের পরিবেশ কিন্তু কেদারনাথের কাছে ঠিক মনঃপূত হয়ে উঠল না। সেখানে সেই সংঘাত আর ধর্মের কচকচি-দলাদলিতে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ছিলেন।

এবার সুযোগ আসতেই তিনি মেদিনীপুর থেকে শিক্ষকতার কাজ ছেড়ে বর্ধমানের কাছে ভাতছালায় তহশীলদারের পদ পেয়ে সেখানে চলে এলেন। শান্ত নিভৃত পল্লীর পরিবেশে এসে তিনি মুক্তির স্বাদ পান।

বেশ ক'বছর আগে কবিতার বইগুলি লিখেছিলেন, সেগুলি এবার প্রকাশিত হলো। বিজনগ্রাম, সন্ন্যাসী দুটি কাব্যগ্রন্থই প্রকাশিত হতে প্রভূত সমাদর লাভ করলো। দুটিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। অনুমান করা যায় যে লেখার সময় ছিল ১৮৫৭ সাল, তখনই তিনি এই নতুন ছন্দের প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু কবিতার বই তখন প্রকাশিত হয়নি। ১৮৬০ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্তের তিলোত্তমাসম্ভব এবং ১৮৬১ সালে মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হয়ে যায়। কেদারনাথের কবিতার রচনাকাল তারও পূর্বে, তিনিই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বলে তবু পরিগণিত হননি। মাইকেলই স্বীকৃতি পান।

কিন্তু কেদারনাথের কবিতাগ্রন্থগুলিও প্রভূত সমাদর লাভ করে। সেদিন প্রখ্যাত পত্রিকা 'ক্যালকাটা রিভিউ' এই কাব্য দুটির প্রভূত প্রশংসা করে মূল্যবান সমালোচনা প্রকাশ করেন। তাঁরা মন্তব্য করেন ঃ

—We hope the author will continue to give his countrymen the benefit of his elegant and unasuming pen, which is quite free from those objectionable licenses of thought and expresion which abound in many dramas recently published.

কেদারনাথের কাছে পাঠকবৃন্দ মনোমোহন রচনা খুব বেশী পান নি, কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর লেখনী এক অপূর্ব অমৃতলোকের সন্ধান দিয়েছিল দেশ-বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষকে, যে অমৃতধারা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে মানুষের হৃদয়ে।

কেদারনাথ এই সময় ইংরাজীতে একটি প্রবন্ধ লেখেন, Our Wants.

কেদারনাথ বাংলাতেই নয়, ইংরাজী-উর্দুতেও গ্রন্থ রচনা করেন। বিশেষ করে তাঁর দৃষ্টি ক্ষুদ্র সীমারেখার মধ্যেই সীমিত ছিল না। ইংরাজী শিক্ষা তাঁর মনের রুদ্ধ বাতায়নকে খুলে দিয়েছিল। তিনি তৎকালীন ইংরেজ সমাজের সঙ্গেও মেলামেশা করতেন। বহুল প্রচারের জন্য তাই ইংরাজীতে লিখতে শুরু করেন।

Our Wants প্রকাশিত হবার পর ব্রাহ্মসমাজ তো বটেই, খৃষ্টান সমাজের কিছু মৌলবাদীরা তাঁর উপর ক্ষুব্ধ হন। এই গ্রন্থে তিনি তাদের সংকীর্ণ গোঁড়া মনোভাবের কঠিন সমালোচনা করেন।

ব্রাহ্মধর্মের এই আলোচনায় সেই সমাজের কিছু মানুষের সেই ধর্মের উপর কিছুটা বিরক্ত হয়ে কেদারনাথের মতবাদকে মেনে নিয়ে তাঁর নিকটসান্নিধ্যে আসেন। কেদারনাথ তাঁদের নিয়ে একটি আলোচনা-সভা গড়ে তোলেন।

এই সময় বর্ধমান শহরেও তিনি এক জ্ঞানীজনসভায় 'আত্মা' প্রসঙ্গে সারগর্ভ ভাষণ দেন—যা শহরের বহুজনকে মুগ্ধ করে।

Mr. W. L. Heily I. C. S. তখন বর্ধমানের পদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারী। তিনিও সুপণ্ডিত। কেদারনাথের ওই ভাষণ তাঁকেও মুগ্ধ করে।

তিনি কলকাতার সম্ভ্রান্ত ক্লাব 'ডালহৌসী ইনস্টিটিউটের' সভ্য ছিলেন। সেখানে বহু পণ্ডিত ব্যক্তি বিশেষ ভাষণ দিতেন। মিঃ হেলি তাঁকে সেখানের একটি আলোচনা-সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। কেদারনাথও তাতে সাড়া দিয়ে কলকাতায় আসেন।

সেদিনের সভার ভাষণ ছিল 'Centralization of Power', কেদারনাথ সেই ভাষণ দিতে এসে শিক্ষক রেভারেণ্ড ডাল সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন।

দ্বিজেন ঠাকুরকে বড়দাদা বলতেন, কলকাতায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা অবশ্যই করতেন। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় না।

দ্বিজেন ঠাকুরের ওখানে বহু আলোচনাও হয়, সেখানে রাত্রিবাস করে বর্ধমানে ফিরে যান।

কেদারনাথের জীবনদেবতা তাঁকে বহু বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে এনেছেন, এসেছেন বহু বিচিত্র কর্মক্ষেত্রে। আর বিদেশী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী সাধারণত নেটিভ অফিসারদের যে চোখে দেখতেন সেটা খুব সম্মানজনক আদৌ ছিল না। নেটিভরাও সাহেবদের তুষ্ট রাখার জন্য সর্বদাই নানাভাবে চেষ্টা করতেন, সাহেবরাও তার সুযোগ নিত।

কিন্তু কেদারনাথের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটেছিল। তাঁর বাগ্মিতা, প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য আর ব্যক্তিত্বের সামনে পদস্থ বিদেশী কর্মচারীরাও শ্রদ্ধাবনত হতো। এ যেন কেদারনাথের উপর জীবনদেবতার অশেষ আশীর্বাদই।

এখানেও মিঃ হেলি কেদারনাথের গুণমুগ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর প্রতিভার যোগ্য সম্মান দেবার কথাই ভাবেন তিনি। তখনও তেমন কিছু সুযোগ না ঘটলেও আপাতত কেদারনাথকে তিনি

চুয়াডাঙার কোর্টের প্রধান করণিকের পদে উন্নীত করেন। মাইনেও বেশ কিছু বাড়লো। এই পদের জন্য তখন নির্ধারিত ছিল দেড়শ টাকা। তখনকার দিনে সেটাও অনেক। তবে এই চাকরির মেয়াদ ছিল দেড় বছরের জন্য। তবু কেদারনাথ এই পদে তখনকার মত যোগ দিয়ে চুয়াডাঙায় এলেন।

এখন তাঁর একটি কন্যাসন্তান জন্ম নেয়। চুয়াডাঙায় থাকাকালীন তিনি আইন পরীক্ষাও দেন। বর্ধমানেই তখন আইন পড়ানো হতো। পাশও করলেন।

কিন্তু ততদিনে চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। রানাঘাটে এসে রয়েছেন। আপাতত করার কিছুই নাই। এখানে অতীতের স্মৃতিই মনে ভীড় করে আসে। কাছেই উলাগ্রাম। বহু স্মৃতিজড়িত সেই জনপদ। একদিন সেখানে রাজপ্রাসাদে বাস করেছেন, আজ সে সব স্বপ্নে পরিণত হয়েছে। জীবনের এই অনিত্যতাকে বার বার অন্তরমনে অনুভব করেন তিনি।

তাহলে 'নিত্য' কি! সেই পরমসত্যের সন্ধানই করতে চায় মন। রানাঘাটেও তাঁর পড়াশোনার কাজ চলে। কিন্তু কি যেন হতাশায় মন ভরে ওঠে।

দাদু রাজবল্লভ দত্তের কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন সাতাশ বৎসর বয়স থেকেই তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হবে। সাতাশ বৎসর পূর্ণ হতে চলেছে, এখনও বেকারই রয়ে গেছেন।

তবু চেষ্টার বিরাম নেই। বর্ধমানে মিঃ হেলির সঙ্গে পত্রালাপ হয়।

আর এক ইংরেজ কর্মচারী মিঃ হিলটনও তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। হঠাৎ সেই বেকারজীবনে যেন অযাচিতভাবে আলোর সন্ধান আসে।

একটা নয় একসঙ্গে তিনতিনটে নিয়োগপত্র আসে তাঁর কাছে। একটা এসেছে মিঃ হেলির সুপারিশে, তাতে তাঁকে ছাপরার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসহ ডেপুটি রেজিস্টার করা হয়েছে। অন্যটা আসে মিঃ হিলটনের সুপারিশমত কোথায় প্রধান কেরানীর চাকরির, অন্যটা আসে সরকারের কাছ থেকে, সেটার কর্মস্থান ওই ছাপরাতে।

তখন প্রশাসন পরিচালনা করা হত কলকাতা থেকে। তাই এখান থেকেই তাঁকে ছাপরাতে নিয়োগ করা হয়।

কেদারনাথ ছাপরায় ডেপুটি রেজিস্টারের পদই গ্রহণ করলেন। মিঃ হেলিকে এর জন্য ধন্যবাদ জানানো দরকার, তাই বর্ধমানেও গেলেন, কিন্তু মিঃ হেলি কি কাজে উড়িষ্যায় গেছেন, তাই তাঁর সঙ্গে দেখা হল না।

মা, স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে রানাঘাটে রেখে কেদারনাথ একাই চললেন ছাপরায়, সঙ্গে তাঁর প্রিয় কুকুর টাইগার। মালিক ছাড়া সেও থাকবে না। তাই সামান্য মালপত্র আর টাইগারকে নিয়ে কেদারনাথ এবার যাত্রা করলেন ছাপরার উদ্দেশে। সেখানে গিয়ে ডেপুটি রেজিস্টার অব অ্যাস্যুরেন্সস-এর পদে বহাল হলেন।

আর হিসাব করে দেখেন কেদারনাথ, তখন তার সাতাশ বৎসর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর ঋষিকল্প দাদু রাজবল্লভ দত্তের প্রথম ভবিষ্যৎবাণী সত্যে পরিণত হয়েছে। শুরু হল তাঁর প্রকৃত কর্মজীবন। কিন্তু দ্বিতীয় ভবিষ্যৎ বাণী তাঁর পরম বৈষ্ণব হবার কোন প্রমাণ এখনও মেলে নি।

তবে অন্তরমনে তিনি নিষ্ঠাবান—নিজেকে পূতপবিত্র জ্ঞানতপস্বীই করে তুলতে চেষ্টা করে চলেন। কবে সেই পরমা করুণা লাভে সমর্থ হবেন তা জানেন মাত্র তাঁর জীবনদেবতা।

কেদারনাথের মনে রয়েছে নতুন কিছুকে পুনরাবিষ্কার করে হৃত-গৌরবকে উদ্ধার করা, স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা। এই কাজ তিনি করেন অন্তরমন দিয়ে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে।

ছাপরার কিছু দূরে গোদানা আশ্রমের নাম তিনি এর আগেও শুনেছেন। গোদানা আশ্রমেই

বাস করতেন মহাপণ্ডিত গৌতম ঋষি। তিনি ছিলেন ন্যায়শাস্ত্রের প্রবর্তক এবং ন্যায়শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

ছাপরাতে ক্রমশ কেদারনাথ পরিচিত হয়ে উঠছেন। তাঁর পাণ্ডিত্য আর সুমধুর ব্যবহার সেখানকার বিদ্বৎজনসমাজে সমাদর এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কেদারনাথ গোদানা আশ্রম দেখতে যান তীর্থযাত্রীর মত পরমশ্রদ্ধাভরে। দেখেন গৌতম ঋষির মূর্তি। ছাপরায় ফিরে এসে ছাপরার গুণীসমাজকে তিনি এই তথ্য জানান।

যেখানে ন্যায়শাস্ত্রের প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল সেখানে আজ সেই শাস্ত্র অবলুপ্তপ্রায়। দু-চারজন পণ্ডিত অনাদৃত হয়েও সেই ন্যায়শাস্ত্রের পঠন-পাঠন কোনমতে চালিয়ে যাচ্ছেন।

কেদারনাথ ছাপরার ধনী-গুণী-সাধারণ মানুষের কাছে এক মহতী সভার আয়োজন করে ছাপরাতে ন্যায়শাস্ত্র পঠনের একটি বড় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্য আবেদন জানান।

সমাজে যত অনাচার অন্যায় চলুক, কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও আছেন। তাঁদের চেষ্টাতেই ছাপরার এবার ন্যায়শিক্ষার জন্য বিরাট এক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ শুরু হলো। ছাপরার আপামর মানুষ সহযোগিতা করলেন। স্যার রিভার্স থমসন তখন বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর। তাঁকে দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করানো হল।

লুপ্তপ্রায় ন্যায়শাস্ত্রের পুনরায় পঠন-পাঠন সুরু হল সেখানে সগৌরবে।

রেজিস্টারী বিভাগে কাজ করতে করতে তিনি অনুভব করেন এই সম্বন্ধে প্রামাণ্য পুস্তক আছে সরকারী স্তরে ইংরাজী ভাষায়—Manual of the Registration Department; সাধারণ মানুষ ইংরাজী জানে না, ফলে তাদের অনেক অসুবিধাই হয় আইনগত ব্যাপারে। তিনি জনসাধারণের অবগতির জন্যই এটিকে উর্দুভাষায় অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ বইটি (বোলি দে রেজেস্ট্রী) উত্তর ভারতে জনসমাজে খুবই সমাদৃত হয় এবং সরকারী ভাবেও এটিকে প্রামাণ্য আইনগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ছাপরায় থাকাকালীন কেদারনাথ বেশ অসুস্থ হয়ে পড়েন। উদরাময় রক্তামাশয়ে ভুগতে থাকেন। অসুস্থ শরীরেও সরকারী চাকরিতে প্রমোশনের জন্য পরীক্ষাও দেন, কিন্তু শরীর খারাপ থাকার জন্য পড়াশোনাও ঠিকমত করতে পারেন নি, ফলে সেবার সেই পরীক্ষাতে ভালো স্থানও পান না। আর তাই প্রমোশনের সম্ভাবনাও তখন দেখা যায় না।

শরীর টিকছে না। বিশ্রামের দরকার।

কেদারনাথ বেশ কিছুদিনের জন্য সরকারী চাকরি থেকে ছুটি নিয়ে তীর্থযাত্রা করলেন। কাশী প্রয়াগ মথুরা হয়ে গেলেন বৃন্দাবনে।

•

বৃন্দাবনের বহু নাম শুনেছেন। জগাদার কথা মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি এই বৃন্দাবনে। যমুনা পুলিন গিরিগোবর্ধন শ্যামকুঞ্জ রাধাকুঞ্জ সবই দেখেন তিনি। গোবিন্দমন্দিরের বিগ্রহকে প্রণাম করেন। ষড়গোস্বামীর সাধনাস্থল এই বৃন্দাবন।

কিন্তু এসব দেখে শুধু সেই জ্ঞান আর ইতিহাসের কথাই বেশী মনে পড়ে। ভক্তির যোগ সেখানে নেই। অন্তর দিয়ে নয় চোখ দিয়েই দেখেন এই লীলাস্থল। বহু সাধু-তপস্বীদেরও দেখেন। কিন্তু তেমন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দেখার চোখও যেন নেই। এক মায়ার ঘোরে বাহ্যিক বৃন্দাবনকে দেখেন। অন্তরের ভক্তির ফল্গুধারা তখনও জাগরূক হয়নি। সেই পরম আশীর্বাদ থেকে তখনও বঞ্চিত তিনি। অর্জুনও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আত্মীয়জনকে মায়ার ঘোরেই দেখেছিলেন, তাই যুদ্ধে তাদের হত্যা করতে চান নি। শ্রীকৃষ্ণই সেই মায়ার ঘোর থেকে তাঁকে মুক্তি দিয়েছিলেন—দিয়েছিলেন দিব্যদৃষ্টি।

তেমনি কেদারনাথও ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেরিত পুরুষ, তখনও বোধহয় কাল সমাগত হয়নি সেই পরমদেবতার করুণা লাভের, তাই জ্ঞানের মায়াঘোরেই বৃন্দাবন পরিক্রমা করেন—দেখেন মাত্র। এর নিত্যলীলার প্রকাশ তাঁর কাছে তখনও রহস্যাবৃতই থেকে যায়। ঠিক প্রকৃত রসাস্বাদন করতে পারেন না। এই কথা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতেও প্রকাশ করেন।

শরীর তখনও সুস্থ নয়। তীর্থভ্রমণ সেরে ফিরছেন সপরিবারে, ট্রেনে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি কেদারনাথের অসুখের কথা শুনে বলেন—তাঁর ঠিকানায় তিনি একটা ওষুধের ফর্দ পাঠাবেন, সেইমত ওষুধ তৈরী করে খেলেই পেটের ব্যামো সেরে যাবে।

ছাপরায় ফিরলেন কেদারনাথ। অসুখও সমানে চলেছে, তবু কাজকর্মও করতে হয়। এইসময় ছাপরায় তার পদস্থ কর্তা মিঃ বিভারলি তাঁর অফিস পরিদর্শনে এসে কেদারনাথের কাজকর্ম দেখে খুবই খুশী হন। বলেন—বাবু, তুমি একটু বেশী করে পড়াশোনা করে বিভাগীয় পরীক্ষা দাও। তোমার মত লোকের প্রমোশন পাওয়া উচিত, ঠিক তুমি পাশ করবেই।

কেদারনাথ যা ধরেন তার শেষ না দেখে ছাড়েন না। ওই অসুস্থতা ভুলে তিনি পড়াশোনা করতে থাকেন। সেই অবস্থাতেই পাটনা শহরে গিয়ে এবারও পরীক্ষা দিয়ে এলেন।

এইসময় ছাপরাতে তাঁর দ্বিতীয় কন্যা কাদম্বিনীর জন্ম হয়। শরীর খারাপই চলেছে।

ট্রেনের পরিচিত সেই ভদ্রলোক তাঁর ওষুধের নামগুলি ও মাত্রা সবই জানিয়েছেন। অন্যসব ওষুধ—জড়িবুটি মিলে যায় কিন্তু ওষুধের অন্যতম প্রধান উপাদান মূলতানি হিং কোথাও সংগ্রহ করতে পারেন না। স্থানীয় দোকানদাররা বলে, দেখি চেষ্টা করে, ওসব জিনিস মেলা ভার—কাশী বা কলকাতায় যদি মেলে আনবার চেষ্টা করছি।

তাই সেই ওষুধও তৈরী করা হয়নি।

এমনি দিনে খবর আসে এবার বিভাগীয় পরীক্ষায় তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেছেন। আর যেন দৈবপ্রেরিত হয়েই এতদিন যে মূলতানি হিং-এর সন্ধান করছিলেন সেটা এক ব্যবসায়ীই এনে দেয়।—আপনার জিনিস পেয়ে গেছি!

কেদারনাথ ভাবেন এ যেন সেই জীবনদেবতারই দয়ার প্রকাশ। ঘরে তাঁর লক্ষ্মী এসেছে, চাকরিতেও উন্নতি হতে চলেছে, আরও আশ্চর্য হন তিনি সেই ফর্মূলা অনুযায়ী ওষুধ তৈরী করে কয়েকদিন ব্যবহার করতে তাঁর এতদিনে রোগেরও উপশম হয়ে যায়।

তাঁর জীবনে বারবার অন্ধকার এসেছে কিন্তু তিনি কোনদিন ভেঙে পড়েন নি। তাঁর সব কর্তব্য অবিচলভাবে পালন করে গেছেন, আবার সেই দেবতার আশীর্বাদেই সব অন্ধকার কেটে আশার আলোর নিশানা এসেছে। এমনি বারবারের অভিজ্ঞতায় কেদারনাথের মনে হয় এ সবই ঈশ্বরেরই নির্দেশ। তাঁর মন তাই সেই পরমদেবতার পদপ্রান্তে বারবার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করে। আত্মসমর্পণের প্রস্তুতি চলে এইভাবেই প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্তের সাধনায়, অনুভূতির মধ্য দিয়ে এ যেন ধীরে ধীরে ঈশ্বর-সমীপবর্তী হবার লীলাই চলেছে।

কেদারনাথকে এবার পূর্ণিয়ার কিষণগঞ্জে ওই পদে বদলি করার নির্দেশ আসে। কিন্তু এইসময় আরও একটা ঘটনা ঘটে যা তাঁর জীবনের গতিপথকে অন্য-খাতে প্রবাহিত করে।

মিঃ বিভারলি জানিয়েছেন, এবার জুডিশিয়াল বিভাগকে স্বতন্ত্র করা হচ্ছে। প্রশাসনে এবং বিচারবিভাগে তাঁর মত যোগ্য কর্মীর খুবই প্রয়োজন।

তাই কেদারনাথ যেন ওই বিভাগেই যোগ দেন, সেখানেই তাঁর মত লোকের প্রয়োজন।

কিন্তু সেখানে প্রমোশনের জন্য আবার কি পরীক্ষা দিতে হবে কে জানে? তাঁর মনে পড়ে আছে ধর্ম-সাহিত্য-দর্শনের দিকে। আইনের নীরস বই পড়ে অন্নসংস্থানের জন্য পরীক্ষা দিতে

আর চান না তিনি, সেই পরিশ্রম করতে চান লেখাপড়ার কাজে, তাই ওই নতুন বিভাগে যোগ দিতে দ্বিধা করেন।

তাঁকে জানানো হল আর পরীক্ষার বেড়া টপকাবার দরকার নেই, তিনিও এবার এই বিচার এবং প্রশাসন বিভাগে যোগ দিতে স্বীকৃত হলেন।

এবার অন্য জীবনই সুরু হল। কেদারনাথ ছাপরা থেকে বদলি হয়ে দিনাজপুরে এসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে যোগ দিলেন।

এখানে যেন জীবনদেবতা তাঁকে এনেছিলেন নিজের খেয়ালেই কারণ দিনাজপুরে না এলে বোধ হয় কেদারনাথের প্রকৃত কাজের ধারা প্রবাহিত হতো না সঠিক পথে। তাই তাঁরই অমোঘ নির্দেশে তাঁকে এখানে আসতে হয়েছিল।

দিনাজপুরে এসে কেদারনাথ যেন নতুন এক জগৎকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এতদিন ছাপরাতে এই পরিবেশ ছিল না, শরীরও ভেঙে পড়েছিল সেখানে। পরীক্ষার চাপ, কাজের চাপ এসব তো ছিলই, আর মনের খোরাকও সেখানে সংগ্রহ করার তেমন সুযোগ ছিল না। ভক্তিমার্গের পথিক তিনি, সেখানে ভক্তির কোন অবকাশই ছিল না।

সেটা এসে পেয়ে গেলেন দিনাজপুরে। দিনাজপুরের ঐতিহ্য গৌরবমণ্ডিত, বিশেষ করে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কাছে। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব এখানের সমাজে আজও বিদ্যমান, কারণ এখানের রাজবংশের সন্তান রামানন্দ বসু ছিলেন স্বয়ং শ্রীমহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্শ্বচর। তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করে চৈতন্যদেবের অনুগামী হয়েছিলেন, তাঁর ধর্মমতের একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন।

সেই কারণে পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম যখন লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছল, দিনাজপুরের জমিদারবংশ কিন্তু সেই ধর্মমতকে নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেও প্রচলিত রেখেছিলেন।

দিনাজপুরের বর্তমান জমিদার রায়সাহেব কমললোচন বসুও সেই ধারাকে প্রবাহিত রেখেছিলেন, ফলে দিনাজপুরে একটি সুন্দর বৈষ্ণব পরিবেশ ছিল, বেশ কিছু নিষ্ঠাবান সৎ প্রকৃত বৈষ্ণবও ছিলেন এখানে, বাইরে থেকেও কিছু গোস্বামীরা আসতেন তাঁদের কাছে, বৈষ্ণবশাস্ত্রাদির আলোচনাও হতো।

কেদারনাথ ছাপরার ঊষর মরুভূমি থেকে এসে উপস্থিত হলেন এক ভক্তিরসের স্নিগ্ধ মরূদ্যানে। এর মধ্যে বৃন্দাবনধামও দর্শন করে এসেছেন, কোথাও তবু শূন্যতা রয়ে গেছে, এখানে এসে বৈষ্ণবশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলাপ-আলোচনা শুনে প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্ম, বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রসঙ্গে জানার জন্য মন আরও আগ্রহী হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবদের আলোচনা সভাতেও যান, ব্যাকুল হয়ে ওঠেন আরও কিছু জানার জন্য।

এতদিন প্রতীক্ষা করে থেকেও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বা শ্রীমৎভাগবত সংগ্রহ করতে পারেন নি, মেদিনীপুরে থাকাকালীনও চেষ্টা করে পান নি। ওসব গ্রন্থ তখন বাজারে মিলতো না, কৃষ্ণকে নিয়ে শ্রীরাধা আর সখীদের সঙ্গে বিহারের নানা মুখরোচক বই-ই প্রকাশিত ছিল। কৃষ্ণ সেখানে সখীসহকারে কুঞ্জেও পরিচিত রসিকনাগর বলেই। সেসব বই-এ ছিল আদিরস এবং শৃঙ্গাররসের প্রাচুর্য।

সময় না হলে প্রকৃতির নিয়মে একটি ফুলও ফোটে না, অন্তরালে চলে কুঁড়ির সৃষ্টি—তারপর হয় সঠিককালে, পরিবেশে ফুলের প্রকাশ। রূপ, রস, বর্ণ নিয়ে সে প্রকাশিত হয় কোন্ অলক্ষ্য রূপকারের নির্দেশে।

কেদারনাথের জীবনেও এতকাল তারই প্রস্তুতি চলেছিল। তত্ত্ববিদরা বলবেন মহামায়াই যেন

তাঁর সঠিক অনুভূতি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন যথাসময়ে তাঁকে প্রকাশিত করার জন্য। হয়তো তাঁর অন্তরদেবতার পথনির্দেশের সময় তখনও আসেনি—এবার এসেছে।

কেদারনাথ কলকাতায় বন্ধু প্রতাপ রায়কেও চিঠি লেখেন। সেইসব চিঠিতে এই সব গ্রন্থ যদি পাওয়া যায়, পাঠাবার জন্যও অনুরোধ করতেন।

হঠাৎ সেদিন কেদারনাথ অফিসে পার্সেলটা পান। কি কৌতূহলবশে খুলতেই দেখেন এতদিনের প্রতীক্ষার পর আজ সেই বই দু'খানি পেয়েছেন। এ যেন কাঙালের গুপ্তধনপ্রাপ্তি! সশ্রদ্ধভাবে দেবতার আশীর্বাদ বলে মাথায় ছোঁয়ান।

ভক্তমালিকা গ্রন্থখানি এর মধ্যে সংগ্রহ করেছেন, এবার বহু প্রতীক্ষিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পেয়েছেন এতদিন পর।

পড়তে থাকেন পরম আগ্রহ নিয়ে সেই মহাগ্রন্থ। প্রথমবার এই গ্রন্থ পাঠ করে শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদকে স্বীকার করে নেন তাঁর যুক্তিবাদী মন দিয়ে বিশ্লেষণ করে। তখনও রয়েছে 'জ্ঞান', তাই প্রথমবারে এর বেশী কিছুই অনুভব করতে পারেন না এই গ্রন্থ থেকে।

আবার পড়তে থাকেন।

এবার যতই পড়েন ততই মনে হয় শ্রীচৈতন্যদেবের মত মহাপণ্ডিত ব্যক্তি সেকালে খুবই কম ছিলেন। সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন তিনি, প্রজ্ঞা-জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের মূর্ত প্রতীক।

তিনি বার বার শ্রীকৃষ্ণেরই উল্লেখ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণকেই পরমপুরুষজ্ঞানে পূজাও করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁর জীবন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে উৎসর্গীকৃত।

এইখানেই কেদারনাথের যুক্তিবাদী মনে সংশয় জাগে। এর আগে অবধি কৃষ্ণ প্রসঙ্গে যা জেনেছেন, যে-সব বই পড়েছেন তাতে কৃষ্ণকে রসিককে শৃঙ্গাররসের নায়ক বলেই বর্ণনা করা হয়েছে, তাঁর চরিত্র নিয়েও বহুস্থানে কটাক্ষ করা হয়েছে।

সেই চরিত্রের নায়ক কৃষ্ণকে এভাবে ভজনা আত্মসমর্পণ করেন কি ভাবে চৈতন্যদেবের মত একজন কালজয়ী বিদ্বান, এইটাই তাঁর কাছে কঠিন প্রশ্ন হয়ে ওঠে।

চৈতন্যদেবের মত এত বড় বিশালমাপের পণ্ডিত এমন ভুল নিশ্চয়ই করতে পারেন না। তবে কি এতদিন ধরে কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে যা জেনেছেন তা অসম্পূর্ণ বিকৃত, না শ্রীচৈতন্যদেবই সঠিকভাবে কৃষ্ণকে চেনেন নি? এই প্রশ্নই জাগে বারবার। এ যেন বিচিত্র এক রহস্য। এই রহস্য ভেদ করার মত যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞান কিছুই তাঁর ভাঁড়ারে নেই। সব চিন্তন-মননও স্তব্ধ হয়ে গেছে এক জমাট বাধাপ্রাচীরের সামনে।

এবার সুরু হল তাঁর কাতর প্রার্থনা। এই অজ্ঞতার অবগুণ্ঠন উন্মোচন করো দেবতা! তাঁর সারামনে এই আকূতি। সব কাজের ফাঁকে দিবারাত্রি চলে এই প্রার্থনা—এর কি কোন মীমাংসা হবে না?

এই কাতর প্রার্থনা চলে অবিরাম। স্ত্রী ভগবতী দেবীও স্বামীভক্তিপরায়ণা। সংসারের সব দায় নিয়েছেন তিনিই। এর মধ্যে তাঁর বাংলোতেও বহু ভক্তজন আসেন।

ভগবতী দেবী অন্তরালে থেকে তাদের সেবা-পরিচর্যাও করেন। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার ভারও রয়েছে। কেদারনাথ অবশ্য এত কাজের মধ্যেও সংসারের সব কিছুই দেখেন। তবু সংসারে থেকেও সংসারের জালে জড়া'ন নি। ভগবতী দেবীও স্বামীর এই পড়াশোনা-আধ্যাত্মিকজগতের পথের সহধর্মিণী।

স্বামীকে এইভাবে আনমনা থাকতে দেখে শুধোন—শরীর খারাপ?

স্ত্রীর কথায় তিনি জানান—না।

রাত্রি কাটে—চোখে ঘুম নেই। এই সঙ্গে কাতর আকুতি—আমাকে দিব্যজ্ঞান দাও, চেতনা দাও, শুদ্ধাভক্তি দাও, যা দিয়ে তোমার লীলারসাস্বাদন করতে পারি।

সেদিন রাত্রে হঠাৎ যেন এক নব চেতনার আলো তাঁর মনের সব অন্ধকারকে দূর করে দেয়। সেই আলোকরশ্মি তাঁর চোখে যেন নতুন দৃষ্টি এনে দেয়। সারা অন্তরমনে কি দিব্য আবেশ। এক অমেয় করুণাধারায় স্নাত হন—ধন্য হন।

তাঁর সামনে কৃষ্ণতত্ত্বের বিশদ বিশ্লেষণ ঘটে, যা অতি গূঢ়তত্ত্ব গোপন এবং ঈশ্বরচেতনার এক অপূর্ব উন্মেষ। এবার তাঁর কাছে শ্রীকৃষ্ণ নতুনরূপে প্রতিভাত হন, সব দ্বিধা-দ্বন্দ্ব তাঁর মুছে যায় মন থেকে। চৈতন্যদেবই তাঁর সব প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন।

এবার তাঁরই নির্দেশে কেদারনাথ শ্রীকৃষ্ণে নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে পারেন। সারা অন্তরমন কৃষ্ণঅনুরাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

এ কেদারনাথের জীবনে নবচেতনার উন্মেষ। এবার শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পরম ভক্তিপূর্ণ হৃদয়-মন নিয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পড়তে থাকেন—পড়তে থাকেন কৃষ্ণতত্ত্বের সার শ্রীমদ্‌ভাগবত।

এ যেন এক রত্নখনির সন্ধানই পেয়েছেন তিনি। এতদিন 'জ্ঞান'-তর্ক এ-সবের বড়াই ছিল, এবার ভক্তির বন্যায় সব জ্ঞানশিলা ভেসে যায়, মুছে যায় সব বাধার প্রাচীর।

বার বার মনে হয়—

বিধি ভক্তি তপঃ জ্ঞান—তাহে কৃষ্ণ মিলায়ে দুর্লভ।

যে কেবল রাগমার্গে ভজে কৃষ্ণ অনুরাগে, তারে কৃষ্ণ মিলায়ে সুলভ॥

মহামায়া এতদিন তাকে মায়াঘোরেই আবদ্ধ করে রেখেছিলেন, এবার তিনিই সেই বন্ধন উন্মোচন করে তাঁকে এনেছেন নতুন এক ঐশীচেতনার জগতে। কেদারনাথ এবার বুঝেছেন—তাঁর সামনে এবার সুরু হল আর এক কর্মজগৎ। বৈষ্ণবধর্মকে তাঁকে পুনরায় উজ্জীবিত করে শ্রীচৈতন্যদেবের মতবাদকে সর্বজনসমক্ষে প্রচার প্রসার করার নির্দেশই তিনি পেয়েছেন।

এ বড় কঠিন দায়িত্ব। কিন্তু জীবনদেবতার কাছে তাই তাঁর প্রার্থনা—

তোমার পতাকা যারে দাও
তারে বহিবারে দাও শকতি।

সেই মহাদেবতার নির্দেশ যেন ধ্বনিত হয়। সারা অন্তরমন কি অপূর্ব আনন্দে রঞ্জিত হয়ে ওঠে, মনে হয় কি এক স্বর্গীয় রূপের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করেছেন তিনি, তারই জন্য তিনি ধন্য—অন্তর হয়েছে পূতপবিত্র।

শিশুকাল থেকে তাঁর অজান্তে অন্তরে বৈষ্ণবধর্মের বীজ নিহিত হয়েছিল, এবার শ্রীচৈতন্যদেবের অসীম কৃপায় সেই বীজ অঙ্কুরিত হল—তাঁর হৃদয়ে সঞ্চারিত হল 'অনুরাগ'। এবার কৃষ্ণঅনুরাগে-রঞ্জিত সদাআনন্দময় অন্তর। চৈতন্যদেবের ধর্মতত্ত্বকে জানার জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবৎকে অন্তরে গ্রহণ করার সাধনা শুরু হল তাঁর। সর্বদাই এই দৈবসান্নিধ্যে মন আনন্দময় হয়ে থাকে।

কৃষ্ণমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে এই অনুভূতিকে কেন্দ্র করে রচিত হল বাংলা কবিতা—সৎচিদানন্দ প্রেমালঙ্কার। দিনাজপুরের বৈষ্ণব সমাজে তার খ্যাতিও প্রসারিত হল।

॥ ১৯ ॥

দিনাজপুর এস্টেটের খাজাঞ্চিবাবুর উদ্যোগে এক মহতী ধর্মসভার আয়োজন করা হল। এই ধর্মসভায় যোগ দেন স্থানীয় বহু ভক্ত এবং বাইরের বহু গণ্যমান্য লোক, কিছু বিদেশী পদ

কর্মচারীও এই সভায় যোগ দেন।

এই সময়ে দিনাজপুরেও ব্রাহ্মধর্মের একটা ঘাঁটি ছিল। এই ব্রাহ্মধর্ম দলে বেশীর ভাগ শিক্ষক—সমাজের উচ্চকোটির কিছু মানুষও ছিলেন।

তারাই কেদারনাথের মত একজন পদস্থ সরকারী কর্মচারী এবং বিদ্বান, সুবক্তাকেও দলে টানার জন্য তাঁকেও সেইসব ধর্মালোচনার মাঝে আমন্ত্রণ জানান।

কিন্তু কেদারনাথ তখন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-শ্রীমদ্‌ভাগবৎ পড়ার স্বাদ বুঝেছেন। তাঁর কাছে এবার নিজের জীবনের পথনির্দেশও এসে গেছে।

তিনি ব্রাহ্মধর্মের সেই প্রবক্তাদের জানান—আমি ব্রাহ্ম নই, আমি চৈতন্যদেবের ধর্মমতে বিশ্বাসী। তাই আপনাদের সভায় যেতে ঠিক আগ্রহী হতে পারলাম না।

দিনাজপুরের হিন্দুসভার লোকদের কাছে এ খবরও পৌঁছে যায়। তারা এবার সেই মহতী ধর্মসভায় কেদারনাথকে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানান।

কেদারনাথ এই সভায় শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রসঙ্গে সারগর্ভ আলোচনা করেন। সেই তত্ত্ব, পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণে ভাগবতের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি-অনুরাগ এবং তত্ত্বগত বিশ্লেষণ শ্রোতাদের সামনে শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রসঙ্গে এক নবদিগন্তকে উন্মোচন করে দেয়।

এতদিন শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে অনেকের অস্পষ্ট কিছু অসম্পূর্ণ—হয়তো ভ্রান্ত ধারণাই ছিল। কেদারনাথের এই ব্যাখ্যা তাদের মনে শ্রীমদ্‌ভাগবত সম্বন্ধে নতুন আগ্রহের সৃষ্টি হয়। তিনি বলেন যে, বহু তথাকথিত পণ্ডিতদের ব্যাখ্যার জন্য ভাগবতের অসম্পূর্ণ ধারণাই আমরা পেয়েছি অনেক সময়। কিন্তু প্রকৃত অর্থে ভাগবত ঈশ্বরভাবনার প্রধান গ্রন্থ।

রাজা রামমোহনও এই মহান পাশ্চাত্ত্য দর্শনের জ্ঞান দিয়ে ভাগবতকে ব্যাখ্যা করেছেন, সেটা সঠিক নয়। তিনি বলেন,

The Bhagavat like all religious works and philosophical performances and writings of great men has suffered from impudent conduct of useless readers and stupid critics, not to say of other people, the great genius of Raja Rammohan Roy, the founder of the sect of Brahmoism, did not think it worth his while to study this ornament of the religious library. He crossed the gate of the Vedanta, as sit up by the Mayavada Construction of Shankaracharya ; and preferred to chalk his way out to the unatarian form of the Christian faith, converted into an Indian appearance.

সেকালের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিতদের কাছে ভাগবত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই ছিল। কেদারনাথের সেই ভুল এবার ভেঙেছে। তিনি বলেন এই প্রসঙ্গে

—The Bhagavat, as a matter of course, has been held in decision by those teachers, who are generally of an inferior mind and intellect. The prejudice is not easily shaken off when the student grows up, unless the candidly studies the book and meditates over on the doctrines of Vaishnavism. We are ourselves witnesses to the fact. When we were in College, reading the philosophical works of the west and exchanging thought with the thinkers of the day, we had contracted a hatred towards the Bhagavat.

ভাগবৎ-এর মত মহৎ সম্পদের মর্যাদা সেদিনের সমাজ অনুভবই করেন নি। করার অবকাশও ছিল না। কেদারনাথ বলেন পরবর্তীকালে সেই ভুল তার ভাঙে আর,

—We fell in with a work about the Great Chaityana and on reading it with some attention in order to settle the historical position of Mighty Genius

of Nadia, we had the opportunity of gathering his explanation of the Bhagav given to the wrangling Vedantists of the Benaras School.

এই পাঠ থেকে শুরু হল মনে এক অপূর্ব অনুরাগ। বৈষ্ণবধর্ম-বৈষ্ণবতত্ত্ব-কৃষ্ণতত্ত্ব যে ক গভীর—কত অর্থবহ এবং অপরূপ তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। আর ততই আকৃষ্ট হ থাকে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি যা আজ হেলায় অশ্রদ্ধায় সমাজে লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছে।

এক এক ধর্মমতের ধারক তার নিজের দৃষ্টিকোণ থেকেই ভাগবতকে ব্যাখ্যা করবেন এ এক বিভিন্ন রূপে। দার্শনিক প্লুটো আধ্যাত্মিকতার চূড়া দেখেছিলেন পশ্চিমের দৃষ্টি নিয়ে, বেদব্যা দেখেছিলেন ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, কুনফুসিয়াসও দেখেছেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি দিয়ে- এরপরেও দেখি স্পিনোজা কেন্ট গোথে দেখেছিলেন পাশ্চাত্যের দৃষ্টিকোণ থেকে। এই দশ ঘটেছিল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কালে কিন্তু এদের মূল তত্ত্ব ছিল প্রায় একই।

—Their words and expressions are different, but their import is the sam They tried to find out the absolute religion and their labours were crowne with success, for God gives all that He has to His children if they want have it. It requires a candid, generous, pious and holy heart to feel th beauties of their conclusions.

ভাগবৎপ্রসঙ্গে আরও বলেন,

—The Bhagavat is undoubtedly a difficult work and where it does n relate to picturesque descriptions of traditional and poetic life, its literatu is stiff and branches are covered in the grab of an unusual form of Sanskr Poetry. Commentations and notes are therefore required to assist us in o study of the Book. The best commentator is Sreedhar Swami and the tru interpretor is our great and noble Chaityana Deva.

ভাগবৎ-এর অবদান প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন,

—Atheistic Philosophy of Shankhya, Charbak, the Jains and the Bu dhists shuddered with fear at the heroic approach of the spritual sentimen and creations of the Bhagavat Philosopher.

ভাগবতে ব্রজলীলারও পূর্ণ ব্যাখ্যা করেন তিনি। ভাগবতের সম্বন্ধে অভিধেয় এ প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গেও বিশদ আলোচনা করে জনসাধারণের সামনে এক নবদিগন্তকে উন্মোচ করেন।

তাঁর এই আলোচনা সেদিনের ধর্মসভার মান বৃদ্ধি করেছিল। শ্রোতাদের মনে বৈষ্ণবধ কৃষ্ণতত্ত্ব-ভাগবৎ প্রসঙ্গে এবার জানার পিপাসাও বাড়তে থাকে।

কেদারনাথ সেই প্রথম যেন ধর্মপ্রচারকের ভূমিকা নিলেন তাঁর অজ্ঞাতসারেই। এ যেন তা জীবনদেবতারই অমোঘ নির্দেশ। শুরু হল তাঁর জীবনে এক নবপথ পরিক্রমা। দিনাজপুরে এসে এই পথের নির্দেশ পান তিনি।

একদিকে যেমন দেন—অন্যদিকে নেনও তিনি। এইভাবেই চলে জীবনের পথ পরিক্রম এখানে কেদারনাথের একটি পুত্রসন্তান জন্মায় কিন্তু সেই নতুন অতিথি মারা যায় এখানেই

ভগবতী দেবীও শোকে কাতর, এই সময় খবর আসে কেদারনাথের শ্বশুরমশায়ও যকপু মারা গেছেন। শোকের ছায়া নামে।

কেদারনাথ সপরিবারে বের হলেন ছুটি নিয়ে তীর্থযাত্রায়। আবার এলেন বৃন্দাবনে, মথুরা এবার এসেছেন নতুন চেতনা নিয়ে, এবার আর জ্ঞানের সেই বাধা নেই, ভক্তির স্পর্শে- অনুরাগে আজ অন্তরমন রসাপ্লুত। ব্রজরেণুতে লুটিয়ে পড়েন কেদারনাথ।

যমুনাপুলিনে যেন সেই বংশীধ্বনি কানে আসে—আকাশ বাতাস এখানে মধুময়, মধুময় এই ধরণীর ধূলিকণা। কি আবেশে যেন মন ভরে ওঠে।

আজ সেই পরমপুরুষের উদ্দেশে অকুণ্ঠ প্রণাম জানান

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগৎপতে
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমহোস্তুতেঃ।

আবার সেই পথ চলা। এক হাটে লও বোঝা—শূন্য করে দাও অন্য হাটে। সরকারী চাকরি। বদলি হয়ে এলেন দিনাজপুর থেকে বিহারের সীমান্ত শহর চম্পারণে।

দিনাজপুরের শতসহস্র মানুষ তাদের প্রিয়জনকে বিদায় দেন চোখের জলে। কেদারনাথও বিয়োগব্যথায় ভারাক্রান্ত মন নিয়ে এলেন নতুন কর্মস্থলে।

এও যেন তাঁর জীবনদেবতারই নির্দেশ। অন্তরমনে তখন সেই অপূর্ব অনুভূতির স্পর্শ। চৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীমদ্‌ভাগবত তখন নিত্য সঙ্গী। বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ যা পারেন সংগ্রহ করেন।

চম্পারণে তখন তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। দেখেন ওই অঞ্চলের বেশ কিছু মানুষ একটা বিশাল বটগাছের নীচে ঘটা করে পূজো দেয়। বিশেষ করে সেই এলাকার কিছু দুর্বৃত্ত ডাকাত শ্রেণীর লোকই বেশী ভক্তি সহকারে পূজো দেয়, আর সাধারণ মানুষও পূজো দেয় সেখানে।

জানতে পারেন কেদারনাথ যে তারা বৃক্ষ দেবতাকে নয়, এই গাছে নাকি এক দুর্দান্ত ব্রহ্মদৈত্য থাকে তাকেই পূজো দেয়।

সেই ব্রহ্মদৈত্যের শক্তিও নাকি অপরিসীম। তাই ভক্তিতে নয়, ভয়েই পূজো দেয় সেখানে সাধারণ মানুষও।

ব্রহ্মদৈত্য নাকি তার ইচ্ছামত কাজ করাতে পারে। আর তার প্রভাবও কম নয়।

কেদারনাথ দেখেন যে এক ডাকাতদল ওই অঞ্চলের ত্রাস। তারাই সেই ব্রহ্মদৈত্যের একনিষ্ঠ ভক্ত। মাঝে মাঝে ডাকাতি, রাহাজানির দায়ে তারা ধরাও পড়ে। আদালতেও তোলা হয় তাদের, কিন্তু সেই ব্রহ্মদৈত্যের এমনই প্রভাব যে বিচারকরা পর্যন্ত যে কোন কারণেই হোক সেই ডাকাতদের সাজা দিতে পারেন না।

ফলে তারা খালাস পেয়ে যায়।

ব্রহ্মদৈত্যের পূজোর ঘটা বাড়ে।

ধর্মের নামে এহেন স্বার্থসিদ্ধি আর ভণ্ডামিকে কোন দিনই প্রশ্রয় দেন নি কেদারনাথ। অন্যায়ের, অবিচারের প্রতিকারে যেন অন্তর থেকে শক্তি পান তিনি। ধর্মের নামে এই বুজরুকি তিনি সহ্য করবেন না। ছেলেবেলাতেও তিনি সেই তান্ত্রিকের অগোচরে নিজেও মড়ার খুলিতে দুধ গঙ্গাজল ঢেলে দেখেছিলেন মড়ার খুলি সত্যিই হাসে না—ওসব বুজরুকি।

তিনি ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়াপন্থীদের শাসনের বিরুদ্ধেও মেদিনীপুরে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। ধর্মের এই অবমাননা অপব্যবহার তিনি সহ্য করবেন না। তাই এবারও এই অনাচারের প্রতিকারের উপায় ভাবতে থাকেন। এলাকার সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষও ডাকাতদলের অত্যাচারে ত্রস্ত।

হঠাৎ কি যেন এক নির্দেশ পান তিনি। এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণকে তিনি ওখানে দেখেছেন। খুবই দরিদ্র অথচ শুদ্ধাচারী পণ্ডিত মানুষ। শাস্ত্রজ্ঞও। কেদারনাথ তাঁকেই অনুরোধ করেন।—আপনি তো শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। নিষ্ঠাভরে রামায়ণ পাঠ করেন। আপনি ওই বটবৃক্ষের নীচে বসে শ্রীমদ্‌ভাগবত পাঠ করুন। এতে অনেকের কল্যাণ হবে।

পণ্ডিতমশায় তাঁর অনুরোধে ভাগবৎ পাঠ শুরু করেন সেখানে। কেদারনাথ নিজেই তাঁর কিছু

প্রণামী, সিধে ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন।

ভাগবত পাঠ শুনতে শহরের বেশ কিছু মানুষও আসতে শুরু করেন। সময় পেলে কেদারনাথ নিজেও যান সেই ভাগবত পাঠের আসরে।

মাসাবধিকাল ধরে ভাগবৎ পাঠ চলে—সেই পাঠও শেষ হয়, হঠাৎ দেখা যায় ঝড়ঝাপটা নেই, সেই বিশাল বটগাছটা একদিন সমূলে উপড়ে পড়েছে। আর শাখাচ্যুত ব্রহ্মদৈত্য বাবাও নিরাশ্রয় হয়ে সেখানে থেকে চলে যায় তার ভক্তদের ত্যাগ করে।

আরও দেখা যায়, এতে সেই ডাকাতদলের এবার বিপদ ঘনিয়ে আসে। তাদের রক্ষাকর্তা সেই ব্রহ্মদৈত্য আর নেই। ফলে সেবার তারা ডাকাতি করে হাতেনাতে ধরা পড়তে বিচারকরাও এবার আর দ্বিধা করেন না—তাদের সাজাও হয়ে যায়।

ওই এলাকার সাধারণ মানুষও এবার নিশ্চিন্ত হয়। তারাও বিশ্বাস করে এই অনাচারের প্রতিকার হয়েছে ভগবৎ কৃপাতেই।

এবার শহরের বহু মানুষও ভাগবত পাঠের আয়োজন করে। সাধারণ মানুষও ভাগবৎ মহিমার পরিচয় পায়। তাদের মনও এবার এক নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

শ্রীকৃষ্ণকথা কীর্তন, ধর্মালোচনার সূত্রপাত হয় সেখানে নতুন করে।

ঈশ্বর নিজে তার লীলা প্রকাশ করেন না। সেটা করান ভক্তের মাধ্যমে। তাই ভগবানের কাছে ভক্ত অতি প্রিয়জন। তার মাধ্যমেই তিনি তাঁর স্বরূপ মহিমার প্রকাশ করেন।

শ্রীচৈতন্যদেবও যেন কেদারনাথকেই নির্বাচিত করেছিলেন কয়েক শতাব্দীর পর তাঁর লীলার পুনঃপ্রকাশের জন্যই—তাঁর তত্ত্ব পুনঃসংস্থাপনের জন্য। তাঁকে দিয়ে সেই কাজ করাবার পক্ষে তিনি এগিয়ে যেতে সাহায্য করে চলেছেন 'নেপথ্য থেকে'—দীর্ঘদিন ধরে চলেছে সেই মহান কর্মীর প্রস্তুতি।

চম্পারণে থাকার সময় তাঁর পরিবারবর্গ কিছুদিনের জন্য রানাঘাটে ছিলেন। স্ত্রী ভগবতী দেবী তখন সন্তানসম্ভবা। রানাঘাটেই তাঁর পুত্র রাধিকাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।

কেদারনাথ চম্পারণে থাকার সময় আইন-এর পরীক্ষার জন্যও পড়াশোনা করতে থাকেন। আর ছাপরায় এসে পরীক্ষাও দিয়ে যান। তাঁর জীবনে দেখা যায় পড়াশোনাটা যেন ছিল তাঁর কাছে নেশার মতই। সব কিছু কাজকেই পরম নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতেন, তাই সব কাজেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। সেই সাফল্যে কোন ফাঁকফাঁকি ছিল না। সরকারী কাজের সব দায়িত্ব নিষ্ঠাসহকারে পালন করতেন, তাই উর্ধ্বতন বিদেশী কর্মচারীরাও তাঁকে সমীহ করতেন তাঁর যোগ্যতার জন্য। শ্রদ্ধা করতেন তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্য, মুগ্ধ হতেন তার মধুর ব্যবহারে। সহকর্মীরাও তাঁকে সেই শ্রদ্ধা করতেন।

ইংরেজের আমলে ব্রিটিশ কর্মচারীরা তাঁদের অধস্তন কর্মচারীদের সঙ্গে অনেক সময় প্রভুর মতই ব্যবহার করতেন, কিন্তু কেদারনাথের ক্ষেত্রে সেটা তো ঘটতোই না—বরং শ্রদ্ধাই অর্জন করেছিলেন তিনি তৎকালীন শাসকসমাজের কাছে।

চম্পারণ থেকে ল পাশ করার পর তাকে বদলি করা হল মতিহারী শহরে। সেখানে তখন মিঃ মেটকাফ ছিলেন জেলার পদস্থ কর্মচারী। কেদারনাথ সেখানে যেতে ঠিক চান নি, তাই বদলির জন্য আবেদন করে সেখানে কয়েকদিনের জন্য গেলেন।

মিঃ মেটকাফ তাঁর মত যোগ্য সহকারীকে পেয়ে খুবই খুশী। কিন্তু কেদারনাথের জীবনদেবতার নির্দেশ ছিল অন্যরকম। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁকে নির্বাচিত করেছেন আরও মহৎ কর্তব্য পালন করার জন্য। তাই বোধহয় কেদারনাথের বদলির দরখাস্তও মঞ্জুর হয়ে গেল।

পুরী অতীতেও এক মহৎ তীর্থক্ষেত্র। শহর হিসাবেও তখন গুরুত্ব অর্জন করেছে। আর তার প্রধান কারণ জগন্নাথদেবের মন্দির। সারা ভারতবর্ষ থেকে আসেন হাজার হাজার তীর্থযাত্রী, সরকারী প্রশাসনকেও মন্দির পরিচালনার কাজে সাহায্য করতে হয়। প্রশাসনও দেখতে হয় সেখানে। তাই বিশেষ ভাবে উপযুক্ত একজন প্রশাসক-এর দরকার বোধ করেন কর্তৃপক্ষ পুরীতে। কেদারনাথের নাম—তাঁর পাণ্ডিত্য—বিদগ্ধসমাজে তাঁর পরিচিতির কথা সরকারের বিশিষ্ট কর্মচারীরাও জানেন। তাই সবদিক থেকে যোগ্য বিবেচনা করে কেদারনাথকে পুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট করে বদলির আদেশ দেওয়া হল।

কেদারনাথ ভাবতেও পারেন নি যে এত বড় সুযোগ তিনি পাবেন। এ যেন সেই জীবনদেবতারই নির্দেশ, এতদিন পর পুণ্যধাম পুরীতে তিনি যেতে পেরেছেন যেখানে শ্রীচৈতন্যদেবের বহু লীলাপ্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর পদরজপূতঃ শ্রীধাম অভিমুখে যাত্রা করলেন তিনি, সঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্‌ভাগবত ইত্যাদি। ওসব এখন তাঁর নিত্যসঙ্গী—জীবনবেদ।

পুরীতে এসেই তাঁর প্রথম কাজ হলো পুরী পরিক্রমা। পুরীধামে শ্রীচৈতন্যদেব সপার্ষদ ছিলেন গুণ্ডিচায়—ওদিকে ছিলেন তাঁর পরম ভক্ত হরিদাস, মুসলমান হয়েও তিনি হয়েছিলেন পরম বৈষ্ণব। সেই সিদ্ধবকুল আজও বিরাজমান—বাতাসে ঝরা বকুলের সৌরভ। পুরীধামে। কেদারনাথ হরিদাসের সমাধিমন্দিরে এসে যেন ভাবে বিভোর হন।

রচনা করেন এক অপূর্ব কালজয়ী কবিতা, যা আজ শুধু গৌড়ীয়বৈষ্ণব সমাজেই নয়—বহির্বিশ্বেও আজও স্মরিত হয়। তাঁর ইংরাজীতে রচিত সেই কবিতায় কেদারনাথের অনুপম শ্রদ্ধা আর হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদিত হয়েছে হরিদাস বাবাজীর উদ্দেশ্যে। তার কিছু পংক্তি তুলে ধরা হোল—

—Is there a soul that cannot learn from thee.
That man must give up sect for God ?—
That thoughts of race and sect can ne'er agree
Woth what they call Religion broad ?

He reasons ill who tells that Vaishnavas die
When thou art living still in sound.
The Vaishnavas die to live and living try
To spend a holy life around !

Now let the candid man that seeks to live
Follow thy way on shore of time,
That posterity sure to him will give
Like one song in simple rhyme.

এই কবিতার নামকরণ করেছিলেন—Om Haridas Samadhi. A Saragrahi Vaishnava.

পুরীতে এসে তাঁর এই ভাবের প্রকাশ এবার প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর অনুভূতিতে—বিভিন্ন রচনায়, এবার যেন তাঁর লেখনীও বৈষ্ণব ধর্মকথায় মুখর হয়ে উঠতে থাকে। এ তাঁর জীবনদেবতারই নির্দেশিত পথ। পুরীতে কাজে যোগ দেন।

ওদিকে মতিহারীতে মিঃ মেটকাফ সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছেন কেদারনাথের। কয়েকদিনের জন্য সেখানে জয়েন করেছিলেন কেদারনাথ, সেখানের বাংলোয় তাঁর জিনিসপত্রও রয়েছে। কেদারনাথ তাঁর কাজের লোককে সেখানে মালপত্র আনতে পাঠিয়েছেন পুরী থেকে, কিন্তু মিঃ

মেটকাফ কেদারনাথকে ছাড়তে নারাজ—তাঁকে পাননি, তার লোককেই আটকে রাখেন যাতে কেদারনাথ ফিরে আসেন মতিহারীতে। কিন্তু তখন পুরীতে কেদারনাথ যোগ দিয়েছেন। তাই শেষ অবধি মিঃ মেটকাফ নিরস্ত হলেন।

ঘটনাটি সামান্যই কিন্তু এটি অনুধাবন করলে আমরা জানতে পারি কেদারনাথ সরকারী মহলেও কত প্রয়োজনীয় এবং প্রিয় ছিলেন। এ তাঁর কর্মনিষ্ঠা-মাধুর্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বেরই পরিচয় দেয়।

তখন ইংরেজের আমলে পুরীতে আনা হতো ইংরেজদেরই। দায়িত্বপূর্ণ এ পদ। ইংরেজরাই তখন এদেশীয় কর্মচারীদের উপর কর্তৃত্ব করতেন। তাঁরা কিছু বিশেষ সুবিধাও ভোগ করতেন। কোন এদেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট কোন সাদা চামড়ার বিদেশীদের বিচার করতে পারতেন না। পরে ১৮৮৩ সালে ইলবার্ট বিল পাশ হয়, তাতে এদেশীয় ম্যাজিস্ট্রেটদের সেই বিচারের অধিকার দেওয়া হলো—তবে ওই বিদেশীদের আপত্তিতে একটা সর্ত জুড়ে দেওয়া হলো যে সেই বিচারে জুরী থাকবেন শ্বেতাঙ্গরাই।

তখনও বিদেশীরা এদেশীয়দের তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবেই দেখতো, এদেশীয় ইংরাজী শিক্ষিত সমাজকেও তারা বিকৃত চাহনিতেই দেখতো। তাই তখনকার দিনে কর্মখালির বিজ্ঞাপনেও দেখা যেত

—Wanted Sweepers, Punkha-Coolies and Bhistis for the residents of Saidpur, None but educated Bengali Babus who have passed the University Entrance Examinations need apply.

অর্থাৎ শিক্ষিত বাঙ্গালীবাবুদের তারা ঝাড়ুদার, পাখাটানা কুলি, জল দেবার জন্য ভিস্তিওয়ালার পদেরই যোগ্য বলেই অনেকে ভাবতো।

সেই আমলে ওই বিদেশীদের সামনে কেদারনাথ নিজের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য-সাহস-বাগ্মিতা-কর্তব্যনিষ্ঠার জন্য যোলআনা শ্রদ্ধা-সম্ভ্রমই আদায় করেছিলেন—এ তাঁর জীবনদেবতারই আশীর্বাদ। শ্রীচৈতন্যদেবের অপার করুণাস্নাত সেই মহাজীবন তাই চরম এবং পরম সার্থকতার পথেই অগ্রসর হয়েছিল।

পুরীতে এসে এবার তাঁর অন্তরে প্রবাহিত হল ভক্তির বন্যা। সর্বত্রই যেন দেখেন সেই মহাপ্রভুর লীলাবিলাস, ভক্তির অমৃতধারার প্রবাহ। অথচ তিনি নেই—মন কি বেদনায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

সোজুং নীলগিরিশ্বরঃ স বিভবো যাত্রা চ.সঃ গুণ্ডিচা
তে তে দিগ্বিদিগতাঃ সুকৃতিনস্তাস্তা দিদৃক্ষার্ত্তয়ঃ।
আরামাশ্চ ত এব নন্দনবনশ্রীনাং তিরস্কারিণঃ
সর্বাণেরে মহাপ্রভুঃ তে বিনা শূন্যানি মন্যামহে।

সেই নীলগিরি, সেই বৈভব, সেই গুণ্ডিচা, রথযাত্রা উৎসব সবই রয়েছে, নানা দিক্‌বিদিক থেকে ব্যাকুল তীর্থযাত্রীদের সমারোহ আজও বিদ্যমান, স্বর্গের নন্দনকাননের চেয়েও সুন্দর উদ্যান আজও রয়েছে—কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অবর্তমানে সবই যেন শূন্য মনে হয়।

পুরীধামের ধূলিকণায় আজও ধ্বনিত হয় সেই 'কৃষ্ণনাম'। বৈষ্ণবতীর্থ। মহাপ্রভুকে কুলীনস্বামী প্রশ্ন করেছিলেন

—বৈষ্ণব কাকে বলে?

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন

—যাঁহার দর্শনে মুখে আসে কৃষ্ণনাম।

তাহারে জানিও তুমি বৈষ্ণবপ্রধান॥

নিজেকেও তিনি সেই কৃষ্ণের দাসানুদাসই বলেছেন

—নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো না শূদ্রো
নাহং বর্ণী নঃ গৃহপর্তির্ণা বনাস্থা যর্তিবা।
কিন্তু প্রোদ্যন্ নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃত্যাকে গোপীর্ভর্তুঃ
পদকমলযোর্দাসদাসানুদাসঃ॥

তিনিই বলেছিলেন—আমি ব্রাহ্মণ নই, ক্ষত্রিয়ও নই, বৈশ্যও নই, শূদ্রও নই। আমি ব্রহ্মচারী নই—বর্ণাশ্রমী, বানপ্রস্থ বা সন্নাসীও নই। যিনি নিখিলপরমানন্দপরিপূর্ণ অমৃতসাগর স্বরূপ আমি সেই কৃষ্ণের দাসানুদাস।

কেদারনাথও সেই ভক্তির স্পর্শ লাভ করে ধন্য। তাঁর সেই অনুভূতির স্পর্শ ফুটে ওঠে তাঁর তখনকার কালের ইংরাজী কবিতাতে।

সারগ্রাহী বৈষ্ণব কবিতায় সেই প্রেমভক্তির কথাই বলেন—

—O Love ' Thy Power and spell benign
Now meet my soul to God !
How can my earthly words describe
That feeling soft and broad.

॥ ২০ ॥

পুরীতে এসে তিনি যেন রত্নখনির সন্ধান পেলেন। এখানে বহু মঠে বহু প্রাচীন পুঁথি, ধর্মপুস্তকের সংগ্রহ রয়েছে। ষড় গোস্বামীর রচনা আর বৈষ্ণব ধর্মের মূল্যবান গ্রন্থ তো আছেই—আর পুরীতে রয়েছেন বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত। এই সুযোগ গ্রহণ করলেন কেদারনাথ।

ওদিকে পুরীর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবেও তার গুরুদায়িত্ব তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে, শ্রদ্ধাভরে পালন করে চলেছেন। পুরীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে সারা ভারতের মানুষের মনে একটি ধর্মচেতনা প্রবাহিত হয়। তীর্থযাত্রীরা আসেন দেশ-দেশান্তর থেকে।

তাই সরকার থেকে এখানের প্রশাসকদের উপর কড়া নির্দেশ ছিল মন্দিরের শুচিতা—পূজা এসব যেন ঠিকমত বজায় থাকে, পাণ্ডা পুরোহিত তীর্থযাত্রীদের সম্পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা যেন করা হয়। কোনমতেই পূজাপাঠে বিঘ্ন না ঘটানো হয়। ইংরেজ শাসনের আগে এদিকে ছিল মারাঠাদের রাজত্ব। মন্দির কর্তৃপক্ষ মারাঠা রাজাদের সামান্য খাজনা মাত্র দিতেন। ইংরেজ সরকারও নির্দেশ দেন মারাঠাদের যা দেওয়া হতো বার্ষিক খাজনা হিসাবে, তাঁরাও মন্দির থেকে মাত্র সেইটুকু নেবেন। তার বেশী কোন অর্থ নেওয়া হবে না। ইংরেজ সরকার ভারতীয়দের এই ধর্মবিশ্বাসে বাধার সৃষ্টি করতে চান নি নিজের স্বার্থেই।

তাই পুরীর প্রশাসকদের এই সব দিকেও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হতো অন্যসব কাজ ছাড়াও।

কেদারনাথ নিজে নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ যোগ্য প্রশাসক। তাই তাঁরও সুনাম হয় এখানে।

কর্তব্য বলতে তিনি বুঝতেন সংসারকে বাদ দিয়ে কোন কর্তব্যই সুষ্ঠুভাবে পালন করা সম্ভব নয়, কারণ তিনি গৃহী। সংসারের প্রতি তো তাঁর কর্তব্য রয়েছে। সংসারের সেবা না করলে সেটাও সেবাঅপরাধ বলে গণ্য হবে।

পুরীতে আসার পর রানাঘাট থেকে তিনি তার বৃদ্ধা মা জগৎমোহিনী দেবী, স্ত্রী ভগবতী দেবী আর সন্তানদেরও নিয়ে এলেন। সন্তান বলতে তখন অন্নদা, রাধিকা, সাধু আর মেয়ে কাদম্বিনী

ছাড়াও দু-একজন আত্মীয়ও আছেন। কাজের শেষে সপরিবারে শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরে যান দর্শন করতে।

বৃদ্ধা জগৎমোহিনীও এখন শেষ বয়সে শ্রীক্ষেত্রে এসে ধন্য হয়েছেন। তাঁর সন্তান এখন কৃতি। সেই দুঃখের দিন দেবতার দয়ায় তাঁদের কেটে গেছে।

কেদারনাথের অন্যতম সন্তান কমলাপ্রসাদ এখানেই জন্মগ্রহণ করে। সংসারও চলেছে মসৃণভাবে।

তৎকালীন কমিশনার মিঃ টি ই থমসনও এখন কেদারনাথকে পুরীতে প্রশাসক হিসাবে পেয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন। আগে এখান থেকে, মন্দির থেকেও সব সময়, নানা অভিযোগ যেত! তিনি তো বিব্রত হতেন, সেসব সমাধানের জন্য তাঁকেও দৌড়ঝাঁপ, তদন্ত এসব করতে হতো।

কেদারনাথ আসার পর থেকে সে সব অভিযোগ আর আসে না। কেদারনাথ তৎপর যোগ্য প্রশাসক, নিজেও প্রতিদিন মন্দিরে এসে পাণ্ডা পুরোহিতদের সঙ্গে কথা বলেন। ভক্তিনম্র প্রণাম জানান দেবতাকে। কোন সমস্যা থাকলে সুষ্ঠু আলোচনার মাধ্যমেই তার মীমাংসা হয়ে যায়।

মন্দিরের পুরোহিত-পাণ্ডারাও কেদারনাথের ভক্তিতে আস্থাবান। মন্দিরের একপাশে মুক্তিমণ্ডপ। সেখানে বসে পাণ্ডা পুরোহিতরা নানা ধর্মালোচনা করতেন, নির্দেশ দিতেন। কেদারনাথ সেখানেও যেতেন শ্রদ্ধানম্র চিত্তে, তাদের ধর্মালোচনা শুনতেন।

ফলে পুরোহিত সম্প্রদায়ও তাঁর উপর খুশী ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর ধর্মভাব এবং পড়াশোনার ব্যাপারও তাঁরা জেনেছেন।

কেদারনাথ পুরীতে এসে সেই পড়াশোনা আরও গভীর ভাবে শুরু করেন।

এখানে প্রখ্যাত পণ্ডিত গোপীনাথ পণ্ডিতের কাছে তিনি শ্রীধর স্বামীর টীকা সম্বলিত শ্রীমদ্ ভাগবৎ পাঠ শুরু করলেন। ভাগবতের গূঢ়তত্ত্ব—অর্থ তাঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। পণ্ডিত হরিহর দাস-এর কাছে শুরু করলেন ন্যায়শাস্ত্র পড়তে, নৈয়ায়িক হিসাবে হরিহর দাসের খুবই সুনাম ছিল, আর মার্কন্ড্রেয় মহাপাত্র নবদ্বীপ কাশীধামে বেদান্ত পাঠ করেছিলেন, কেদারনাথ তাঁর কাছে শুরু করলেন বেদান্ত পাঠ করতে। এই সঙ্গে সংস্কৃত পাঠও চলতে থাকে। বিদ্যাসাগর মশায় আর স্কুলে ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী মশায় আর বড়দাদা দ্বিজেন ঠাকুরের কাছে অধীত সামান্য সংস্কৃতের পুঁজি নিয়ে বৈষ্ণবশাস্ত্রকে জানা সম্ভব নয়। তাই তাকে জানতে গেলে, ষড় গোস্বামীদের রচনার সঙ্গে পরিচিত হতে গেলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের জ্ঞান অর্জন করতে গেলে সংস্কৃতে জ্ঞান দরকার। তাই সংস্কৃত কাব্য, ব্যাকরণ পাঠ আবার নতুন করে শুরু করলেন।

রাত-দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটে বিভিন্ন পড়াশোনা—লেখা, পঠন-পাঠনের মধ্য দিয়ে। সরকারী কাজেও অনেক দর্শনার্থী আসেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে হয়। তারপর দশটায় অফিস আদালতে যেতে হয়।

বৈকালেও অবকাশ নেই। মন্দিরের কাজ, ধর্মসভা—রাত্রে এসে পূজা প্রার্থনা সেরে নৈশাহার করেন। সামান্য রুটি-সবজী, সঙ্গে একটু দুধ। তারপর ঘণ্টা কয়েক ঘুমিয়ে মধ্যরাত্রে উঠে আবার লেখাপড়ার কাজে বসেন। চলে শেষ রাত্রি অবধি, তারপর আধঘণ্টা বিশ্রাম নিয়ে ভোরে উঠে আবার দৈনন্দিন কাজ শুরু হয়।

এমনি দিনে জীবনদেবতা তাঁকে আবার এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় ফেললেন। ধর্মের গোঁড়ামি-ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তাঁকে রুখে দাঁড়াতে হল আবার। এর জন্য এবারও তাঁর সাহসের অভাব হয় নি। অন্তরদেবতাই সেই সাহস যুগিয়ে দেন। তিনি এর আগেও ধর্মের নামে অনাচার-এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। মেদিনীপুরে তাঁর বিশ্বাসের মর্যাদা রাখতে দৈহিক নির্যাতনের সম্ভাবনাকে তুচ্ছ করেছিলেন। চম্পারণে সেই ডাকাতদলের হুমকিকে তুচ্ছ করে তাদের উপাস্য সেই ব্রহ্মদৈত্যের

ভূতকেও সযুত করেছিলেন, ন্যায়ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এবারও সেই সংঘাতই এল আরও বৃহত্তর রূপে, কিন্তু কেদারনাথ তার সঙ্গেও মোকাবিলা করেছিলেন অকুতোভয় চিত্তে।

উড়িষ্যাতে চৈতন্য-প্রভাব ছিল অপরিসীম। বহুজন শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে জগন্নাথ দাস নামে এক ভক্তও আসে।

চৈতন্যদেব তাকে নির্দেশ দেন—তুমি হরিদাসের আশ্রয় নাও, সেই-ই তোমাকে পথনির্দেশ দেবে।

হরিদাস পরম বৈষ্ণব—চৈতন্যদেবের অনুরাগী ভক্তদের অন্যতম। আসলে জাতিতে যবন, তাই পরমভক্ত হরিদাস জগন্নাথ মন্দিরে যেতেন না, দূর থেকে মহাদেবতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি জানাতেন। আর যে ভাবেই হোক প্রতিদিন তাঁর কাছে জগন্নাথ দেবের প্রসাদও পৌঁছে যেত, প্রসাদ না পেলে তিনি উপবাসীই থাকতেন, তাই প্রসাদ ঠিকই পৌঁছে যেত তাঁর কাছে।

জগন্নাথ দাস জানতেন হরিদাসের প্রকৃত পরিচয়, তাই ভক্ত হয়েও চৈতন্যদেবের এই নির্দেশ না মেনে নিজেই ক্রমশ নিজেকে এক সম্প্রদায় গড়ে তার ধর্মগুরু—পরম সাধক সেজে বসলেন। সমাজের কিছু ভ্রান্ত ধারণার মানুষেরও অভাব নেই, তারা জগন্নাথ দাসের এই ধর্মমতে সায় দিল—যোগ দিল নিজেদের স্বার্থে। আর বেশ বাড়াবাড়িই শুরু করলো তারা।

তাই অনেকেই তাদের 'অতিবাড়ি' সম্প্রদায় বলেই আখ্যা দিল। তাতে অবশ্য তাদের বাড়াবাড়ি থামল না। সমাজের অনেক ধনী—উড়িষ্যার সামন্ত রাজাদের অনেকেই ভয়ে হোক ভক্তিতে হোক তাদের দলে ভিড়তে বাধ্য হলো। ক্রমশ উড়িষ্যার বহু ক্ষেত্রে 'অতিবাড়ি' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা বেড়েই চললো।

তারা তন্ত্রমতে যোগ অভ্যাস করে অনেকেই বেশ কিছু সস্তা সিদ্ধাইও পেয়ে গেল, সাধারণ অজ্ঞ মানুষ আর কিছু অত্যাচারী সামন্ত রাজা-জমিদাররাও তাদের সাহায্য করতে শুরু করলো।

তারা নিজেদের সম্প্রদায়ের কথা নিয়ে কিছু বই-পুঁথিও প্রকাশ করে, তাতে তারা লেখে চৈতন্যদেব আবার প্রকট হবেন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও আবার ধরাধামে অবতীর্ণ হবেন শিষ্টের পালন আর দুষ্টের দমন করতে। সেই মহাপ্রলয়ের কালও সমাগত। সারা দেশে আবার দেবত্বের প্রতিষ্ঠা হবে।

তাদের এই সব জাল গ্রন্থের লিখিত কথামত এখানে ওখানে এই সম্প্রদায়ে অনেক দেবতার আবির্ভাব হতে থাকে। এক এক জন নিজেকে কেউ শিব—কেউ ব্রহ্মা—কেউ চৈতন্যদেবের অবতার সেজে নানাভাবে সাধারণ মানুষকে প্রতারণা করতো আর সমাজে দাপিয়ে বেড়াতো।

তেমনি এক অবতারের আবির্ভাব হলো ভুবনেশ্বরের কাছে সারদীয়াপুরের জঙ্গলে, তার নাম বিষকিষণ। জাতিতে খণ্ডায়েৎ সে। উড়িষ্যার একশ্রেণীর উপজাতি।

এই বিষকিষণ যোগসাধনার দ্বারা কিছু সস্তা সিদ্ধাই অর্জন করেছিল। সে জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করেও অক্ষত দেহে বের হয়ে আসতো। জটা দিয়ে আগুনের শিখাও বের করতো সে।

এই সব বিচিত্র কাণ্ডকারখানা দেখে ওই অঞ্চল কেন দূরদূরান্তের বহু মানুষ তার কাছে আসতে শুরু করে। নানা জনের নানা প্রার্থনা। আসে বহু দুরারোগ্য রোগীও।

বিষকিষণ তাদের স্পর্শ করে—কাউকে লতাপাতা কিছু দেয়—সেই ওষুধেই নাকি অনেকে সেরে ওঠে। আর বিষকিষণের অপূর্ব দৈবশক্তির কথা প্রচারিত হয় দিকে দিকে। ক্রমশ সাধারণ মানুষই নয়—এই অঞ্চলের জমিদার, রাজাদের অনেকেই বিষকিষণের কাছে আসে। আর বিষকিষণও যৌগিক ক্ষমতায় তাদেরও বশীভূত করে, এহেন দৈবী শক্তিমান বিষকিষণকে খুশী

করার জন্য তারা অর্থ জমি এসব উপঢৌকন দেয়। অনেকে আবার প্রভুর একান্ত সেবার জন্য সুন্দরী মেয়েদেরও পাঠায়।

এই বিষকিষণ অতিবাড়ি সম্প্রদায়ের কোন পুঁথিমত নিজেকে এবার স্বয়ং বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষণা করে। তার দুই সহচর—যোগ্য চালাও জুটে যায়। তাদেরও ব্রহ্মা ও শিবের অবতার সাজিয়ে বিষকিষণ লীলা শুরু করে।

তার চ্যালারা ধনী সমাজ, সামন্ত রাজাদের নানারকম ভয় দেখায়।—স্বয়ং চতুর্ভুজ বিষ্ণু অবতার উনি, ওঁকে তৃপ্ত না করলে তোমাদের সর্বনাশ হবে।

সুতরাং অর্থ—সম্পদ—ভোগবিলাসের সামগ্রী সবই যোগান দেয় তারা আর বিষকিষণ লীলা চালিয়ে যায়। সারদীয়াপুরের জঙ্গলে তার বিরাট মন্দির তৈরী হয়। ভক্তও জুটে যায় অনেক। সেখানে তারা মহাবিষ্ণুরূপী বিষকিষণের নানা লীলার আস্বাদন করে।

সারা এলাকার বহু মানুষও তার এবং তস্য চ্যালাদের অত্যাচারে, শোষণে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু ওই দৈবশক্তিমান মানুষটার ওই অগ্নিশাসনের ক্ষমতা মারণ-বাণের ভয়ে সবকিছুই মুখ বুজে সহ্য করতে বাধ্য হয়।

সাধারণ মানুষের কাছে তার প্রভাব প্রতিষ্ঠার কথা তখনকার সরকারের নজরেও আসে। এহেন বিষকিষণ প্রচার করতে থাকে—এবার যথাকালে মহাবিষ্ণু প্রকট হবেন সর্বশক্তি নিয়ে। সেই শক্তির তেজে উড়িষ্যা থেকে ইংরাজ শাসকরাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। সে আবার এখানে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে।

এসব ঘোষণার কথাও সরকারের কানে যায়। সরকারও ক্রমশ এই অবতারকে নজরে রাখতে থাকে। বিষকিষণ এবার ঘোষণা করে—বিষ্ণু অর্থাৎ ভগবান এবার রাসলীলা করবেন। তাই শত গোপিনীর দরকার। অর্থাৎ স্থানীয় ভদ্রসমাজের বৌ-মেয়েদের উপরও প্রভাব বিস্তার করে নিজে যে পরমপুরুষ সেইটাই প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাই নির্দেশ যায়—সব বৌ-ঝিদের আসতে হবে তার রাসলীলার রাত্রে। নববৃন্দাবন গড়বে সে।

এবার স্থানীয় ভৃঙ্গারপুরের কিছু ধনী ব্যক্তিদের টনক নড়ে। তাদের মান-ইজ্জৎ নিয়ে এবার টানাটানি শুরু করেছে বিষকিষণ।

তারা এইবার সমবেতভাবে এই সামাজিক অনাচারের প্রতিকারের জন্য কমিশনার মিঃ র‍্যাভেনশ'র কাছে দরখাস্ত করে।

কমিশনার সাহেবের দপ্তরে বিষকিষণ সম্বন্ধে—তার এই বিষ্ণুমূর্তি ধরে ইংরেজদের তাড়িয়ে রাজ্য দখল করার খবরও ছিল। লোকটার সাধারণ মানুষের উপর প্রভূত প্রভাব, কিছু গোলমাল বাধানো তার পক্ষে অসম্ভব নয়। সরকার তাই সচেতন ছিল। এবার জনসাধারণের কাছ থেকে এইসব অভিযোগ পেতেই কমিশনার সাহেব পুরীর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ওয়াটসনকে নির্দেশ দেন বিষকিষণকে অ্যারেস্ট করে এনে এইসব অভিযোগের বিচার করে এইসব গুজব ছড়িয়ে সমাজের, দেশের শান্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা এবং জনসাধারণকে প্রতারণার জন্য সমুচিত শাস্তি দিতে হবে।

মিঃ ওয়াটসনও বিচক্ষণ ব্যক্তি। হিন্দু ধর্মমতের কোন শাখার উপর বিদেশী হয়ে হস্তক্ষেপ করতে ঠিক চান না।

সেদিক থেকে কেদারনাথই যোগ্য ব্যক্তি। এখানের পণ্ডিত সমাজের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। হিন্দুধর্মেরই লোক। আর এই জটিল পরিস্থিতিকে তিনিই সামাল দিতে পারবেন। এসব ভেবেচিন্তে এবার মিঃ ওয়াটসন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেদারনাথকেই অনুরোধ করেন বিষকিষণের কেসটা হাতে নিতে এবং কমিশনারের নির্দেশমত কাজ করতে।

কেদারনাথও এর মধ্যে বিষকিষণ প্রসঙ্গে কিছু খবরাখবরও নিয়েছেন। তাঁর কাছে এসব কিছুই বাড়াবাড়ি আর অন্যায় বলেই মনে হয়। ধর্মের মূলতত্ত্ব তখন কিছু জেনেছেন, সেই জ্ঞান দিয়েই বিচার করে তাঁর মনে হয় ধর্মকে বেসাতি করে এই বিষকিষণ যা করছে তা অন্যায়। এর মুখোশ তিনি খুলে দেবেনই। সমাজের বুকে এই অনাচার, ভ্রষ্টাচার চলতে দেবেন না।

এসবের প্রতিকারই করবেন।

তাই এই বিষকিষণকে অ্যারেস্ট করে আনতে হবে, তার বিচারও করবেন। কিন্তু বিষকিষণের ভক্ত-অনুচরদের সংখ্যাও কম নয়। কিছু গোলমাল করতে পারে তারা।

সেইমত তৈরী হয়েই গেলেন কেদারনাথ। সঙ্গে পুলিশফোর্সও রয়েছে।

তাদের জঙ্গলের বাইরে রেখে এক সন্ধ্যায় কেদারনাথ গেলেন জঙ্গলের মধ্যে বিষকিষণের মন্দিরে। মন্দিরে তখন যজ্ঞ চলেছে। অনেক ভক্তেরও সমাগম হয়েছে। জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের আগুন থেকে বের হয়ে আসছে বিষকিষণ। দীর্ঘ দেহ—মাথায় জটা। কেদারনাথকে দেখে চাইল। কেদারনাথও নমস্কার করে নিজের পরিচয় দিতে সে বলে।

—বাবু, তুমি বাঙালী ও সরকারের বিশিষ্ট কর্মচারী, তুমি কি মানসে এই রাত্রিকালে এখানে আসিলে?

(এই কথোপকথন কেদারনাথের স্বলিখিত রচনা থেকেই সংগৃহীত)

ডেপুটি—আপনার নাম বহুদূর প্রসারিত হইয়াছে, সেই নামের আকর্ষণ আমাকে এখানে আনাইছে।

যোগী—তবে তুমি আমার ভক্ত? আমাকে ভক্তি উপহার দিতে আসিয়াছ, তাহাই বল! ভাল ভাল, আমি তোমার উপর বড় সন্তুষ্ট হইলাম। কিছু উপদেশ শুনিবে?

ডে—আজ্ঞা করুন।

যোগী—তুমি যখন আমার ভক্ত... তখন আমার উদ্দেশ্য তোমায় কিছু বলা আবশ্যক।... আমি ক্ষীরোদ সমুদ্রে শয়ান ছিলাম। হিন্দুদের উপর ম্লেচ্ছগণ বড় অত্যাচার করিতেছে দেখিয়া মনু আমার নিদ্রাভঙ্গ করিয়া অবতরণ করাইয়াছেন। আমি শীঘ্রই ম্লেচ্ছ নিধন করিব। এই দেখ এই মালিকা সর্বত্র প্রচার করিয়াছি।

এই বলিয়া বিষকিষণ এক খণ্ড তালপত্র ডেপুটিবাবুর হস্তে প্রদান করিলেন। তাহাতে লিখিত ছিল ঃ

—বনেরে অছি বিষকিষণ!... গুপ্তেরে অছি ন জানই আন। ১৩ মীনেরে আরম্ভিবে রণ। চতুর্ভূজ হোই নাশিব ম্লেচ্ছগণ...

পাঠ করিয়া ডেপুটিবাবু কহিলেন—উত্তম, তাহাতে কি হইবে?

যোগী—আবার ভারতকে হিন্দুরাজ্য করিব।... তোমাকে একটি বিশিষ্ট পদ দিব। এমত ভরসা করি, তোমাকেই উড়িষ্যার শাসনের ভার দিতে পারিব। কেমন, তুমি শাসন করিতে প্রস্তুত আছ?

ডেপুটিবাবু মনে মনে কহিলেন—এরূপ প্রলাপ মন্দ নহে। প্রকাশ্যে কহিলেন—

—শ্রীভগবান করাইলে কে কি না করিতে পারে? মহাশয়ের ইচ্ছাতেই তো সব হইতেছে।

যোগী—ভাল, ভাল। তুমি আমার খুব ভক্ত দেখিতেছি।...অবশ্য এখন আমার কথা সব গোপন রাখিবে।

ডেপুটি—শ্রীপুরীক্ষেত্রে সাক্ষাৎ শ্রীজগন্নাথদেব বিরাজ করিতেছেন, সে স্থান ত্যাগ করিয়া এ অরণ্যে আশ্রয় করিয়াছেন কেন?

যোগী—পুরীতে লোকে কাঠ লইয়া উন্মত্ত হইয়া আছে, যথার্থ ঈশ্বরকে (আমাকে) জানে না।

এই জন্য এই স্থানে আত্মপ্রকাশ করিব।

যোগীর প্রগলভতায় ডেপুটিবাবু শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন, আপনি মহাপ্রভুকে জানেন কি?

যোগী—হ্যাঁ, নবদ্বীপে তাহার বাড়ি ছিল। সন্ন্যাসী হইয়া পুরীতে আসিয়া বাস করে। সে আমার ভক্ত ছিল, তুমি যেমন আমার ভক্ত।... আমি লোকের প্রত্যাশা করি না। মহাবিষ্ণু মনুষ্যের শক্তির ভিখারী নয়—নিজেই সে যথেষ্ট শক্তিমান।

(—সজ্জনতোষিণী পত্রিকা)

কেদারনাথ ওই ভণ্ড যোগীর ওইসব প্রলাপ শুনে নিজেকে সামলে কোনমতে বের হয়ে এলেন। তার ওইসব সস্তা সিদ্ধাই কেদারনাথের মত আধ্যাত্মিক জগতের উচ্চমার্গের মানুষের কাছে মূল্যহীন—প্রতারণা বলেই মনে হয়। ওই লোকটার সম্বন্ধে তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে গেছে। এবার সেই সিদ্ধান্ত কার্যে পরিণত করতে হবে।

ওই উদ্ধত প্রতারককে ধরার আগে এ সম্বন্ধে আরও কিছু তদন্ত করতে চান।

সারদীয়াপুরের জঙ্গলের বাইরের মাঠে তাঁদের তাঁবু পড়েছে। পুলিশ ফোর্সও এসেছে তাঁর সঙ্গে। বিষকিষণের খেলা কাল রাতে কিছু দেখেছেন তিনি।

তাকে তার দৈবশক্তির প্রভাব দেখাবার জন্যই তার সামনে বিষকিষণ কিছু রোগীদের ওষুধ দিয়েও সুস্থ করে তোলে, কাউকে দেয় হোমের বিভূতি—নানা কিছু।

কেদারনাথ এসবে ভোলেন নি। জানেন এ নীচস্তরের রোগীদের তুচ্ছ সিদ্ধাই। এর সঙ্গে উচ্চস্তরের আধ্যাত্মিক অনুভূতির কোন যোগই নেই। এসব লোকদেখানো ভড়ং মাত্র।

তবু যোগীর সম্বন্ধে খোঁজ নিতে যান তিনি আশপাশের গ্রামের মানুষদের কাছে। তাদের মতামতও জানতে চান! এদের অনেকেই বিষকিষণের অত্যাচারের শিকার। তারা এবার পদস্থ সরকারী কর্মচারীর কাছে সব কথাই জানায়, ওই ভণ্ড সাধুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে চায়।

এবার কেদারনাথ তার কর্তব্য স্থির করে ফেলেন। পুলিশ ফোর্স সঙ্গেই আছে, তাদের নিয়ে এবার তিনি জঙ্গলের মধ্যে মন্দিরে গিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে একশো সশস্ত্র পুলিশ—কয়েকজন ইন্সপেক্টার, একজন পুলিশ সুপারও রয়েছে।

সকালে তখন মন্দিরে ধুমধাম করে পূজা-উৎসব চলছে। প্রায় হাজারখানেক ভক্ত সেখানে উপস্থিত। তারা ভাবেনি যে বেয়োনেট বন্দুক উঁচিয়ে এইভাবে পুলিশবাহিনী এখানে হানা দেবে।

পুলিশকে তখন গ্রামের সাধারণ মানুষ সমীহ করতো। তারা এইসব কাণ্ড দেখে একে একে সরে গেল। মন্দিরে রইল বিষকিষণ আর তার কয়েকজন চ্যালা—অনুচর।

বিষকিষণ এতক্ষণ এসব দেখছিল। সে এবার শুধোয়—এসব কি হচ্ছে?

কেদারবাবু বলেন—তোমাকে সরকারের হুকুমে অ্যারেস্ট করা হল। তোমাকে আমার সঙ্গে পুরী যেতে হবে।

বিষকিষণ এবার গর্জে ওঠে।

—সরকার! কে সরকার? আমি নিজেই ভগবান। তোমার এই সরকারের হুকুম মানি না। আমি ইচ্ছা করলে এখুনি ত্রিভুবন ধ্বংস করে দিতে পারি, তা জানো? আমাকে চেন নি?

বিষকিষণের মূর্তি তখন বদলে গেছে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুনের শিখা বের হয়। মাথার জটাও খাড়া হয়ে গেছে—তার থেকে আগুন বের হয়। সে এক বীভৎস মূর্তি। সঙ্গের পুলিশবাহিনীও তার ওই মূর্তি দেখে চমকে ওঠে। এই অস্বাভাবিক দৃশ্য তারা এর আগে কখনও দেখে নি। তারাও ভয় পেয়ে গেছে।

কিন্তু কেদারনাথ এতটুকু ভয় পান নি। তিনি প্রকৃত ভক্ত—তাঁর বিশ্বাস মনের জোর অনেক বেশী। অন্যায় আর ভণ্ডামির এই মুখোশকে তিনি চেনেন। তাই এই দৃশ্য দেখে স্থির কণ্ঠে বলেন,

—বিষকিষণ, তোমার এই লোকদেখানো ম্যাজিক দিয়ে আমাকে ভোলাতে পারবে না। তুমি ঈশ্বরের অবতার নও—তুচ্ছ মানুষ মাত্র। ওই সব খেলা আমার কাছে দেখাবে না। তুমি ঈশ্বরকে সবচেয়ে বেশী অপমান করেছ, তাঁর সঙ্গেও প্রতারণা করেছ। ওসব চালাকি বন্ধ করো!

কেদারনাথের কণ্ঠে একটা জোর বিশ্বাস আর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। সৎ ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের এই নির্ভীক তেজস্বী কণ্ঠস্বরে বিষকিষণের মত সাজা সাধুও থমকে যায়।

কেদারনাথ বলেন—তোমাকে পুরী যেতে হবে। ভালো কথায় না যাও—আমি জোর করতে বাধ্য হবো। তোমার কোন শক্তি নাই যে আমাকে বাধা দেবে। তাই বলছি ওসব বুজরুকি বন্ধ করে পুরী চলো!

এর মধ্যে গ্রাম থেকে গরুরগাড়িও আনানো হয়েছে। ওকে বন্দী করার আয়োজন সব শেষ। বিষকিষণও এবার থেমে গেছে। এই ডেপুটিবাবু যে সহজ লোক নয় তা বুঝেছে সে। তাই বলে—আমি ইচ্ছা করলে ত্রিভুবন ধ্বংস করতে পারি, কিন্তু সেই সর্বনাশ করবো না। তোমার কথামত যাচ্ছি। তবে তোমাকেও সাবধান করছি—এ তুমি ভালো কাজ করছ না।

কেদারনাথ জানতেন এমনি বাধা কিছু আসবে। হয়তো ওর অসংখ্য ভক্ত অনুগতরা বাধা দিতে পারে। তাই তৈরী হয়েই এসেছিলেন। এবার সেইমত বিষকিষণকে অ্যারেস্ট করে গাড়িতে তুলে পুরীতে আনলেন। বন্দী সাপের মত গর্জাচ্ছে বিষকিষণ।

লোকটা যে শয়তানের অবতার সেটা বুঝেছেন কেদারনাথ। ওর অসংখ্য চর, অনুচরও আছে, তাদের মধ্যেও খবর হয়ে গেছে। এ নিয়ে বেশ কিছু ভক্তদের মধ্যেও আন্দোলন হতে পারে, সেই ভয়েই বিষকিষণকে এনে পুরী জেলে নির্জন কামরায় বন্দী করে রাখা হোল আর জেলখানার পাহারাও আরও জোরদার করে তোলা হলো। পুলিশ কর্তৃপক্ষও সজাগ থাকলো যাতে কোন রকম আন্দোলন না হতে পারে।

বিষকিষণকে যখন অ্যারেস্ট করতে যান কেদারনাথ তখন তার দুই চ্যালা সেই ব্রহ্মা আর শিবের দুই অবতারও ব্যাপারের গুরুত্ব বুঝে এক ফাঁকে আশ্রম থেকে পালিয়ে গেছল। তাদেরও ধরা দরকার।

চারিদিকে হুলিয়া বের করা হলো। তারা ধরা পড়লো 'কোদার'-এর এস-ডি-ও মিঃ টেলারের হাতে। তাদেরও বন্দী করে পুরী জেলে পাঠানো হলো।

বিষকিষণ ভাবতে পারে নি যে তাকে পুরীতে এনে জেলের কুঠুরীতে এইভাবে বন্দী করে রাখা হবে। সে এখানে এসে অনশন ধর্মঘট শুরু করলো। খাবার এমনকি জল অবধি স্পর্শ করে না।

কেদারনাথবাবু জেলের মধ্যে এসে তাকে নানা কথা বলেন—ওকে খাবার জন্য অনেক অনুরোধ করেন, তবু সে অনশনও ভঙ্গ করে না, কেদারনাথের উপদেশেও কর্ণপাত করে না।

এদিকে পুরী জেলার এখান ওখানে—নানাস্থানে বিষকিষণের সম্প্রদায়ের লোকজন, তার অনুগত চ্যালারাও বসে নেই। তাদের গুরুদেবের উপর এত বড় অন্যায় অত্যাচার তারা নীরবে সহ্য করবে না।

তারা জনমত গড়ে তুলতে থাকে—অজ্ঞ গ্রামবাসীদের উত্তেজিত করে চলেছে, চাঁদা তোলার কাজও শুরু হয়। তারা সেই টাকা দিয়ে উকিলও ঠিক করল, এই মামলা তারাও লড়বে।

বেশ কিছু লোকও জমায়েত হতে থাকে। একটা আন্দোলনই গড়ে তোলে বিষকিষণের অনুরাগীর দল। তারা তখনও বিষকিষণকে দেবতা বলেই জানে।

কেউ বলে—তাকে বন্দী করা যাবে না। দেখবে সূক্ষ্ম শরীরে তিনি জেলের বাইরেই চলে

আসবেন। তার মত দেবতাকে আটকে রাখার মত জেল এখনও তৈরী হয়নি।

কিন্তু তা হয় না দেখে এবার তারাও মামলা লড়বার জন্যই তৈরী হয়।

কেদারনাথও মামলা তোলেন আদালতে।

বিষকিষণ এবার বুঝেছে কেদারনাথ তাকে সাজা দেবার ব্যবস্থাই করতে চলেছেন।

বেশ রেগে উঠে বলে সে—বাবু আমাকে শাস্তি দেবার চেষ্টা করবেন না। যদি এই চেষ্টা বন্ধ না করেন আপনার সর্বনাশ হবে। জেনে রাখবেন কিছুই আপনার থাকবে না। বাড়ি গিয়ে আজই বুঝতে পারবেন—সেই সর্বনাশের সূচনাও হয়ে গেছে।

কেদারনাথ এসব কথায় কান না দিয়ে পরদিন থেকেই আসামীকে আদালতে তোলার ব্যবস্থাই করেন।

সেদিন কাজের পর বাড়ি ফিরে চমকে ওঠেন কেদারনাথ। সকালেও তার সাতবছরের মেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ ছিল। খেলাধূলা করছিল। হাসিখুশী মেয়েটা দুপুর থেকেই জ্বরে শয্যাগত। দারুণ জ্বর, মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে।

বাড়িতে স্ত্রী ভগবতী দেবীর চোখে জল। বৃদ্ধা মাও কাঁদছেন নাতনীর ওই অবস্থা দেখে।

শহরের মধ্যে গণ্যমান্য ব্যক্তি কেদারনাথ। এদেশী ডাক্তার মায় ডিস্ট্রিক্ট মেডিক্যাল অফিসার ডাক্তার ওয়াটসনও আসেন।

মেয়ের সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থাও করা হয়।

কেদারনাথের প্রিয় কন্যা। তিনিও শ্রীকৃষ্ণের চরণে কাতর প্রার্থনা জানান : মেয়েকে সুস্থ করে দাও ঠাকুর।

সারা শহরের লোক যোগী বিষকিষণকে যে তিনি অ্যারেস্ট করে এনেছেন বিচারের জন্য একথা জেনেছে। সেই সাধুকে ধরে আনার খবর কেদারনাথের স্ত্রী ভগবতী দেবী, মা জগৎমোহিনীও জানেন, তাঁরাও শুনেছেন লোকমুখে বিষকিষণের বিরাট ক্ষমতার কথা।

তাই তাঁদেরও মনে হয়, এসব বিপদ ঘটেছে ওই সাধুকে অ্যারেস্ট করার জন্য, তাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্যই।

তাঁরাও ভীত হয়ে পড়েন।

অবশ্য ডাক্তারদের চিকিৎসায় আর সময়মত সঠিক ওষুধ পড়ার জন্য কাদম্বিনী সুস্থ হয়ে ওঠে সে যাত্রা।

তবু তাঁদের ভয় যায় না। সেই সাধু দৈবীশক্তিবলে আবার কি সর্বনাশ করে বসে কে জানে!

ভগবতী দেবী স্বামীর কোন কাজে কোনদিন মতামতও দেননি। স্বামীকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করেন। তাঁর পড়াশোনা, লেখার কাজে, দৈনন্দিন কাজে সাধ্যমত সহযোগিতাই করেছেন। তাঁর কাছে কত মানুষ কত অতিথি আসে—ভগবতী দেবী যোগ্যা স্ত্রীর মত স্বামীর পাশে থেকে সংসারের সব কর্তব্য নীরবে পালন করেছেন বিনা প্রতিবাদে। কঠিন পরিশ্রমেও কাতর হননি, কারণ দেখেছেন তাঁর স্বামীকেও দিনরাত পরিশ্রম করতে।

কিন্তু তিনিও মা—সংসারের কর্ত্রী। সংসারের উপর কোন অমঙ্গলের ছায়া তিনি পড়তে দিতে চান না। ওই সাধুর প্রসঙ্গেও তিনি ভেবেছেন। তাই ভগবতী দেবী স্বামীকে বলেন ভীতকণ্ঠে—শুনেছি সাধু নাকি অনেক শক্তি রাখে। একবার এক চরম সর্বনাশ ঘটার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছি। জানি না আবার কি সর্বনাশ করে বসে। এসবে কাজ নেই। আপনি ওই সাধুকে ছেড়ে দিন।

কেদারনাথের অন্তরে এক গভীর বিশ্বাস—নির্ভর যেন যুগিয়ে দেন জীবনদেবতাই। বারবার

সেই অন্তরের নির্দেশই তিনি পেয়েছেন। কর্তব্য করতেই হবে। ধর্মের নামে ওই সব প্রতারণাকে প্রশ্রয় দেবেন না তিনি। তার জন্য যত কঠিন হতে হয় হবেন—এবং যে কোন বিপদ আসুক দেবতার আশীর্বাদ বলেই তাকে মেনে নেবেন, তবু এই কর্তব্যপালনই তাঁর ধর্ম। সেই ধর্ম থেকে তিনি বিচ্যুত হবেন না।

তাই স্ত্রীর অনুরোধও তাঁকে টলাতে পারে না। কেদারনাথ বলেন, 'যে কোন সর্বনাশ আসে আসুক, আমরা সবাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাই তাতেও আমি থামব না, ওই ভণ্ড লোকটাকে যোগ্য শাস্তি দেবই। ধর্ম নিয়ে বেসাতি করে এত লোককে ঠকাবে এ হতে দেব না। এই অনুরোধ করো না। ঈশ্বরই আমাদের রক্ষা করবেন।'

ভগবতী দেবী স্বামীর উপর কোনদিনই কথা বলেন নি। আজও স্বামীর এই কর্তব্যে বাধা দেবার চেষ্টাও করেন না। স্বামী যদি এই সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন, নিশ্চয়ই তা সঠিক সিদ্ধান্ত বলেই মেনে নেবেন তিনিও।

বিচারপর্ব শুরু হলো।

সারা পুরী জেলায়—আশপাশেও বিষকিষণের বিচারের খবর লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই সম্প্রদায়ের মানুষরাও বসে নেই।

দলে দলে হাজারো মানুষ এই বিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছে। গ্রামাঞ্চলে দু-চারটে গণ্ডগোলের খবরও আসছে।

আর শহরেও কিছু মানুষ ছোটখাটো গোলমালও বাধাবার চেষ্টা করছে, যাতে প্রশাসনও বিষকিষণকে মুক্ত করে দেয়। প্রতিদিন পুলিশ পাহারায় বিষকিষণকে আদালতে আনা হয়, বাইরে বিশাল জনতাও স্লোগান দেয়। বিষকিষণকে মুক্ত করার দাবী জানায় সজোর কণ্ঠে।

ভক্তরাও বিষকিষাণকে দর্শন করে, তার আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হতে চায়।

কেদারনাথও দেখেন এই লোকটার যোগশক্তি কিছু আছে, সেটাকে সৎকাজে লাগালে হয়তো সমাজের উপকারই হতো, কিন্তু তা করে নি সে নিজের স্বার্থেই।

সেই যোগশক্তির বলেই লোকটা একুশদিন জেলে থাকাকালীন কোন খাবার খায় নি, জলগ্রহণও করে নি, তবু তার শরীর এতটুকু ভেঙে পড়েনি, রীতিমত সুস্থই রয়েছে।

বিচার চলছে।

কমিশনার সাহেব, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও তাদের হুকুম রদ করতে চান না জনতার চাপে। বিচার হবেই, দোষী হলে শাস্তিও দিতে হবে।

এর মধ্যে বিষকিষণের দুই অনুচর, ব্রহ্মা আর শিবের জ্যান্ত অবতারদ্বয়, আদালতে স্বীকার করে যে—হুজুর আমরা কিছুই জানি না। বাবা বিষকিষণই আমাদের এই সব অবতার-টবতার বানিয়ে চালাতো। তার ভয়ে আমরা কিছুই করতে পারি নি। ওসব সাজানো ব্যাপার—আমাদের মাপ করে দিন।

বিষকিষণ সম্বন্ধে তার অত্যাচার লোভের প্রসঙ্গেও বেশ কিছু সাক্ষ্যপ্রমাণও এসে যায়।

আঠারো দিন বিচারের পর এবার সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে কেদারনাথ তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। শাস্তির বিধান তখনও দেননি। রায় দিতে হবে দু'একদিনের মধ্যেই। কারণ এ মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।

সেদিন আদালতে বিষকিষণ গর্জে ওঠে, বলে সে কেদারনাথকে—বাবু, আমাকে অন্যায়ভাবে ধরে আনার জন্য সেদিন আপনার বাড়িতে একটা বিপদ ঘটিয়েছিলাম, তবুও আপনার এতটুকু চৈতন্য হয় নি। ঈশ্বরের অবতারকে নিয়ে তুমি ছেলেখেলা করছ। তাকে চিনতেও পারো নি।

তাকে শাস্তি দিতে চাও? এবার তোমার বিচার আমিই করছি—শাস্তি হবে তোমার মৃত্যু। দেখবো কেমন করে মরা মানুষ আমার শাস্তির বিধান দেয়!

তার দু'চোখ জ্বলছে। রাগে কাঁপছে বিষকিষণের সারা দেহ। সে এক বীভৎস মূর্তি।

কেদারনাথ তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল থাকেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর আদালত থেকে বাড়ি ফিরছেন। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে পোশাক বদলে সন্ধ্যাপূজায় বসেন। সেদিন পূজায় বসার পরই হঠাৎ বুকের ডানদিকে একটা তীব্র বেদনা অনুভব করেন।

ভগবতী দেবী ধরে নিয়ে গিয়ে স্বামীকে বিছানায় শোয়ান। ছেলেদের একজনকে বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে পাঠান।

খবর পেয়ে ডাক্তার ওয়াটসনও আসেন।

ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা হলো। রাত বাড়তে থাকে। তাঁর যন্ত্রণার উপশম তো হয় না বরং বাড়তে থাকে সেই যন্ত্রণা। কেদারনাথ ঠাকুরকে ডাকতে থাকেন।

স্ত্রী ভগবতী দেবীও ভয় পেয়ে যান।

বেশ বুঝেছেন এ সেই সাধুকে শাস্তি দেবার জন্যই যেন এই শাস্তি। কিন্তু কেদারনাথ তবু নির্বিকার।

তাঁর অন্তরে সেই নির্ভয় আশ্বাস যেন শুনেছেন। মনে তাঁর কি আত্মবিশ্বাস—নির্ভরতা জাগে। শুধু বলেন—কোন ভয় নেই। দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। ঈশ্বরই আমাকে রক্ষা করবেন। তাঁকেই স্মরণ করো। তিনিই দয়াময়—তিনিই রক্ষাকর্তা।

বিনিদ্র রাত কাটে কি যন্ত্রণার মধ্যে। বারবার ভাবেন কেদারনাথ কাল আদালতে রায় দিতে হবে, কি করে সুস্থ হবেন তিনি?

সকালের দিকে বেদনার কিছুটা উপশম হয় তাঁর। কিছুটা সুস্থ বোধ করেন। মনে হয়, ঈশ্বরই তাঁকে এইভাবে সুস্থ করেছেন তাঁকে দিয়ে কর্তব্য পালন করানোর জন্য। দুষ্টের দমন করাও তাঁরই কাজ আর সেই কাজ করাবার জন্য এক্ষেত্রে তাঁকেই নির্বাচিত করেছেন।

সকাল দশটা নাগাদ কিছু সুস্থ হতে তিনি এবার সেই মামলার রায় লিখতে বসেন।

ভগবতী দেবী দেখেন স্বামীকে। বলেন—একটু বিশ্রাম না নিয়েই কাজ বসলে?

কেদারনাথের কাছে কর্তব্যই বড়। তিনি বলেন—উপায় নেই। জরুরী কাজ। আদালতেও যেতে হবে।

সেদিন অন্যদিনের মত পায়ে হেঁটে কোর্টে যাবার মত ক্ষমতা তাঁর নেই। বেদনা কিছুটা কমলেও সারা দেহমনে একটা ক্লান্তি আচ্ছন্ন ভাব তখনও রয়েছে। তাই পাল্কীতে করেই আদালতে আসেন। ডাঃ ওয়াটসনও আসেন আদালতে, যদি তাঁর দরকার পড়ে।

সেদিন সারা শহরের মানুষ আদালত-প্রাঙ্গণে এসে জমায়েত হয়েছে। চারিদিকে কড়া পুলিশ পাহারা মোতায়েন করা হয়েছে। বিষকিষণের অন্ধ ভক্তের দল বাইরে ঘন ঘন তাদের দেবতা বিষকিষণের নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে বিষকিষণ।

বিচারকের আসনে বসে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কেদারনাথবাবু। চারিদিকে উকিল—দর্শকদের ভিড়।

কেদারনাথ রায় দেন,

—"Biskishen is found guilty of Political conspiracy against the National

British Indian Government, as well as the State Government of Orissa, and therefore is sentenced to eighteen months of strict imprisonment and hard labour.''

আঠার মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশই দিয়েছেন তিনি বিষকিষণকে।

এই রায়ের খবর শুনে বাইরে উত্তাল জনসমুদ্র গর্জে ওঠে—এ অবিচার! অন্যায় অবিচার! উত্তেজিত জনতাকে পুলিশ শান্ত করার চেষ্টা করছে।

বিষকিষণকে এবার জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। রাগে বিষকিষণের দু'চোখ জ্বলে ওঠে—তার জটা সব খাড়া হয়ে গেছে। তার থেকে আগুনের শিখা বের হয়।

পুলিশ বন্দীকে নিয়ে যেতেও ভয় পায়। বন্দী বাঘের মত গর্জাচ্ছে সে। কেদারনাথকে যেন সেই আগুনে সে ভস্ম করে দেবে।

কিন্তু এই অবসরে ডাঃ ওয়াটসন এবার একটা কাঁচি নিয়ে, ওই বিষকিষণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নিপুণ হাতে সেই ধারালো কাঁচি দিয়ে তার জটাগুলো সব কেটে ফেলেন। আর আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটে যায়।

এই জটা কাটা যাবার পরই সেই তেজস্বী অগ্নিমূর্তি বিষকিষণ নেতিয়ে পড়ে। তার সব তেজ অহঙ্কার সবকিছুই নিমেষে হারিয়ে যায়। আর কোন গর্জনও নেই।

তার সব সিদ্ধাই ছিল ওই জটাতেই—সেগুলো কাটা যেতে বিষকিষণের সব জারিজুরিও ফুরিয়ে যায়।

এবার হাজারো ভক্ত দেখছে বিষকিষণের যাদুর খেলা। লোকটা অবতার, ঈশ্বরের নামে ভড়ং দেখিয়ে তাদের এতদিন চোখে ধুলো দিয়ে এসেছে।

এই ভণ্ড প্রতারককে তারা দেবতা বলে মেনেছিল! এর জন্য আন্দোলন করেছিল! ওরাও চটে ওঠে। ওরা আজ স্বীকার করে—বিষকিষণ ভণ্ড অছি!

উত্তেজিত জনতার সামনে—সারা দেশের মানুষের সামনে কেদারনাথ এক ভণ্ড ধর্মের ধ্বজাধারীর মুখোশ খুলে দিয়ে জনসাধারণকে ধর্ম সম্বন্ধে একটি সত্য চেতনার উন্মেষই করেছিলেন।

আবও আশ্চর্যের বিষয়—বিষকিষণের জটা কাটার পর থেকেই কেদারনাথও অনেক সুস্থ বোধ করেন। তার সব জাদুরই শেষ হয়ে গেছে।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জনতাও শান্ত হয়ে তাদের ভুল বুঝতে পেরে আদালত-প্রাঙ্গণ ছেড়ে শান্তিতে চলে যায়।

কেদারনাথও এখন সুস্থ। এবার ঘরে ফেরার সময় আর পাল্কীর দরকারই হয় না।

নিজেই পায়ে হেঁটেই বাড়িতে ফিরে আসেন আদালত থেকে। আজ তাঁর মনে যেন দৃঢ় বিশ্বাসই ফিরে আসে। তাঁর প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নি। চৈতন্যদেবই তাঁকে এই শক্তি যুগিয়েছিলেন। তিনিও কাজীর অন্যায় প্রতিকারে কঠিন হয়েছিলেন।

তাই ভক্তকেও শক্তি যুগিয়েছেন এই অন্যায়-এর প্রতিকার করতে। কেদারনাথ মনে মনে অসংখ্য প্রণাম জানান তাঁর চরণে।

তাঁরও মনে হয় ভবিষ্যতে যাতে দেশের মানুষ ধর্মের নামে এই সব অনাচারকে মেনে না নেন তার জন্য দেশবাসীকে অবহিত করার প্রয়োজনও আছে, যাতে তারা এসব অনাচারের বিরুদ্ধে সরব হন।

ঈশ্বরই তাঁকে এই কাজ করার জন্যই বিষকিষণের সব যাদুশক্তির বিরুদ্ধে রক্ষা করেছেন। না হলে ওই লোকটা সত্যই ওঁর সর্বনাশই করতো।

কেদারনাথ এবার কলমই ধরেন এই অনাচারের বিরুদ্ধে মানুষকে অবহিত করার জন্য।

কটকের বিখ্যাত সংবাদপত্র তখন 'Progress'. বহুল প্রচারিত এই পত্রিকায় তিনি একটি নিবন্ধ লেখেন। এর মধ্যে কেদারনাথ কটক, ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যার আরও বেশ কিছু জায়গার খোঁজ নিয়েছেন। সরকারী কাগজপত্র ঘেঁটেও অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

সেইসব তথ্য দিয়ে তিনি জোরালো ভাষায় এই প্রবন্ধ লিখে ওই অতিবাড়ি সম্প্রদায় এবং আর অন্য সম্প্রদায়ের প্রচারিত অবতারদের গুণাবলীর এবং কার্যাবলীর বিভিন্ন বিবরণ দিয়ে তাদের প্রকৃত স্বরূপকে তিনি জনসমাজের সামনে উদ্‌ঘাটিত করেন।

তাঁর এই প্রবন্ধ তখনকার সমাজে আলোড়ন তুলেছিল, সাধারণ মানুষও জেনেছিল ধর্মের নামে কত বড় লোকঠকানো কারবার চলছে। তাঁরাও এবার এইসব অনাচারকে বন্ধ করাটা সামাজিক কৃত্য বলেই বোধ করেন, এবং সেইমত ব্যবস্থাও নেন।

কেদারনাথ এই প্রবন্ধের মাধ্যমে বিশেষভাবে পরিচিত হন, কারণ এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নিয়ে নানাস্থানে বিশেষ আলোচনা হয়।

তাঁরা এই সাহসিকতার জন্য কেদারনাথকে অকুণ্ঠ ধন্যবাদ দেন।

এইভাবেই কেদারনাথ সেদিন ধর্ম এবং সমাজের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের কথা চিন্তা করেছিলেন। পুরীতে তাই লেখাপড়ার কাজ সমানে চলেছে। এই ঘটনার পর পুরীর সমাজেও এখন তিনি অতি শ্রদ্ধেয় পরিচিতজন।

॥ ২১ ॥

পুরীতে কেদারনাথ তার বাহ্যিক কর্মক্ষেত্রে যেমন সুনাম অর্জন করেন, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও তেমনি অগ্রসর হন। এখানে জগন্নাথক্ষেত্রে এসে তিনি যেন ধন্য।

নুনের পুতুল এসেছে সমুদ্রে। সে যেমন মিশে যায় সেই বারিধিতে, কেদারনাথও এখানে ভক্তিরসসাগরে যেন হারিয়ে গেছেন।

শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রতিদিন যান, সন্ধ্যায় আরতিও দর্শন করেন। সারা ভারতের প্রান্ত থেকে এখানে আসে হাজার হাজার ভক্ত। জয়ধ্বনি দেয় তারা। এক অনাবিল ভক্তির স্পর্শে কেদারনাথের চিত্ত ভরে ওঠে।

সরকারী পদস্থ ব্যক্তি। দোল-রথযাত্রায় লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী আসে। শোভাযাত্রায় শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য পুলিশবাহিনী নিয়ে তিনি পথে নামেন, যাতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি না হয়। তীর্থযাত্রীদের যাতে অসুবিধা না হয়, এসবও দেখেন তিনি। এ তার সরকারী কর্তব্য নয়, এ যে সেই দেবতারই সেবা। তাই প্রসন্নচিত্তে এসব কাজ দেখেন। ভগবানকে সেবা করেন, ভক্তদের সেবা করে ধন্য হন।

সেই সঙ্গে চলেছে পড়াশোনাও। পুরীর রাজার গ্রন্থাগার খুবই সমৃদ্ধ। সেখানেও অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ-পুঁথির মূল্যবান সংগ্রহ আছে। কেদারনাথ সেখানেও যান। সেই রত্নভাণ্ডারের সম্পদ তার পড়ার কাজে লাগে। এ ছাড়াও পুরীতে বহু পণ্ডিত আছেন, তাঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রহও কম নয়। কেদারনাথ তাঁদের কাছেও অনেক গ্রন্থাদি পান। ফলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ ভাবেই অবগত হন। ক্রমশ চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত ধর্ম, দর্শন যে কত মূল্যবান, কত সমৃদ্ধ, যুগোপযোগী তাও অনুধাবন করতে পারেন, আর মনে কি অদম্য আবেগ জাগে, এই পরম সম্পদ যা আজ লুপ্তপ্রায় তাকে লোকসমাজে পুনঃপ্রবর্তিত করতে হবে। জনসাধারণকে এই অমৃতস্পর্শ এনে দিতে হবে। আর চৈতন্যদেবের কথা মনে হয়,

এ জগতে যতেক আছে
নগরাদি গ্রাম।
সর্বত্র প্রচার হইবে
মোর নাম॥

তাঁর লীলামাহাত্ম্য, তাঁর তত্ত্ব, তাঁর নাম পৃথিবীর কোণে কোণে নগর জনপদে প্রতিষ্ঠিত হবে—এ তারই বাক্য। এই বাক্য বৃথা হবে না।

হয়তো তাঁর প্রেরিত কোন মহাপুরুষ এই জগতে আসবেন যিনি চৈতন্যদেবের নির্দেশে—তাঁরই শক্তিতে তিনি চৈতন্যদেবের ওই বাণীর সত্যতা প্রমাণ করবেন। দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সেই নাম প্রচার হবে। বিদেশীরাও কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বিদেশের পথে পথে মহাপ্রভুর নামগান করবে। সেই মহাপুরুষ-এর পথ চেয়েই থাকবেন কেদারনাথ—তাঁর কাজের প্রসারের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখবেন তাঁর অক্লান্ত সাধনায়।

সেই সাধনাই চলেছে তাঁর।

পুরীতে ভাগবত পাঠ শেষ করে তিনি শ্রীজীব গোস্বামী রচিত 'সৎসন্দর্ভ' গ্রন্থের পুরো অনুলিপি করেন আর মন দিয়ে গ্রন্থখানি পাঠও করেন। বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত 'গোবিন্দ ভাষ্যের'ও অনুলিপি করেন—গ্রন্থটি বেদান্তের একটি প্রামাণ্য পুস্তক। শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'ও হাতে এসেছে তাঁর। কেদারনাথ অনুরাগী ছাত্রের মতই এসব গ্রন্থ পাঠ করেন, হৃদয়ে গ্রহণ করেন। এরপর হাতে আসে এক অমূল্য গ্রন্থ 'হরিভক্তি কল্পতরু'। কেদারনাথ এইসব প্রাচীন দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থরাজির অনুলিপি করেন—যাতে ভবিষ্যতে সুযোগ এলে এসব সুধী পাঠকসমাজে পুনঃপ্রকাশ করা যায়। এসব গ্রন্থই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রামাণ্য গ্রন্থ—অমূল্য সম্পদ। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মের প্রচারপ্রসারকল্পেই এসব আবার জনসমাজে প্রবর্তিত করবেন। ষড় গোস্বামীদের মধ্যে শ্রীরূপ-সনাতন অন্যতম। তাঁদের বাণীও প্রচার করতে হবে। ক্রমশ কেদারনাথ পাঠ করলেন 'প্রমেয় রত্নাবলী'—বৈষ্ণব তত্ত্ব সম্বন্ধে বেশ কিছু জ্ঞানলাভ করেন।

শুধু পড়াই নয়, মূলত তিনি কবি, বিদগ্ধ লেখক—এতদিন লিখেছেন কাব্য-প্রবন্ধ, সেই ক্ষুরধার যুক্তিপূর্ণ লেখনীতে এবার ভক্তির জোয়ার আসে। জীবনদেবতা যেন এবার তাঁকে আর এক পুণ্যপ্রবাহের ধারায় প্রবাহিত করতে চান।

এবার তিনি রচনায় হাত দিলেন। ১৮৭৪ সালে পুরীতেই প্রথম ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন দত্তকৌস্তুভঃ। এটতে তিনি ১০৪টি কবিতায় বৈষ্ণব দর্শনের মূল তত্ত্বগুলির হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা করেন। তাঁর লেখনীতে যেন জোয়ার আসে। এবার ভক্তিরসের ভাবনায় ভাবিত হয়ে রচনা করলেন কৃষ্ণসংহিতা। তাঁর কবি প্রতিভা এবার কৃষ্ণগুণরূপে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

লেখাপড়ার সঙ্গে সাধুসঙ্গ আলোচনা—এসবও চলতে থাকে। দিনাজপুরে যে ভক্তিতত্ত্বের বীজ বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অটুট বিশ্বাস, নির্ভর তাঁর অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এবার শ্রীক্ষেত্রে এসে তার বিকাশ ঘটে।

এখানেও তিনি ভক্তদের নিয়ে গড়ে তুললেন 'ভাগবতসমাজ'। এদের এই ধর্মসভার অধিবেশন হত জগন্নাথবল্লভ উদ্যানে। এই উদ্যানের ধূলিকণাও পূতপবিত্র। মনোরম পরিবেশ। অতীতে চৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ শ্রীরামানন্দ রায় এখানে সাধন ভজন করতেন। এর পরিবেশ যেন আজও চৈতন্যময় হয়ে রয়েছে।

এই ধর্মসভার মধ্যমণি ছিলেন কেদারনাথ। পুরীর বহু ভক্তপণ্ডিতরা এখানে আসতেন। নানা ধর্মশাস্ত্রাদির প্রসঙ্গেও আলোচনা হত। বৈষ্ণবসমাজের একটি মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল এই ভাগবতসমাজ। পুরীস্থ বৈষ্ণবজন অনেকেই এখানে এসে আনন্দ পেতেন।

পুরীতে তখন বৈষ্ণবদের মধ্যে আর এক পণ্ডিত বৈষ্ণব ছিলেন রঘুনাথ দাস বাবাজী। সকলের শ্রদ্ধেয় তিনি।

তাঁর কাছেও আমন্ত্রণ পাঠান কেদারনাথ এই সভায় পদধূলি দেবার জন্য।

কেদারনাথ পুরীর বহু সাধুমহাত্মার দর্শন পেয়েছেন। সিদ্ধবকুলের ওদিকে টোটা গোপীনাথ মন্দিরের কাছে এক পর্ণকুটিরে থাকতেন স্বরূপদাস বাবাজী নামে এক সিদ্ধপুরুষ। ইনি দিনভোর ওই কুঠিয়ার মধ্যেই সাধনভজন করতেন, সন্ধ্যায় বের হয়ে তুলসীমূলে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে নামকীর্তন করতেন, তখন বহু ভক্ত আসত তাঁকে দর্শন করতে। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ হতো। কেউ জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ আনতেন—স্বরূপদাস বাবাজী তার থেকে একমুষ্টি মাত্র গ্রহণ করতেন, এই ছিল তাঁর দিনান্তের আহার।

রাত্রে আবার কুটিরে ঢুকে সাধনভজন করতেন। তিনি ছিলেন অন্ধ। তবু কোন ব্যক্তির সেবা নিতে চাইতেন না। গভীর রাত্রে একাই কাশবন ভেঙে সমুদ্রে গিয়ে স্নান সেরে আবার কুঠিয়ায় ফিরে আসতেন।

কেদারনাথ সেইসব মহাত্মা সিদ্ধপুরুষদের দর্শন করে আরও আনন্দ পেতেন। তাঁরা কেদারনাথকে বলতেন—কৃষ্ণনাম ভুলো না। সাধুসঙ্গের পুণ্যফল তাকে সাধনপথে অগ্রসর হতে সাহায্য করতো।

তাঁর মনে পড়ে সেই রাজার পাখীর গল্প। রাজবাড়িতে সোনার পিঞ্জরে রয়েছে তোতাপাখী। আহারও জোটে রাজভোগ, যত্নেরও সীমা নেই, তবু তোতাপাখী বন্দীই থাকে—অসীম আকাশ তার কাছে স্বপ্ন। মুক্তির জন্য প্রাণ ছটফট করে, মুক্তির উপায় জানা নেই।

সেদিন কয়েকজন সাধু মহাপুরুষ এসেছেন রাজপুরীতে। রাজা তাঁদের সেবা করে ধন্য। এক মহাপুরুষ তোতাকে পিঞ্জরে দেখে বলেন—ওকে মুক্তি দেন মহারাজ।

মহারাজ সাধুর কথায় তোতার পিঞ্জরের দরজা খুলে দিতে আদেশ দেন—তোতাও এবার মুক্ত আকাশের অসীমে উধাও হয়।

সে এবার বোঝে রাজার সঙ্গে ঘটেছিল তার বন্ধন—আর সাধুসঙ্গে ঘটলো অসীম মুক্তির স্বাদ। কেদারনাথও সাধুসঙ্গে তাঁদের কথা শ্রবণে কীর্তনে পান মুক্তির অপূর্ব আনন্দ। তাই সাধুদের সংস্পর্শে আসতে চান। সেই কারণেই তিনি রঘুনাথ দাস বাবাজীর মত সিদ্ধপুরুষকে তাঁদের ভাগবতসমাজে আমন্ত্রণ জানান।

রঘুনাথ দাস বাবাজীও শুনেছেন কেদারনাথের সম্বন্ধে অনেক কথা। তাঁকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবসমাজ গড়ে উঠছে, এসব খবরও পান। রঘুনাথ দাস বাবাজী এই সভায় নিজে তো এলেনই না—বরং পুরীর বৈষ্ণবসমাজের অনেককেই বলেন—ওই কেদারনাথ আসলে বৈষ্ণবই নয়। ওর কণ্ঠি তিলক এসব নেই, বৈষ্ণবতত্ত্ব নিয়ে আলোচনার কোন অধিকারই নেই। ওখানে তোমরা যেও না। অবৈষ্ণবের পক্ষে এসব আলোচনার কোন অধিকারই নেই।

খবরটা যথাসময়ে কেদারনাথের কানেও পৌঁছলো। তিনি দুঃখই পেলেন, তবু এ নিয়ে কোন বাদ-প্রতিবাদে যান না, নীরবেই এসব উক্তি শোনেন মাত্র।

তবু তাঁর কাজে ব্যাঘাত ঘটে না। তাঁর লেখনীতে কৃষ্ণসংহিতার শ্লোকগুলি হীরার দ্যুতি নিয়ে চিত্তাকাশে প্রকাশিত করে দেন যেন চৈতন্যদেব—তিনি লিপিবদ্ধ করে যান মাত্র। সেই জগতের মাধুর্যের প্রসাদে তাঁর মনমধুকর আত্মমগ্ন।

রঘুনাথ দাস বাবাজী অসুস্থ—বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছেন। হঠাৎ এক রাত্রে স্বপ্ন দেখেন তিনি। স্বয়ং প্রভু জগন্নাথদেব তাঁর সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন, তুমি আমার ভক্ত পরম বৈষ্ণবকে অপমান করেছ তাই এই ব্যাধি। তাঁর আশ্রয় নাও, যদি সুস্থ হতে চাও।

কেদারনাথ এসব কথা ভুলেই গেছেন। ভোর থেকে পূজাপাঠ সেরে লেখার কাজে বসেন। হঠাৎ অসুস্থ রঘুনাথ বাবাজীকে তাঁর বাড়িতে আসতে দেখে অবাক হন কেদারনাথ। তাঁর মত সিদ্ধপুরুষ অযাচিতভাবে এই অবস্থায় তাঁর কাছে আসবেন ভাবতেই পারেন না কেদারনাথ।

পরে বাবাজীর মুখে সব কথা শুনে কেদারনাথের দু'চোখে অশ্রু নামে। বাবাজীর পায়ে তিনিই প্রণাম করতে যান—রঘুনাথ বাবাজী ওঁকে বুকে টেনে নেন। দুই পরম বৈষ্ণবের এই পুণ্যমিলনদৃশ্য দেখেন ভগবতী দেবী।

কেদারনাথের মনে কোন গ্লানি ক্ষোভ নেই, শুধু জানান তিনি রঘুনাথ বাবাজীকে,—বাবাজী, তিলককণ্ঠি এসব দেন দীক্ষাগুরু, শ্রীমহাপ্রভু এখনও আমাকে কোন দীক্ষাগুরুর সন্ধান দেন নি, তাই ওসব ধারণ করার যোগ্যতাও আসে নি। তুলসী মালায় শুধু তাঁর নামই জপ করি, আমার দোষ কি বলুন?

বাবাজী মহাপুরুষ সিদ্ধপুরুষ। তিনি এবার নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত। স্বয়ং জগন্নাথদেবই তাঁর ভুল ভেঙে দিয়েছেন। এরপর থেকে কেদারনাথও বাবাজীর অনুরক্ত হয়ে পড়েন। বাবাজীও পরম স্নেহভরে তাঁকে কাছে টেনে নেন।

পুরীর মন্দিরেও যান কেদারনাথ। মন্দিরের বাঁদিকে উঁচু বেদী—সেখানে পাণ্ডা-পুরোহিতরা বসেন, ধর্ম আলোচনা হয়। কেদারনাথ সেখানেও যান। কিন্তু ক্রমশ তার এই সঙ্গও ভালো লাগে না। সেখানে প্রকৃত বৈষ্ণবদের সমাগম নেই। সবই মায়াবাদীদের ভিড়। তাদের আলোচনায় সারবস্তু কিছু নেই যা কেদারনাথের মত ভক্ত-অনুরক্ত পণ্ডিতের মন ভরাতে পারে।

তাই তিনি এদিকে লক্ষ্মীমন্দিরের পাশে, না হয় চৈতন্যদেবের হস্তচিহ্ন যেখানে রয়েছে সেইখানেই বসেন নিভৃত চিন্তনে। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য ব্যক্তিত্ব সহজেই মানুষকে আকর্ষণ করে। তাই বহু পণ্ডিতজন ভক্ত সেইখানেই সমবেত হতে থাকেন। সেইখানে কেদারনাথ ভক্তিমার্গ-বৈষ্ণবতত্ত্ব-শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। ভিড়ও হয়। ক্রমশ সেই স্থান ভক্তিমণ্ডপ নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

কেদারনাথ সেখানে একদিন ভক্তদের সামনে ভাগবতপাঠ করছেন, শ্রোতারা স্তব্ধ হয়ে নিবিষ্টচিত্তে তাঁর সারগ্রাহী ব্যাখ্যা শুনছেন, হঠাৎ সেই শান্তির রাজ্যে প্রবেশ করেন পুরীর রাজা স্বয়ং। রাজা বলে কথা, সঙ্গে জনপঞ্চাশেক দেহরক্ষী, অনুচর—তারা মহাসমারোহে হৈ-হট্টগোল করে রাজকীয় ভাবেই জাঁকজমক সহকারে প্রবেশ করে।

কেদারনাথ ভাগবতপাঠ বন্ধ করতে বাধ্য হন রাজার হৈ-হট্টগোল সমারোহে। ভাগবৎপাঠে এইরকম বাধা পেয়ে তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন রাজার ঔদ্ধত্যে।

এই প্রসঙ্গে সুদর্শনানন্দ বিদ্যাবিনোদ তাঁর রচিত 'শ্রীক্ষেত্র' গ্রন্থে একটি সুন্দর ছবি তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, রাজার এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ কেদারনাথ রাজাকে বলেন,—রাজা সাহেব, আপনি আপনার ছোট রাজ্যের সর্বেসর্বা রাজা হতে পারেন, কিন্তু শ্রীজগন্নাথদেব সব রাজার রাজা। তাই এটাই নিয়ম যে যেখানে তাঁর নামগান হয় সেই স্থানের মর্যাদা রক্ষা করা উচিত, কিন্তু আপনি তা করেন নি।

কেদারনাথ রাজাকেই সর্বজনসমক্ষে এইভাবে সাবধান করেন—সকলেই হতবাক ওঁর এই সাহসে। যত বড় সত্যই হোক, পুরীর রাজাকেই এইভাবে কেউ শাসন করতে পারে তা জানা ছিল না। কিন্তু যেন কেদারনাথের কথা নয়, মহাপ্রভু জগন্নাথের নির্দেশ।

রাজাও তাঁর ভুল বুঝতে পেরে সেই প্রকাশ্য সভায় শ্রীমদ্‌ভাগবতকে প্রণাম করে ভক্তদের কাছে এই অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেন।

প্রকৃত ধর্মের মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি কত কঠিন হতে পারেন—তাঁর সেই অন্তরশক্তির পরিচয় বারবার প্রকাশিত হয়েছে। জীবনদেবতার নির্দেশে তিনি চলেছেন এক মহান কর্তব্য পালনের পথে। সেখানের সব বাধাই তিনি দূর করতে সক্ষম হবেন সেই দেবতার প্রসাদেই।

পরম ভক্ত পণ্ডিত কেদারনাথ পুরীর জনসমাজে একটি স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। একেই দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে করেন তিনি, এ তাঁর অসীম করুণা।

তাই চৈতন্যদেব যেন বারবারই পরীক্ষা করে চলেছেন তাঁকে। বিষকিষণের বিচারের পর বেশ কিছুদিন উত্তেজনামুক্ত হয়ে শান্তচিত্তে পড়াশোনা-লেখার মধ্যে কেটেছে। কৃষ্ণসংহিতা লেখার কাজও প্রায় শেষ। এর উপক্রমণিকায় তিনি ভারতের আর্য যুগের শুরু থেকে শ্রীচৈতন্যদেবের কাল পর্যন্ত বিভিন্ন কালের ইতিহাসকে এক নিপুণ বিশ্লেষণধর্মী ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরেছেন এবং তার মধ্যেই কৃষ্ণতত্ত্ব এবং শ্রীচৈতন্যতত্ত্বের সমন্বয় খুঁজে পেয়েছেন। বাংলা ভাষায় এটিকেই প্রথম ভারত ইতিহাস বলা যেতে পারে।

এইসময় ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্তও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটে পদাভিষিক্ত ছিলেন। দুজনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও ছিল, তাঁদের মধ্যেও নিজেদের লেখা ভাবনা চিন্তা নিয়েও আলোচনা হত।

কেদারনাথ রমেশবাবুর থেকে কিছু সিনিয়ার ছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্তও কেদারবাবুর প্রতি খুবই শ্রদ্ধাবান ছিলেন, কেদারনাথও অনুজপ্রতিম রমেশচন্দ্রকে স্নেহ করতেন।

কেদারনাথের কৃষ্ণসংহিতায় বিধৃত এই ইতিহাস নিশ্চয়ই রমেশবাবুকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। কেদারনাথ মুখ্যত ইতিহাস-এর মধ্যে কালই নয়, ধর্মতত্ত্বের প্রতিষ্ঠাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, চৈতন্যতত্ত্বকে বিশেষ করে।

তাঁর এই গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন,—ভারতবর্ষের অতি পূর্বতম ইতিহাস বিস্মৃতিরূপ ঘোরান্ধকারে আবৃত আছে। কেননা প্রাচীন কালের কোন আনুপূর্বিক ইতিহাস নাই। চতুর্বেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণসকলে যে কিছু সংবাদ পাওয়া যায় তাহা হইতে যৎকিঞ্চিৎ অনুমান করিয়া যাহা পারি স্থির করিব।

বাস্তব জগতের ঐতিহাসিককে আবার দেখি বৈকুণ্ঠ বর্ণনার দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন কবিরূপে।

যন্যেহ বর্ত্ততে প্রীতিঃ কৃষ্ণে ব্রজবিলাসিনি।
তস্যৈবাত্মসমাধৌ তু বৈকুণ্ঠো লক্ষ্যতে স্বতঃ॥

কৃষ্ণসংহিতায় ইতিহাস গৌণ—মুখ্য কৃষ্ণতত্ত্ব আর চৈতন্যতত্ত্বের সমন্বয়সাধন—সেই প্রসঙ্গে এক সারমর্মী আলোচনা।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর রমেশচন্দ্র দত্ত ঐতিহাসিকের দৃষ্টিকোণ থেকে রচনা করেন 'ভারতের ইতিহাস', যাকে পাঠকগণ বলেন বাংলায় রচিত প্রথম ভারতের ইতিহাস। এর জন্য কেদারনাথের অনুপ্রেরণা যে পেয়েছিলেন রমেশচন্দ্রের সেটাকে অস্বীকার করা সঙ্গত হবে না।

কেদারনাথ যখন এমনি অমর রচনায় ব্যাপৃত তখনও সমানে দায়িত্ব নিয়ে পুরীর প্রশাসকের কাজ করে চলেছেন আর কর্তৃপক্ষ তাঁর যোগ্যতা এবং নিষ্ঠা দেখে তাঁকে এইসঙ্গে শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরের প্রশাসক নিযুক্ত করেন। এই গুরুদায়িত্বও তাঁকে পালন করতে হচ্ছে। কেদারনাথ, এসেই দেবতার সেবা বলেই এই কাজও সানন্দে নিষ্ঠাভরে করে চলেছেন।

এইখানেই সেই গোলমালের সূচনা হয়। পুরীর মন্দির পরিচালনাভার পুরীর রাজার উপরই ছিল এতদিন, কিন্তু বেশ কিছু অভিযোগ উঠতে সরকার এবার মন্দির পরিচালনার ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন করেন।

কেদারনাথও মন্দিরের হিসাবনিকাশ পরীক্ষা করতে গিয়ে তদন্ত করে জানতে পারেন যে মন্দিরতহবিল থেকে প্রায় আশি হাজার টাকা তছরূপ হয়েছে আর এর জন্য দায়ী পুরীর রাজাই।

কেদারনাথ তদন্ত করে ব্যাপারটা সত্য বলে জানেন। পুরীর রাজার বিরুদ্ধে তাঁকে অভিযোগ আনতে হবে, অভিযুক্ত এখানে স্বয়ং রাজা—তাই ভেবেচিন্তেই ব্যবস্থা নিতে হবে।

কিন্তু কেদারনাথ-এর জীবনদেবতার নির্দেশ—তাঁকে সব অন্যায়ের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ জানাতে হবে। তাই এবার রাজাকেই এর জন্য কারণ দর্শাতে বলেন।

রাজাও এবার বিপদে পড়েন। ব্যাপারটা সত্য। কেদারনাথও জানেন সরকারী ভাবে ব্যবস্থা নিতে গেলে রাজার সম্মানহানির কারণও ঘটবে। তাই তিনি রাজাকে বলেন—এই টাকা আপনি প্রতিদিনের জগন্নাথদেবের বাহান্ন ভোগ নিবেদন করে উশুল করে দেন, সেইটাই সম্মানজনক মীমাংসা হবে, না হলে আইনত ব্যবস্থা নিতে আমি বাধ্য।

রাজার কিছু লোক চেয়েছিল ব্যাপারটাকে ধামাচাপা দিতে। তাঁরাও কেদারনাথকে নানাভাবে অনুরোধ করেন তাই করতে, চাপও সৃষ্টি করেন।

কিন্তু কেদারনাথ তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখে ওই বাহান্ন ভোগ যোগাবার নির্দেশই মেনে নেন।

কিন্তু জগন্নাথদেবের এক-একবারের ভোগের পরিমাণ প্রচুর। নানা আয়োজন করতে হয়। তেমনি ভোগ দিতে হয় দিনে বাহান্নবার—তার খরচাও প্রচুর।

রাজকোষ থেকে প্রচুর টাকা বের হয়ে যায় প্রতিদিন। রাজা খরচার জন্যও বটেই—তাঁর অনুরোধ না রাখার জন্য কেদারনাথের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। তাঁর বিশ্বস্ত লোকরা পরামর্শ দেয়—কেদারনাথ, ওই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে খতমই করে দিতে, ওঁকে শিক্ষা দেওয়া দরকার।

সাধারণ কেউ হলে রাজার পক্ষে এ কাজ করা তেমন কঠিন ছিল না, কিন্তু কেদারনাথ পুরীতে সর্বজনবিদিত শ্রদ্ধেয় একটি মানুষ, তার উপর ইংরেজ আমলের পদস্থ কর্মচারী, তাঁর ক্ষমতাও কম নয়।

সুতরাং তাঁকে সহজে হত্যা করা সম্ভব নয়, তাতে রাজারই সমূহ বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, অথচ তাঁকে উচিত শিক্ষাই দিতে হবে। তাই পুরীর রাজা অন্য পথই নিলেন।

তখন বেশ কিছু লোক তন্ত্রমন্ত্রের সাধনা করত, নানা ধরনের যৌগিক প্রক্রিয়ায় হোমযজ্ঞ করা হত। এসবই ছিল মারণযজ্ঞ। তান্ত্রিক সাধক বা অন্য অনেকেই এই পাপসাধনা করে কিছু শক্তি অর্জন করেছিল—এই সব যজ্ঞের পূর্ণাহুতির পরই সেই অভীষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হত।

শত্রু নিপাতের জন্য পুরীর রাজাও তাঁর রাজপ্রাসাদে গোপনে এই মারণযজ্ঞের অনুষ্ঠান শুরু করলেন। তাঁর একমাত্র কামনা এই কেদারনাথের মৃত্যু। সেই বাসনা নিয়েই নিষ্ঠাভরে গোপনে মারণযজ্ঞ শুরু হল। এ যজ্ঞ বৃথা যাবে না বলেই রাজার বিশ্বাস। কেদারনাথ তাঁর আর্থিক ক্ষতি করেছেন এই বাহান্ন ভোগের বিধান দিয়ে, তাই তাঁকে নিপাত করতেই হবে।

গোপনে রাজপ্রাসাদে যজ্ঞ চলছে, মাসাবধিকাল এই যজ্ঞ চলবে আর শেষদিনে পূর্ণাহুতি দেওয়ার পরই কেদারনাথও মারা যাবেন। এ যজ্ঞ প্রাণঘাতী মারণযজ্ঞ, এর ফল ফলবেই।

গোপনে যজ্ঞ অনুষ্ঠান চলছে রাজপ্রাসাদে, কিন্তু সেখানেও সরকারের কিছু চর ছিল, তারা এই খবর জানতে পেরে গোপনে কেদারনাথকে এসে জানায়।

কেদারনাথ সব শুনেও এতটুকু বিচলিত হন না। তিনি তখন ভাগবতপাঠ কৃষ্ণসংহিতা রচনা, অন্য ধর্মগ্রন্থাদি পড়ায় ব্যস্ত, আর লেখার কাজও চলছে। সঙ্গে আছে সরকারী কাজের দায়িত্ব। তাঁর দিনরাত্রি কেবল নানা কাজে ঠাসা, আহারও অতি সামান্য আর বিশ্রাম দিনরাতের মধ্যে কয়েকঘণ্টা মাত্র। তিনি জানেন জীবনের পরিধি তাঁর কাজেরই পরিধির তুলনায় অনেক ছোট।

এই জীবনের ক্ষুদ্র পরিসরে তাঁকে অনেক কাজ করে যেতে হবে। বিরাট কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর। এই বৈষ্ণবধর্মকে আবার স্বমহিমায় সগৌরবে তাঁকে বৃহত্তর সমাজে—বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এই তাঁর জীবনদেবতার নির্দেশ।

তাই তিনি অন্তর দিয়েই সেই সাধনা করে চলেছেন। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সহায়। তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন তাঁদের সেই রাতুল চরণে।

তিনি অকুতোভয়। সবই ঘটছে তাঁরই ইচ্ছায়, এটা মনেপ্রাণে এখন বিশ্বাস করেন কেদারনাথ। তিনিই দরকার হলে রাখবেন, না হয় মারবেন—সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-এর তিনিই অধিকর্তা।

বার বার কেদারনাথ দেখেছেন সব বাধাবিপদ এসেছে, আবার তাঁর দয়াতেই সবই কেটে গেছে। বিষকিষণের আক্রমণ থেকেও তিনিই রক্ষা করেছেন।

তাই অকুতোভয় কেদারনাথ সব শুনেও নির্বিকার থাকেন। অন্দরেও খবরটা যায়। বৃদ্ধা জগৎমোহিনী দেবীও ভাবনায় পড়েন। বলেন—কি হবে কেদার? এসব কি শুনছি?

স্ত্রী ভগবতী দেবী স্বামীকে চেনেন। কেদারনাথ মায়ের কথায় বলেন—এ নিয়ে ভেব না মা। ঈশ্বরকে ডাকো, তাঁর শরণ নাও, তিনিই সব বিপদ দূর করেন। তিনিই বিপদতারণ। অন্যায় তো কিছু করি নি মা, তবে আর ভয় কিসের?

মায়ের মন, তবু ভয় যায় না।

যজ্ঞ চলছে। কেদারনাথ নির্বিকার। রাজার দৃঢ় বিশ্বাস, এবার তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হবেই, শত্রু নিপাত হবেই।

মহাসমারোহে যজ্ঞের পূর্ণাহুতির দিনক্ষণ সমাগত। যজ্ঞের ঋত্বিকরাও রাজার কাছে বেশ মোটা টাকা দানও গুছিয়ে নিয়েছে। তারাই অভয় দেয়—পূর্ণাহুতির পরই প্রাণনাশ হবেই! এই যজ্ঞদেবতা মৃত্যুর দেবতা—তিনি শুধু হাতে ফিরে যান না।

হোমকুণ্ডে পূর্ণাহুতি দেওয়া হল। এবার প্রাণনাশ হবেই, রাজা নিশ্চিন্ত হবেন। কেদারনাথের মৃত্যুর খবরের জন্য প্রতীক্ষা করে থাকেন তিনি।

হঠাৎ রাজপ্রাসাদেই কান্নার রোল ওঠে। চমকে ওঠেন রাজা, প্রাসাদে কান্নার রোল!

খবর আসে রাজার একমাত্র পুত্র হঠাৎ মারা গেছেন। চমকে ওঠেন রাজা, তিনি মারণযজ্ঞ করেছিলেন কেদারনাথের প্রাণআহুতি দিতে, কিন্তু যজ্ঞদেবতা আহুতি নিয়েছেন তাঁর একমাত্র সন্তানের প্রাণ!

সংবাদটা কেদারনাথের কানেও পৌঁছায়। তিনিও দুঃখিত হন এই অকালমৃত্যুর খবর পেয়ে আর মনে মনে বিশ্বাস করেন শ্রীজগন্নাথদেবেরই এই কৃপা তাঁর উপর। এবারও জীবনদেবতা তাঁকে রক্ষা করেছেন—হয়তো তাঁর কাজ এখনও শেষ হয় নি, তাই রেখেছেন তাঁকে এই জগতে। বৈষ্ণবধর্ম প্রচার প্রসার—তাকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজ এখনও হয় নি, প্রভু যেন তাঁকে সেই শক্তি দেন—অন্তরমন দিয়ে সেই প্রার্থনাই করেন কেদারনাথ।

॥ ২২ ॥

প্রায় পাঁচ বছর কেটে গেছে পুরীতে।

যে মানুষটি পাঁচ বছর আগে পুরীতে এসেছিলেন, চৈতন্যদেবের কৃপায় এই পাঁচ বছরে তাঁর জীবনধারাই পালটে গেছে, তাঁর অন্তরমন কি এক অনুরাগে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। চিত্তে এসেছে এক নতুন ভাবনার জোয়ার, বৈষ্ণবশাস্ত্রের মাধুর্যের প্রসাদে চিত্ত ভরে উঠেছে প্রসন্নতায় ; এই আনন্দ-পরমানন্দের স্বাদ তিনি পৌঁছে দিতে চান জগৎসমাজে। এই রত্নসম্ভার পৃথিবীর মানুষের

সামনে উপস্থাপিত করতে চান—যাতে উত্তরকালের মানুষ দেশ-কাল-এর সীমা পার হয়ে অসীম মুক্তির অমৃত সন্ধান পায়।

এ তাঁর সবই ঘটেছে চৈতন্যদেবের কৃপায়।

এবার পুরী থেকে বদলির সময় এসেছে। সরকারী এই নিয়ম। আবার যেতে হবে শ্রীক্ষেত্র ছেড়ে অন্যত্র।

রানাঘাটে কিছু পারিবারিক কাজও রয়েছে তাই ছুটি নিয়ে এলেন রানাঘাটে। এখানেই তাঁর পঞ্চম পুত্র বিনোদপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কেদারনাথ সংসারে থেকেও যেন নির্লিপ্ত। তাঁর মনে বাজে চৈতন্যদেবের বাণী। কেদারনাথ নবদ্বীপ-কালনা-কাটোয়া আরও তীর্থস্থানগুলো ঘুরে বেড়ান। বাংলার পথেপথে ঘুরেছেন তিনি চৈতন্যদেবের পরিভ্রমিত তীর্থে তীর্থে। সেই পূতপবিত্র ধূলিকণায় অন্বেষণ করেছেন গৌরবময় অতীতকে; তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাকে ভক্তি-বিনম্রচিত্তে।

বাংলায় তখন এসেছে নবজাগরণের যুগ।

ইংরাজী শিক্ষার উৎকট বিস্তার কিছু থিতিয়ে এসেছে। এখন শিক্ষিত সমাজও কিছুটা উদার।

কলকাতায় তখন বিদ্যাসাগর মশায় বিধবাবিবাহের প্রচলন করেছেন, এদিকে আধ্যাত্মিক জগতেও চলেছে পাশাপাশি ব্রাহ্মধর্ম-হিন্দুধর্মের সংঘাত।

তারই মাঝে দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণদেব সনাতন হিন্দুধর্মকে গোঁড়ামির মধ্য থেকে মুক্ত করে সমাজে কালোপযোগী এক ধর্মচেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

ব্রাহ্মধর্মের গোড়ামি, তাদের দলবদ্ধতার ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাব, তাঁর ধর্ম প্রতিষ্ঠা। যে সংঘাত বাইরের থেকে দেখা যায় না—সেটা ঘটেছে জনসাধারণের মনে।

ব্রাহ্মসমাজের তখনকার নেতৃস্থানীয় বলতে কেশব সেন, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, আরও অনেকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁর কাছে আসেন। নানা আলোচনা হয়। রামকৃষ্ণদেব এর মধ্যে সর্বধর্মসাধনার মধ্যে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করেছেন। নারীত্বকে দিয়েছেন দেবীর মহিমা, মানুষের কাছে ধর্মের কঠিন তত্ত্ব সহজকথায় বোধগম্য করে মানুষের মনে ধর্মচেতনার জাগরণ এনেছেন। সকলের জন্য সেখানে অবারিত দ্বার।

আর নরেন ও অন্য উৎসাহী যুবকরাও এসেছে তাঁর সান্নিধ্যে। নরেন ক্রমশ এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে।

রামকৃষ্ণ-প্রভাব তখন সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। একটি চেতনার প্রদীপ জ্বেলেছেন তিনি, সমাজের অন্ধকারে এনেছেন এক আশার আলো। হিন্দুধর্মের তিনি তখন অন্যতম প্রবক্তা।

গঙ্গার প্রবাহ যেমন থেমে থাকে না, সেই ধর্মপ্রবাহও সমাজের বুকে নানা খাতে নানা ভাবেই প্রভাবিত হতে থাকে।

নরেনের কাছে ধর্মভাবনার রূপ তখনও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে নি। রামকৃষ্ণদেব তাঁর ভাবনার চেতনার রং-এ ওঁকে রাঙিয়ে তুলতে চান উত্তরকালের মানুষের সার্বিক কল্যাণব্রতে।

কেদারনাথও এক নব চেতনার জগতে প্রবেশ করেছেন। সেখানে কোন সংঘাত নেই, আছে জানার তৃপ্তি, প্রকাশের আনন্দ। তিনি তখন বৈষ্ণবতত্ত্বের গভীরে অবগাহন করে ধন্য হতে চান।

সঙ্গে সরকারী কাজও চলেছে। কলকাতায় এলেন। তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী মিঃ হেইলি তখন অসুস্থ। তাঁর কথা ভোলেন নি কেদারনাথ। তাঁর কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। তাই দেখা করতে এলেন।

অতীতের কিছু স্মৃতিচারণও হল তাঁদের মধ্যে।

এরপর কেদারনাথ বদলি হলেন আরাতে। সেখানে কাজে যোগ দিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসা চলতে থাকে। সেখানে স্বাস্থ্য ঠিক টেকে না, তাই বদলি নিয়ে এলেন মহিষবেথায়—এখান থেকে বদলি হলেন তাঁর পুরোনো জায়গা ভদ্রকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট-এর পদে।

এলেন ভদ্রকে বেশ কয়েক বছর পর। অতীতে এখানের স্কুলের হেডমাস্টার হয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন। এখানে কিছু পুরোনো বন্ধুরাও ছিলেন। তাঁদের অনেকেই এখন নেই। কেউ চলে গেছেন অন্যত্র, কেউ বা মারা গেছেন। তবু যাঁরা ছিলেন তাঁদের অনেকেই এলেন। কেদারনাথ এখানে কিছুদিন কাজ করেন।

এখন তাঁর মনেও একটা ভাবান্তর এসেছে। আগেকার সেই কেদারনাথ এখন অনেক বদলে গেছেন। তিনি এখন পড়াশোনা নিয়েই থাকেন, লেখার কাজও চলতে থাকে।

কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর অন্তরে একটা ব্যাকুলতাও জন্মেছে। শুধু পড়ে পণ্ডিত হলেই আসল তত্ত্বকে জানা যায় না, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানই বাধা হয়ে দাঁড়ায়, বাধা হয়ে দাঁড়ায় পাণ্ডিত্যের অভিমান। এসব কিছুর ঊর্ধ্বে শ্রীচৈতন্যদেবকে জানতে হলে চাই তাঁর কৃপা। আর সেই কৃপা পেতে গেলে আমিত্বকে বর্জন করে অনুরাগ ভক্তির ধারায় ব্যাকুল প্রার্থনা—নিবেদন।

সেই পরম প্রেয়কে পাবার ব্যাকুলতাই প্রবল হয়ে ওঠে। এ এক অন্তহীন বিরহ। তাই ব্যাকুলতা বেড়েই চলে—কিন্তু কোন পথনির্দেশই পান না। কৃষ্ণতত্ত্ব পড়েন—লিখেছেন কৃষ্ণসংহিতা তবু কৃষ্ণের অতীব করুণাধারায় যেন কোথায় ঠিক রঞ্জিত করতে পারেন নি নিজেকে।

সবই মনে হয় এহ বাহ্য—আগে কহ আর। অন্তরের নিঃস্বতাই যেন বেড়ে চলেছে।

এমনি দিনে তিনি ভদ্রক থেকে বদলি হলেন নড়াইলে।

বাংলাসাহিত্যের আকাশে তখন বঙ্কিমচন্দ্র একটি উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে বিরাজমান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলো বাংলার পাঠকসমাজে আলোড়ন এনেছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন কেদারনাথের কয়েক বছর আগের ছাত্র। তিনিও হিন্দুকলেজেই পড়তেন, সেখান থেকে বি.এ. পাশ করেন। সেই প্রথম বি.এ. পরীক্ষা নেওয়া হল, সেইবার বঙ্কিমচন্দ্র গ্র্যাজুয়েট হয়ে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পদ লাভ করেন। সরকারী চাকরিতে থেকেই তিনিও লেখাপড়ার কাজ করে চলেছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ছাত্র তিনি—তবু ক্রমশ তার মনেও কৃষ্ণভাবনার প্রকাশ ঘটতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন নড়াইলের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কেদারনাথ এলেন এখানে বদলি হয়ে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে এখানের চার্জ বুঝিয়ে দিতে রইলেন কয়েকদিন। তখন কেদারনাথের সঙ্গে শুধু সরকারী কাজ নিজেই নয়, দুজনেই মূলত সাহিত্যসেবী লেখক, তাই তাঁরা লেখাপড়া ধর্মতত্ত্ব নিয়েও আলোচনা করেন।

কেদারনাথ তখন তাঁর বহু পরিশ্রমের ফসল কৃষ্ণসংহিতা শেষ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গেও তাঁদের আলোচনা হয়। যা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল এবং তারই ফলশ্রুতি হিসাবে পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত' রচনা করেছিলেন।

ভাবের আদানপ্রদান—এ তো লেখকদের মধ্যে ঘটেই থাকে।

আমরা দেখেছি কেদারনাথের জুনিয়ার আর এক ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট রমেশচন্দ্র দত্তকেও। তিনিও কেদারনাথের স্নেহভাজন ছিলেন। তাঁদের মধ্যেও আলাপ আলোচনা হতো।

'কৃষ্ণসংহিতা' লেখার থেকেই রমেশচন্দ্র যে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর 'ভারতের ইতিহাস' লেখেন একথা অনেকেই ভাবেন। হয়তো এর মূলেও সত্য কিছু ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের যোগাযোগ পরবর্তী কালেও ঘটেছিল এবং কেদারনাথের গ্রন্থের ভূমিকাও বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, সে প্রসঙ্গে পরে আসা যাবে।

কেদারনাথ নড়াইলে এসে এখানকার পরিবেশ দেখে তৃপ্ত হন। শান্ত ছায়াস্নিগ্ধ ছোট শহর। মানুষজন এখানে সৎ সজ্জন আর ধর্মভাবাপন্ন। সন্ধ্যায় অনেক জায়গায় ধর্মালোচনা হয়—কীর্তনগান হয়।

কেদারনাথও ক্রমশ এখানের সমাজের সঙ্গে মিশে যান। যোগ দেন ওদের ধর্মসভায়।

তখন কেদারনাথ কৃষ্ণভাবনার গহনে ডুবে রয়েছেন। কৃষ্ণসংহিতায় শ্রীকৃষ্ণের দশাবতার-এর বর্ণনাও করেন। তাঁর ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মতই—যা সেদিন তিনি প্রকাশ করেছিলেন তাতে তাঁর বৈজ্ঞানিক চেতনার পরিচয়ও মেলে। হয়তো এই ব্যাখ্যা তিনি করেছিলেন দিব্যদৃষ্টির কোণ থেকে যা আজকের দিনে স্বীকৃতিলাভ করেছে।

তিনি বলেছেন—

যদযদ্ভাবগতো জীবস্তৎসদ্ভাবগতো হরিঃ।
অবতীর্ণা স্বশক্ত্যা স ক্রীড়তীব জন্যৈ সহ॥
মৎস্যেষু মৎস্যভাবো হি কচ্ছপে কর্ম্মরূপকঃ।
মেরুদণ্ডযুতে জীবে বরাহভাবধান হরিঃ।
নৃসিংহো মধ্যভাবো হি বামনা ক্ষুদ্রমানবে।
ভার্গবোইসভ্যবর্গেষু সভ্যে দাশরথিস্তথা॥
সর্ব্ববিজ্ঞানসম্পন্নে কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।
তর্কনিষ্ঠনরে বুদ্ধ নাস্তিকে কল্কিজেব॥

সৃষ্টির আদিকাল থেকে শ্রীকৃষ্ণের এই দশ অবতারকে তিনি ব্যাখ্যা করেন।

মায়াবদ্ধ জীব যে ভাব প্রাপ্ত হইয়া যে যে স্বরূপ পাইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ ও তাহার প্রাপ্তভাব স্বীকারকরত নিজ অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা তাহার সহিত আধ্যাত্মিক রূপে অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। জীব যখন মৎস্যাবস্থাপ্রাপ্ত, ভগবান তখন মৎস্যাবতার। মৎস (জেলিফিস) নির্দণ্ড (Spinelcss); নির্দণ্ডতা ক্রমশ বজ্রদণ্ডাবস্থা (fixed spine) হইলে কূর্মাবতার। বজ্রদণ্ড ক্রমশ মেরুদণ্ড হইলে বরাহ অবতার হন। নবপশুভাবগত জীবে নৃসিংহ অবতার; ক্ষুদ্রমানবে বামনাবতার, মানবের অসভ্যাবস্থায় (আদিবাসী) পরশুরাম, সভ্যাবস্থায় রামচন্দ্র। মানবের সর্ববিজ্ঞানসম্পত্তি হইলে স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণচন্দ্র আবির্ভূত হন। মানব তর্কনিষ্ঠ হইলে ভগবদ্ভাব বুদ্ধ এবং নাস্তিক হইলে কলি—এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

কৃষ্ণসংহিতায় তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব প্রসঙ্গে বিশেষ সারগর্ভ আলোচনা করেন। এবং চৈতন্যচরিতামৃতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যেভাবে ভাগবতকে ব্যাখ্যা করেছেন সেই ধারাতেই ভাগবতের বিশেষ আলোচনা করেন।

এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হল যখন কেদারনাথ নড়াইলেই রয়েছেন। এই গ্রন্থটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সুধী পাঠকসমাজে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কৃষ্ণপ্রসঙ্গে এমন সারগ্রাহী আলোচনা ইতিপূর্বে কোন গ্রন্থে হয় নি। পাঠকসমাজ এসব তথ্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন না।

কৃষ্ণপ্রসঙ্গে সহজিয়া বিকৃত ধর্মভজাদের যে ব্যাখ্যা ছিল সেটা যে ভ্রান্ত অর্থহীন সেটাও জনসমক্ষে প্রচারিত হল। তাঁরা কৃষ্ণতত্ত্ব—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শ্রীমদ্‌ভাগবত প্রসঙ্গে নতুন এক চেতনার জগতে উন্নীত হলেন। জনসাধারণ এবার আরও আগ্রহী হয়ে উঠলো এসব বিষয়ে। কেদারনাথের কৃষ্ণসংহিতা প্রকৃত ধর্মপ্রচারক-এর বিরাট ভূমিকাই নিয়েছিল সেদিনের সমাজে।

দেশবিদেশেও এই বই-এর প্রচার হয়েছিল। এই গ্রন্থ পাঠ করে লণ্ডন থেকে প্রখ্যাত প্রাচ্য বিশারদ ডঃ রেইন হোল্ড রস্ট কেদারনাথের এই গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করে লেখেন—

A long and painful illness has prevented me from thanking you earlier for the kind present of your SreeKrishna Samhita. By representing Krishna's character and his worsip in a more sublime and transcendent light than has hitherto been the custom to regard him, you have rendered an essential service to your co-religionists.

লণ্ডনেও কেদারনাথের নাম ইতিপূর্বেই প্রচারিত হয়েছিল। তাঁর 'Maths of Orissa' বই-এর জন্য তাঁকে মেম্বার অফ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্য করা হয়েছিল।

তাঁর এই গ্রন্থও সেই সমাজে আদৃত হয়েছিল। কেদারনাথ জানতেন পাশ্চাত্ত্যের মানুষের কাছেও কৃষ্ণকথা চৈতন্যদেবের কথা শ্রীমৎভাগবত এসব প্রচারিত করা খুবই প্রয়োজন। এই সম্পদে সব মানবজাতিরই অধিকার।

তাই এই কৃষ্ণসংহিতা গ্রন্থ তিনি আমেরিকার প্রখ্যাত চিন্তাবিদ এবং সংস্কৃতিপ্রেমী পণ্ডিত মিঃ র‍্যালপ ওয়ালডো এমার্সনকে পাঠালেন। তিনিও গ্রন্থটির জন্য কেদারনাথকে প্রাপ্তিস্বীকার করে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

নড়াইলে থাকতে আর একটি মূল্যবান ধর্মগ্রন্থ প্রকাশ করেন তিনি। গ্রন্থটির নাম 'কল্যাণ কল্পতরু'। এই গ্রন্থে তিনি মানুষের সামাজিক কল্যাণ প্রকাশেই মূলত আলোচনা করেন। উপদেশ উপলব্ধি প্রভৃতি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনী বিজ্ঞান-এর এক বিশদ সুগভীর পাণ্ডিত্য আর অন্তরঙ্গ উপলব্ধির সুরই ধ্বনিত হয়। এসব তত্ত্বকথা পাঠকসমাজের কাছে নতুন এক চিন্তার ভাবনার দিগন্ত উন্মোচিত করে দেয়।

এসব রচনার মধ্যে কেদারনাথের উপলব্ধি অনুরাগ পাঠকমনকে আপ্লুত করে। অনেকেই বলেন—এসব বৈষ্ণব যুগের সাধক লেখক নরোত্তম দাসের রচনার মতই মূল্যবান এবং হৃদয়গ্রাহী।

সব খ্যাতিতেই অবিচল থাকেন কেদারনাথ। তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে খ্যাতির লোভ থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি এই সব রচনার মধ্য দিয়ে জীবনদেবতার নির্দেশিত কাজই করে চলেছেন।

মনে হয় তিনি উপলক্ষ—যন্ত্রমাত্র। যন্ত্রী সেই মহাপ্রভু চৈতন্যদেবই। এসব তাঁরই করুণা। তাই মাথা নীচু হয়ে আসে তাঁর শ্রীচরণে।

নড়াইলের সাধারণ মানুষও কেদারনাথকে শ্রদ্ধা করেন। সহজ মানুষ তিনি। কাছারির বাইরে সকলেরই প্রিয়জন। অকুণ্ঠচিত্তে তিনি ধর্মসভায় আসেন। ভাগবৎকথা শোনান। নামকীর্তনে যোগ দিয়ে পান অপরিসীম তৃপ্তি। তাঁর মত ভক্তের সাহচর্য পেতে শহরের বহু মানুষই আসতে থাকেন ধর্মসভায়।

নড়াইল শহরে গড়ে ওঠে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ। চৈতন্যদেবের কথাও এরা নতুন করে ভাবছে। উদ্দীপিত হতে থাকেন সকলে নতুন ভাবতরঙ্গে। এই নব আন্দোলনের পুরোধা কেদারনাথই। উলায় যে ভগবৎ-প্রেমের বীজ শিশুকালে রোপিত হয়েছিল, কালক্রমে দিনাজপুরে চৈতন্যদেবের কৃপায় তা অঙ্কুরিত হয়, পুরীর পুণ্যপরিবেশে তা সমৃদ্ধতর হয়ে নড়াইলে এসে এক বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে।

চৈতন্যদেবই এসবের মূল—তাঁর করুণাই এক শূন্যজীবনকে মহাজীবনে পরিণত করে তাঁর অঞ্জলি পূর্ণ করে দিয়েছে এক অমৃত স্পর্শে।

কেদারনাথ নড়াইলে থাকাকালীন পরিকল্পনা নেন—এই কৃষ্ণকথা—চৈতন্যদেবের কথা—

ভাগবৎতত্ত্ব জনসমক্ষে শুধু মুখে কীর্তন, আলোচনার মাধ্যমেই এবং লেখার মধ্য দিয়েই প্রচার করতে হবে। ছড়িয়ে দিতে হবে দূরদূরান্তরের মানুষের কাছে এই সম্পদ।

তখনকার দিনে পত্রপত্রিকা অনেকই ছিল। সেসব পত্রপত্রিকায় খবরাখবর, রাজনৈতিক প্রবন্ধ এইসব ছাপা হতো।

ধর্মতত্ত্ব—বিশেষ করে বৈষ্ণবতত্ত্ব ও ভাগবৎ এসব নিয়ে ভাবনাই তেমন হতো না, তাই পত্রপত্রিকাও তেমন কিছু ছিল না।

এই অভাব দেখেই তিনি একটি পত্রিকা প্রকাশ করার কথা ভাবলেন। আর তাঁর চেষ্টাতেই এবং উদ্যোগে জন্ম নিল নতুন সজ্জন তোষিণী পত্রিকা।

কেদারনাথ জীবিত থাকাকালে এই পত্রিকার প্রায় সতেরোটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এতে কেদারনাথের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর যোগ্যপুত্র ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহাশয় এই পত্রিকাটি বেশ কয়েকটি ভাষাতেই প্রকাশ করতে থাকেন। এই পত্রিকার ইংরাজী নাম ছিল 'The Humanist'. এটি বাংলাদেশেই নয়—ভারতের বহুস্থানে, বিদেশেও সমাদৃত হয়েছিল।

কেদারনাথ লেখাপড়ার কাজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। সরকারী কাজের দায়িত্ব পালন করেন, কোন কাজেই খুঁত নেই। তাঁর তবু মনে শান্তি নেই।

কি একটা শূন্যতার বেদনা জাগে অন্তরমনে। সবই হচ্ছে অথচ কোথায় একটা অভাব রয়ে গেছে। শান্তি পান না। বার বার মনে হয়—এহ বাহ্য, আগে কহ আর।

বর্তমান নয় ভবিষ্যতের কথাই ভাবেন। মনে পড়ে পুরীর রঘুনাথ বাবাজীর কথা। তাঁর দীক্ষা তো আজও হয় নাই। শ্রীচৈতন্যদেব এখনও দীক্ষাগুরুর সন্ধান দেন নি। অন্তরমনে সেই হাহাকারই রয়ে গেছে। প্রকৃত শান্তির স্পর্শ এখনও পান নি। সেই অমেয় স্পর্শ থেকে তিনি বঞ্চিতই রয়েছেন। গুরুহীন জীবন তাঁর কাছে কাণ্ডারীহীন নৌকার মতই মনে হয়। যে কোন মুহূর্তে অতলে তলিয়ে যাবেন। তাঁর একান্ত নির্ভর একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবই।

জীবনের এই শূন্যতার বেদনার কথা তাঁকেই জানান কেদারনাথ। এই শূন্যজীবনে কি পূর্ণতার আশ্বাস আসবে না প্রভু!

ভক্তের সেই কাতর প্রার্থনা ভগবানকেও বিচলিত করে। একদিন তিনি স্বপ্নাদেশ পান—পান সারা অন্তরে কি অপূর্ব আনন্দের আবেশ। চৈতন্যদেব তাঁর প্রার্থনা শুনেছেন। নির্দেশ আসে—তাঁর দীক্ষা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। গুরুদেবের পরিচয়ও পান তিনি।

এবার পরম ভাগ্য। সবই সেই চৈতন্য মহাপ্রভুরই কৃপা। অলক্ষে থেকে তিনিই সব ঘটিয়ে চলেছেন ঠিক সময়মত। শুধু চাই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ।

এর ক'দিন পরই কেদারনাথ পত্র পান পরম-বৈষ্ণব বিপিন বিহারী দাসের কাছ থেকে। তিনি নড়াইলে এসেছেন আর এখানে এসে তাঁকে দীক্ষাও দেবেন।

যেন সবই পূর্ব নির্ধারিত। যথাসময়ে যা ঘটার সবই পর্যায়ক্রমে ঘটে চলেছে তাঁর জীবনে। নাহলে এমন যোগ্য গুরু নিজে এসে তাঁকে দীক্ষা দেবেন কেন?

বৈষ্ণবপ্রধান বিপিনবিহারী দাস বৈষ্ণবসমাজের পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি!

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছিলেন শ্রীল বংশীবদনানন্দ ঠাকুর। তিনি ছিলেন চৈতন্যদেবের লীলাসহচরদের অন্যতম এবং খুবই প্রিয়পাত্র। চৈতন্যদেব সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিয়ে নীলাচলে চলে যাবার সময় তাঁর উপরই মা আর তাঁর স্ত্রীর—সংসারের দেখাশোনার ভার দিয়ে যান। বংশীবদনানন্দ সংসারী হয়েই চৈতন্যদেবের সেবা করেছিলেন।

শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর স্ত্রী ছিলেন তাঁর আত্মীয়া।

সেই বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীল বংশীবদনানন্দের বংশধর এই বিপিনবিহারী ঠাকুর। তিনিও পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব—সর্বজনপূজিত। তিনি নড়াইলে এসে দীক্ষা দেন কেদারনাথকে। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন কেদারনাথ। সারা অন্তরমন ধর্মীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সংসারের প্রত্যহের জ্বালাযন্ত্রণার মধ্যেও তিনি সন্ধান পান অমেয় শান্তির।

নিজেই লিখেছেন এই প্রসঙ্গে—

বিপিনবিহারী হরি তাঁর শক্তি অবতরি।
বিপিনবিহারী প্রভুবর।
শ্রীগুরুগোস্বামীরূপে দেখি মোরে ভবকূপে।
উদ্ধারিল আপন কিঙ্কর॥

গুরুদেবের এই অহেতুকী কৃপায় তিনি ধন্য। তাঁর দৃষ্টি যেন আরও স্বচ্ছতর হয়ে আসে, চেতনায় আসে সত্যসুন্দরের স্পর্শ।

তাঁর রচনায় আসে হৃদয়ের আবেগ—ভক্তির স্পর্শ। ধন্য তিনি। তাঁর ভাগবত মরীচিমালা গ্রন্থের উপসংহারে তিনি গুরুদেবের প্রতি তাঁর অন্তরের অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

বিপিনবিহারী প্রভু মম প্রভুবর।
শ্রীবংশবদনানন্দ বংশশশধর॥
সেই প্রভুপাদের আজ্ঞা শিরে ধরি।
ভাগবত শ্লোকাস্বাদ নিরন্তর করি॥

নড়াইলে থাকাকালীন তাঁর দীক্ষার পর কেদারনাথের মন চায় বৃন্দাবনধামে যেতে। সেই যমুনাতীর—ছায়াঘন বনবীথি, দেববিগ্রহ, রাধাকৃষ্ণ নামধ্বনিত পরিবেশ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে। যেতে হবে মধুবৃন্দাবনে।

তাই তিনমাসের ছুটি নিয়ে সপরিবারে তার ছোট ছেলেকে নিয়ে একজন কাজের লোক সঙ্গে করে বৃন্দাবনধামে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এর আগেও বৃন্দাবনে এসেছিলেন ছাপরায় থাকতে। তখনকার মন আজ বদলে গেছে। চিত্তে এসেছে জীবনদেবতার প্রসাদে প্রসন্নতা, মন কৃষ্ণঅনুরাগে রঞ্জিত, আজ বৃন্দাবন তাঁর কাছে মধুবৃন্দাবনেই পরিণত হয়েছে। যেন তাঁর দিব্য অনুভূতির উদয় হয়।

এই সেই লীলাস্থলী—পবিত্র নিধুবন—শ্যামকুণ্ড—রাধাকুণ্ড, গিরিগোবর্ধন—যমুনাতীর। অন্তরমনে ওঠে কি এক বিচিত্র সুর, কি এক অনুভূতি।

তীর্থস্থানে ঘোরেন। মন্দিরে যমুনার তীরে সাধুদের কুঠিরে। বৃন্দাবনে যুগ যুগ থেকে বহু সাধু মহাত্মা সাধক আসেন। কেউ কেউ এই পবিত্র ভূমিতে রয়ে গেছেন। তাঁদের কুঠিরে যান কেদারনাথ, সাধ্যমত সেবা করেন। তাদের সান্নিধ্যে এসে তাঁর মন পায় স্বর্গীয় আনন্দের স্পর্শ।

রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জেও আসেন। পূত পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করে, এখানে প্রসাদও পান।

এই সময় কেদারনাথ হঠাৎ জ্বরে পড়েন।

বৃন্দাবনে পরম আনন্দে তিনি ঘুরছেন—হঠাৎ শয্যাগত হতে তাও বন্ধ হয়ে যায়। কেদারনাথ চৈতন্যদেবের কাছে প্রার্থনা করতে থাকেন, জ্বরটা আপাতত বন্ধ করে দাও দেবতা—যতদিন বৃন্দাবনে আছি ততদিন সুস্থ রাখো, এই পরম পুণ্যফল কিছু অর্জন করতে দাও, তারপর ফিরে গেলে জ্বর আসুক ক্ষতি নেই। এই কয়েকদিন আমাকে সুস্থ করে দাও।

আশ্চর্যের কথা এরপরই কেদারনাথের জ্বরও সেরে যায়। তিনি আবার বিভিন্ন মন্দিরে কুঞ্জেও যেতে থাকেন।

রূপদাস বাবাজীর কুঞ্জেই তিনি দর্শন পান পূজ্যপাদ শ্রীজগন্নাথ বাবাজীর।

জগন্নাথ দাস বাবাজী তখন বৃদ্ধ, কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মধ্যমণি, সিদ্ধপুরুষ, মহাত্মা। তিনিও কেদারনাথকে দেখে তাঁর দিব্যদৃষ্টি দিয়ে চিনতে পারেন ওঁর প্রকৃত স্বরূপ। গৃহী হয়েও পরম বৈষ্ণব শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বহুগুণের যোগ্য আধার আর চৈতন্যদেবের কৃপাধন্য।

জগন্নাথ দাস বাবাজী বছরে দু' মাস থাকেন বৃন্দাবনে আর দু' মাস থাকেন তাঁর কুলীনগ্রাম আশ্রমে। সাধনভজন নিয়েই মগ্ন। তবু তিনি কেদারনাথকে স্নেহভরে কাছে টেনে নেন, ক্রমশ কেদারনাথও তাঁর মত মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসে অনেক কিছুরই সন্ধান পান।

জগন্নাথ দাস বাবাজীও কেদারনাথকে অনেক উৎসাহ দেন এই মহৎ প্রয়াসে এবং বৈষ্ণব তত্ত্ব প্রসঙ্গে বহু সারগর্ভ আলোচনা করেন। কেদারনাথ তাঁর কাছে ঋণী—অনেকেই ভাবেন তিনিই ছিলেন কেদারনাথের দীক্ষাগুরু। জগন্নাথ দাস বাবাজীর উৎসাহেই পরবর্তীকালে কেদারনাথ চৈতন্যদেবের প্রকৃত জন্মভূমির সন্ধান শুরু করেন এবং তিনিই প্রকৃত নিমাইয়ের জন্মস্থান আবিষ্কার করে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করেন উত্তরকালের মানবকল্যাণের জন্য। এবার বৃন্দাবনে এসে কেদারনাথ ধন্য। নানাভাবে তাঁর অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে শান্তির স্পর্শে। এই পুণ্যভূমি তাঁর জীবনে এক পরম আশ্বাস আনে। তীর্থদেবতা তাঁর শূন্যঝুলি সুফলে পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন।

এইসময় তিনি আর একটা ভালো কাজ করতে পেরেছিলেন। এই সময় বৃন্দাবন মথুরা গিরিগোবর্ধন রাধাকুণ্ড রাধিকার জন্মভূমি বর্ষাণ এইসব অঞ্চল ছিল অনেক নির্জন আর বনে ঢাকা।

তীর্থযাত্রীরা তবু অনেক কষ্ট করেই এসব তীর্থপরিক্রমায় যেতেন। পথে ছিল বনঝারা সম্প্রদায়ের ডাকাতদের আধিপত্য। তারা নির্জন বনেপ্রান্তরে তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ করে তাদের টাকাপয়সা সব কিছু কেড়ে নিত, বাধা দিতে গিয়ে অনেক নিরীহ তীর্থযাত্রী আহত অনেকে নিহতও হোত।

তাদের ভয়ে তীর্থযাত্রীরা সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত। কারণ কখন যে তারা তীর্থযাত্রীদের আক্রমণ করবে তার কোন স্থিরতা ছিল না।

সরকার থেকেও তীর্থযাত্রীদের উপর এই অত্যাচারের কোন প্রতিকার তেমন করা হতো না। বিদেশী তীর্থযাত্রীরা সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরতো, পুলিশের কাছে তারা যেতো না।

কেদারনাথ বৃন্দাবনধামে থাকাকালীনই বেশ কিছু তীর্থযাত্রীদের উপর আক্রমণ ঘটে গেল। কেদারনাথ সব শোনেন তাদের কাহিনী। নিজেও পাল্কীতে করে এইসব তীর্থধামে যেতে যেতে ডাকাতদের ভয়ও পেয়েছিলেন। দেখেছিলেন সর্বস্বান্ত যাত্রীদেরও। ডাকাতদের এই অন্যায়ের প্রতিবাদ তাঁকে করতেই হবে। ওই ডাকাতদের শাস্তি দিতেই হবে যাতে তীর্থযাত্রীরা নিরুদ্বেগে বৃন্দাবন ক্ষেত্র দর্শন করতে পারেন।

স্থানীয় সরকারী কর্তাদের কাছে নিজেই গেলেন এবার এর প্রতিকারের জন্য। সেখানে নিজের পরিচয়ও দেন। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা তাঁর, এবার সেখানকার প্রশাসনের টনক নড়ে ওঠে।

এতদিন তারাও এসব শুনেও শোনে নি। এবার সরকারী ভাবে চাপ আসবে, তাই ক'দিনের মধ্যে বনঝারা ডাকাতদের আস্তানায় হানা দিয়ে বেশ কিছু ডাকাতকে বামাল ধরে চালান দেওয়া হল। কড়া পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হল ওই অঞ্চলে যাতে আর কোন ডাকাতির ঘটনা না ঘটে।

পুলিশের তৎপরতায় ডাকাতরা ধরা পড়তে বাকীরাও পালিয়ে যায় এলাকা ছেড়ে। এবার তীর্থযাত্রীদের পথও সুগম হয়। এরপর বেশ কিছুদিন আর কোন ডাকাতিই হয় নি। তীর্থযাত্রীরা নিশ্চিন্তে এইসব তীর্থ পরিক্রমা করতে পারতেন।

তীর্থযাত্রীরা, বৃন্দাবনের পাণ্ডা-পূজারীরাও তাঁর এই সৎ প্রচেষ্টার অনেক সাধুবাদ দেন। এতদিনের একটা কঠিন সমস্যার সমাধান করেন তিনি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে।

এবার ঘরে ফেরার পালা। জগন্নাথ দাস বাবাজীর কাছে প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে গেছেন, বাবাজী তাঁকে একটি শালগ্রামশিলা দিয়ে বলেন—এটি গিরিধারী শিলা, এর নিত্যপূজা করবে।

বাবাজীর আশীর্বাদ স্বরূপ ওই শিলাটি তিনি নিয়ে আসেন। ফেরার পথে আসেন রামজন্মভূমি অযোধ্যায়। সরযূতে স্নান করে রামচন্দ্রকে দর্শন সেরে এলেন লখনউ। সেখান থেকে কাশী ধামে ক'দিন কাটিয়ে মা অন্নপূর্ণার দর্শন সেরে ফিরলেন এবার কলকাতায়।

তাঁর ছেলেরা তখন কলকাতার এক ভাড়াবাড়িতে রয়েছে। এবার নড়াইল থেকে বদলী হয়ে এলেন যশোর শহরে।

॥ ২৩ ॥

যশোরে এসে তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে।

ছেলেবেলা থেকেই তাঁর চোখের দোষ ছিল, কম দেখতেন। তাঁর বাঁ চোখটা তবু ঠিক রইল কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ডান চোখ নিয়ে। অত্যধিক পড়া-লেখার কাজও চলেছে। ডান চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে, সব কেমন অস্পষ্ট দেখতে থাকেন।

চিকিৎসাও চলছে, কিন্তু তেমন কোন ফল হয় না, এদিকে লেখা-পড়ার কাজেরও বিরাম নেই। এবার ছুটি নিয়ে ভাবতে থাকেন এতদিন এখান ওখানে যাযাবরের মত ঘুরেছেন, এবার একটা স্থায়ী নিবাস তৈরী করতে হবে।

স্ত্রী ভগবতী দেবীর কাছে মনে হয় শহরের কোলাহল থেকে দূরে রাণাঘাটেই বাড়ি করবেন তারা। সেখানেই থাকবেন। রাণাঘাট তাঁরও চেনা হয়ে গেছে কয়েকবার থাকার জন্য। তাছাড়া তাদের প্রথম পক্ষের সন্তান অন্নদার মামারাও রয়েছেন সেখানে। ভগবতী দেবী তাদেরও আপনার ভাই-এর মতই দেখেন, যেমন দেখেন অন্নদাকে নিজেরই বড়ছেলের মত। তাই রাণাঘাটেই থাকতে চান।

কিন্তু কেদারনাথ এবার তাঁর এই সব গ্রন্থ, আরও বহু বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ অতীতের অন্ধকার থেকে আহরণ করে পুনঃপ্রচার করার কাজই করতে মনস্থ করেন। সজ্জনতোষিণী পত্রিকাও ছাপাতে হবে, তার কাজ বন্ধ রাখা যাবে না।

এইসব প্রচার-প্রকাশনার কাজের জন্য কলকাতার বুকেই থাকা দরকার। নিজস্ব একটা প্রেসও থাকবে সেখানে, তাই কলকাতাতেই একটি বাড়ির সন্ধান করতে থাকেন।

খোঁজাখুঁজির পর বেশ কয়েকটা বাড়িও দেখলেন—তার মধ্যে মানিকতলা অঞ্চলে ১৮১নং মানিকতলা স্ট্রীট-এ (বর্তমানে এর নাম রমেশ দত্ত স্ট্রীট, এই রমেশ দত্ত অতীতে তাঁর স্নেহভাজন ছিলেন) একটা বাড়ি দেখে পছন্দ হল।

ছয় হাজার টাকা দাম দিয়ে বাড়িটা কিনে তাকে মেরামত করে নতুন সাজে সাজানো হল, এই বাড়ির নাম করলেন ভক্তিভবন।

এই বাড়িতে বহু বৈষ্ণব জন, বিদগ্ধপণ্ডিত, তৎকালীন সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষের পদধূলি পড়েছিল। এই ভবন থেকেই কেদারনাথ তাঁর বৈষ্ণব ধর্ম এবং বৈষ্ণব সাহিত্য প্রচার-প্রসারের

প্রকৃত কর্মযজ্ঞ শুরু করেন।

নবনির্মিত ভক্তিভবনে প্রতিষ্ঠিত করা হল জগন্নাথ দাস বাবাজীর দেওয়া পবিত্র গিরিধারী শিলাকে। সপরিবারে গৃহপ্রবেশ করলেন কেদারনাথ ভক্তিভবনে।

এবার বয়স বাড়ছে, কাজের চাপও বাড়ছে। তিনি বদলি হয়ে এলেন বারাসতে। যশোরে তাঁর শরীরও ভেঙে পড়ছিল। চোখের অসুখও বাড়ছে। তাই কলকাতার কাছাকাছি কোন জায়গাতে তিনি বদলি চেয়ে তৎকালীন কমিশনার মিঃ পিকক্-এর কাছে আবেদন করেন।

মিঃ পিকক্-ও জানতেন কেদারনাথকে। তাঁর কর্তব্যপরায়ণতা, নিষ্ঠা আর সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠার কথাও জানতেন। ব্যক্তিগত ভাবেও চিনতেন কেদারনাথকে।

তাই মিঃ পিকক-ই তাঁকে কলকাতার কাছাকাছি বারাসতে বদলি করে আনলেন যশোর থেকে।

তবু চোখের অসুখ কমে না। সরকারী চাকরীও করেন নিষ্ঠাভরে আর বাকী সময় কাটে লেখাপড়ায় আর গ্রন্থরচনার কাজে। এই তাঁর কৃষ্ণসেবা। জীবনের পরম সত্য, বৈষ্ণব ধর্মের কথা এবার সমাজের বহু শিক্ষিত মানুষ ওই সব গ্রন্থ পড়ে নতুন করে ভাবছেন। সেই রত্নভাণ্ডারের দ্বার তিনি উন্মুক্ত করে চলেছেন একালের মানুষের কাছে। এ কাজে তিনি তাঁর জীবনদাতার কাছ থেকেই সাড়া পান, এক অলক্ষ্য শক্তি যেন সঞ্চার করে তাঁর ক্লান্ত অসুস্থ দেহে নতুন উৎসাহ, যা তাকে এই অক্লান্ত পরিশ্রম করতে শক্তি যোগায়।

চোখের চিকিৎসা সুরু করেন এলোপ্যাথিক ডাক্তারের কাছে। কিছু ফলও হয়, তবু ঠিক মত সারে না। ডাক্তারবাবু বলেন—প্রোটিনের অভাব রয়েছে আপনার, রোজ মাছের মুড়ো খেতে হবে, তাতে প্রোটিন ফসফরাস এসব আছে, এই সব পথ্য আপনাকে নিতে হবে।

নিরামিষ খান তিনি, তাতেই অভ্যস্ত। এবার এইসব আমিষ খাদ্যের নির্দেশ শুনে কেদারনাথ ওই ডাক্তারের চিকিৎসা ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা সুরু করলেন। ওসব অখাদ্য খাওয়া তার পোষাবে না। তাতে যা হয় হোক।

দেখা যায়, হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাতেই তাঁর চোখের অসুখ অনেক কমে আসে। বেশ সুস্থ বোধ করেন এবার।

বারাসতে পোস্টিং হওয়ায় কিছুটা সুবিধা হলো তাঁর। তবু কাজের জন্য তিনি বারাসতেই থাকেন বাংলোয় ছেলেকে নিয়ে আর সপ্তাহান্তে কলকাতায় আসেন ভক্তিভবনে। স্ত্রী, পরিবারের অন্যরা থাকে কলকাতাতে।

তখন নৈহাটি ছিল বারাসতের অধীনে। সেখানেও কাজের জন্য যেতে হতো কেদারনাথকে। নৈহাটির একটা অঞ্চল কাঁঠালপাড়া, বঙ্কিমচন্দ্র তখন এখানে থাকতেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে কেদারনাথের পরিচয় ছিল আগে থেকেই, ইতিপূর্বে তাঁদের দুজনের মধ্যে লেখাপত্র নিয়ে, শাস্ত্রাদি নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। সুতরাং এখন কেদারনাথ এদিকে এলে তাঁর কাছে আসেন।

বঙ্কিমচন্দ্র তখন খ্যাতির মধ্যগগনে। নিজেও সুপণ্ডিত আর পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ছাত্র। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র' নামে একটি গ্রন্থও রচনা করেছেন। পাণ্ডুলিপি তৈরী, এইসময় কেদারনাথকে কাছে পেয়ে তাঁকে সেই পাণ্ডুলিপিটি দেখতে বলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে কেদারনাথের রচিত 'কৃষ্ণসংহিতা' পড়েছেন। কৃষ্ণের স্বরূপ—কৃষ্ণতত্ত্ব তাঁকেও অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু মূলত তিনি হেক্ট-হেগেল-সোপেনহাওয়ার-ভলটেয়ার প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের লেখাই বেশী পড়েছেন। আর সেই চিন্তাধারাতেই অনুভাবিত হয়েছেন।

তিনি 'কৃষ্ণচরিত্র'-কে সেই ভাবনা দিয়েই বিচার করেছেন।

কেদার তিনচারদিন ধরে প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করেই বঙ্কিমচন্দ্রের সেই পাণ্ডুলিপি পড়লেন। তাঁর মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিদগ্ধ পণ্ডিত শক্তিমান লেখক কৃষ্ণচরিত্রকে সঠিক অনুধাবন না করে তাকে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিদীপ্ত দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখেছেন।

কেদারনাথ নিজে শ্রীকৃষ্ণকে আদিপুরুষ-পরমেশ্বর বলেই মানেন। শ্রীমদভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ঋষিকল্প পুরুষ কৃষ্ণদাস কবিরাজও সেই ভাবেই প্রমাণিত করেছেন। তাঁর লীলা মহাদেবতারই লীলা।

বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণকে একজন রাজনীতিজ্ঞ—শাস্ত্রজ্ঞ, দার্শনিক পুরুষ বলেই বিচার করেছেন। কিন্তু তিনি শুধু তাতেই সীমাবদ্ধ নন—এটা তাঁর খুবই আংশিক পরিচয় মাত্র। তাই কেদারনাথ এবার কৃষ্ণতত্ত্ব নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন এবং তত্ত্বগত ভাবে প্রমাণ করেন তাঁর যুক্তির সারমর্ম। বঙ্কিমচন্দ্রও এবার নতুন করে কৃষ্ণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আবার তাঁর পাণ্ডুলিপির পরিমার্জনা করে শ্রীকৃষ্ণকে নতুন ভাবে উপস্থাপিত করেন। পাশ্চাত্য দর্শন সেখানে আর প্রাধান্য পায় নি—বঙ্কিমচন্দ্রও ভাগবত পাঠের মধ্য দিয়ে নতুন অনুভূতির স্পর্শ পান যা তাঁর কৃষ্ণচরিত্রকে স্বমহিমায় প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণের লীলা যে জাগতিকই নয় এও স্বীকার করেছিলেন তিনি। এ নিয়ে পরবর্তী কালে কিছু সমালোচনাও হয়েছিল আধুনিক মতের পাঠকদের কাছে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাতে বিচলিত হন নি। কেদারনাথই ওই কৃষ্ণচরিত্র প্রকাশে যা আলোচনা করেছিলেন তাকেই স্বীকার করে নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রও।

বারাসতের সরকারী কাজের চাপও বেশী। শহরতলী এলাকা—পাটকল-কাপড়ের কল আরও অনেক কলকারখানা আছে। বহু প্রদেশের লোকজন বাস করে ; আর নানা ধরনের মানুষের ভিড়, ফলে কলহ-মারপিট-অসামাজিক কাজ-এর সংখ্যাও বেশী।

প্রশাসক হিসাবে তাই দায়-দায়িত্বও বেড়েছে। নানা সমস্যা এখানে অন্যত্র যা থাকে না। সে সবের মোকাবিলাও করতে হয়। ফলে ব্যস্ততাও বেড়েছে। ওদিকে বারাসতে তখন ম্যালেরিয়ার প্রকোপও কম নয়। কেদারনাথ ম্যালেরিয়াতেও ভুগছেন, তবু এই সময়েও লেখার কাজ চলেছে সমানে, আর সংসারের দায়িত্বও বেড়েছে। কয়েকটি সন্তান—মেয়েও আছে।

ছেলেদেরও যোগ্যশিক্ষা দিয়ে চলেছেন, তাদের পড়াশোনাও দেখেন, মেয়েকেও সৎপাত্রে বিবাহ দেন, মা-স্ত্রী সকলের দিকেই সমান দৃষ্টি। সংসারের সব দায়িত্বও নিষ্ঠাভাবে পালন করেন। এত কিছুর মাঝেও চিত্ত সেই পরমেশ্বরেই সমর্পিত। সংসারে থেকেও সংসারের সব কর্তব্য করেও সংসারের জালে জড়ান নি, লক্ষ্য তাঁর সেই ঈশ্বরের দিকেই ধাবিত।

তাঁর মহাজীবন প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী প্রভুপাদ এ-সি-ভক্তিবেদান্ত স্বামী বলেন—

Bhakti Binod wrote about one hundred books almost. Just imagine ; he was a very responsible officer, a magistrate, and he was a 'grhastha' ; he also had many children. All together he had ten children, and he had to take care of the children, the office of magistrate and sometimes—he was very pious and religious man—he was given extra religious work. He was made superintendent of the Temple of Jagannatha, because the government knew that Bhakti Binod. Thakur was a very highly-advanced religious person, so whenever there was some religious question, he was consulted. So, in spite

of all his responsibilities, as an officer, or as a family man with so many children, he executed his family life very nicely—or else he could not have produced a child such as Bhakti Sidhanta Sarasvati Thakur. At the same time he served the Supreme Lord in so many ways. That is the beauty.

'...because he was sincere, he got the strength from the supreme Lord....If you are sincere, the Supreme will given you sufficient strength.

কেদারনাথ তখন বহু মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য বৈষ্ণব গ্রন্থ সংগ্রহ করে সম্পাদনা করার পর পুনঃপ্রকাশ করে চলেছেন।

পণ্ডিত মোহন গোস্বামী ন্যায়রত্ন ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর বংশধর। তাঁর রচিত 'নিত্যরূপ-সংস্থাপনম্' নামে একটি পাণ্ডুলিপি হাতে এল কেদারনাথের।

মোহন গোস্বামী বিদগ্ধ বৈষ্ণব পণ্ডিত। বৈষ্ণব ধর্ম দর্শন প্রকাশে এটি খুবই মূল্যবান গ্রন্থ।

এই পুঁথিটির সমালোচনা করে কেদারনাথ ইংরাজীতে একটি নিবন্ধ লেখেন। দেবদেবীদের সাকার রূপ প্রসঙ্গে তিনি সারগর্ভ আলোচনা করেন। যুক্তিপূর্ণ এই আলোচনায় তিনি শ্রীজীবগোস্বামী এবং অন্যান্য বৈষ্ণব আচার্যদের মতামতও তুলে ধরেন। ভক্ত প্রহ্লাদ, ধ্রুব এদের ঈশ্বর দর্শন নিয়ে আলোকপাত করেন। দেবদেবীর মূর্তির প্রকাশ সম্বন্ধে এই আলোচনা সেদিন পাঠকদের কাছে খুবই সমাদৃত হয়েছিল।

বারাসত থেকে এবার বদলি হয়ে এলেন শ্রীরামপুরে। আদালতের কাছেই বাংলো। সেই বাংলোয় তাঁর ছেলেদের মধ্যে পড়াশোনার জন্য রাধিকা, কমল এবং বিমলাপ্রসাদ তাঁর কাছে থাকতেন। বাকীরা থাকতেন কলকাতার বাড়িতে।

এইসময় তাঁর মা জগৎমোহিনী দেবী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁরও বয়স হয়েছে। এবার শরীর ভেঙে পড়ে। মায়ের অসুখের খবর পেয়ে কেদারনাথ কলকাতায় আসেন—চিকিৎসা চলছে। কিন্তু কেদারনাথ বোঝেন প্রদীপের তেল ফুরিয়ে আসছে।

এতদিন মা ছিলেন কেদারনাথের সঙ্গী। জীবনের বহু সুখ-দুঃখ-মৃত্যুর তমসার দিনে—কঠিন সংগ্রামের দিনে মা-ই ছিলেন নির্ভর। আজ সেই মা'ও চলে গেলেন।

আজ মনে হয় কেদারের—এ যেন পরম শান্তির আশ্রয়েই মা গেলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁর আত্মার শান্তি আসুক। নিজেরও আজ মা নেই—মনে হয় তাঁর আজ একমাত্র নির্ভরের বস্তু বলতে রইলেন সেই পরমদেবতাই। তিনিই দিয়েছিলেন—আর কাল সমাগত হতে নিয়ে গেলেন।

...মায়ের মৃত্যুর পর কেদারনাথ কিছুদিনের ছুটি নিয়ে গেলেন গয়াধামে।

ফল্গুর তীরে সেই পরমতীর্থ বিষ্ণু পাদপদ্ম আজও স্বমহিমায় কালের ভ্রূকুটি অতিক্রম করেও বিরাজমান।

এই পবিত্র তীর্থে এসে কয়েক শতাব্দী আগে নিমাই পণ্ডিত এক পুণ্য জ্যোতির সন্ধান পেয়েছিলেন।

কেদারনাথ আজ সেই তীর্থদেবতার চরণে মায়ের জন্য প্রার্থনা করেন। পিণ্ডদান করেন। সারা মন কৃষ্ণঅনুরাগে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

সেখান থেকে ফিরে কেদারনাথ বৈষ্ণব মহাজনদের শ্রীপাটে গেলেন। গেছেন আদিসপ্তগ্রামে, গেলেন নিত্যানন্দের সহচর উদ্ধারণ দত্তের জন্মভূমি, গেলেন খানাকুলে পরম বৈষ্ণব অভিরাম ঠাকুরের পুণ্যতীর্থে—বসু রামানন্দের জন্মস্থান কুলিনগ্রামেও গেলেন। সেখানে এখন গড়ে

উঠেছে পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ দাস ঠাকুরের আশ্রম। সেই আশ্রমের মন্দির নির্মাণ কাজেও সহযোগিতা করেন।

মন তখন বৈষ্ণব মধুকর হয়ে ঘোরে। চাই আরও সুষ্ঠু প্রচারক। সমাজের উচ্চকোটির মানুষের সামনে বৈষ্ণবধর্মের মূল স্বরূপটিকে প্রকাশ করার কাজই তাঁর জীবনদেবতার একমাত্র সেবার কাজ।

তাই আরও সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য চাই নিজেদের প্রেস—প্রকাশনা। সজ্জনতোষিণী পত্রিকাও ঠিক মত প্রকাশ করা যাচ্ছে না—অথচ এই পত্রিকাটি পাঠকসমাজে খুবই সমাদৃত হয়েছে। এটিকে নিয়মিত প্রকাশ করা দরকার।

সবদিক ভেবে কেদারনাথ এবার মাণিকতলার বাড়িতে নিজেদেরই ছাপাখানা তৈরী করলেন। নামকরণ করা হলো শ্রীচৈতন্য প্রেস। এবার সজ্জনতোষিণী পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে প্রকাশিত করা যাবে।

বারাসতে থাকাকালীন কেদারনাথের এক উকীল বন্ধু তাকে মহাপণ্ডিত শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টীকা সম্বলিত ভগবৎগীতার এক খণ্ড সংগ্রহ করে দেন।

এই গ্রন্থটি তখন খুবই দুষ্প্রাপ্য, অথচ এরকম অপূর্ব গ্রন্থ খুবই বিরল। পণ্ডিত সমাজ, সাধারণ পাঠকদের কাছে এই সম্পদ তখনও দুর্লভ। কেদারনাথ সেই গ্রন্থ পড়ে ভগবৎগীতার অপূর্ব হৃদয়স্পর্শী ব্যাখ্যায় অভিভূত হন। এটিকে নিজের মন্তব্যসহ প্রকাশ করার বাসনাও জাগে।

কিন্তু নানা কারণে তখন শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী মশাশয়ের গীতা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। এবার নিজের প্রেস তৈরী হতেই সেই সুযোগ এসে যায়।

সেই ভগবৎগীতা আর তাঁর রচিত শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত এই দুটি মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হলো।

এই শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত গ্রন্থে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মদর্শন প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর পরম ভক্ত শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন, বৈষ্ণবতত্ত্বের সেই সারকথাই এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন।

এই অমূল্য ভগবৎগীতা এবং শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত এই গ্রন্থ দুটিই পাঠক সমাজে খুবই সমাদৃত হয়। বৈষ্ণবতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রকৃত তত্ত্ব এবার সমাজের মানুষদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হতে থাকে। আর তাঁর সমাদরও বাড়তে থাকে।

সমাজের বুকে তখন একটা ধর্মচেতনার প্রবাহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের সেই রুদ্র প্রকাশ কিছুটা স্তিমিত। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সমাজে সনাতন হিন্দুধর্মের কিছুটা ভিত রচনা করেছেন। পাদ্রীদের ধর্মান্তর করার কাজ উচ্চসমাজে কিছুটা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

এই পটভূমিকায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রকৃত ব্যাখ্যা আর প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বৈষ্ণব ধর্মকে নিয়ে সমাজের মানুষ এতকাল ব্যঙ্গ করেছে।

—যত ছিল ন্যাড়া বুড়ো
সব হল কীর্ত্তুনে।
কাস্তে ভেঙ্গে গড়ালো কত্তাল॥

অর্থাৎ ব্রাত্যজন পেটের জন্য—স্বার্থের জন্য এই ভেক ধরেছিল বলে এতকাল যারা পরিহাস করেছিলেন তাদের সামনে একে একে প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মকে যেন শতদলের মত এক একটি বর্ণরঙ্গীন পবিত্র পাপড়ি দিয়ে সাজিয়ে প্রকাশিত করে চলেছেন কেদারনাথ।

সাধারণ মানুষ এতদিন ভুলে গেছল এই পরম প্রেমতত্ত্ব-সমৃদ্ধ ধর্মকে। এবার তাঁরাও আকৃষ্ট

হতে থাকেন। এর মূলে কেদারনাথের অক্লান্ত সাধনা—যার উৎসাহ উৎসারিত হয়েছিল কেদারনাথের কাছে চৈতন্যদেবের অসীম করুণায়। এ তাঁরই কাজ। একাজের পাত্র নির্ধারিত করে তিনি পাঠিয়েছেন তাঁকে, কেদারনাথ তাই জীবন-দেবতার চরণে প্রণতিই জানান। সেখানে অহং-এর লেশমাত্র নেই।

ব্যক্তিত্বের স্বপ্নও নেই, আছে নিঃশেষ আত্মনিবেদন। এই সময়ে কেদারনাথ-এর লেখনী মহাপ্রভুর কৃপায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল।

শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃতের প্রচার ঘটেছিল মহাপ্রভুর নির্দেশেই। এই গ্রন্থ তিনি বৈষ্ণব ভক্তিমার্গে সাধনার ক্ষেত্রে বর্ণাশ্রম ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে তত্ত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন।

এই সময়ই রচনা করেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাকষ্টকম্‌কে কেন্দ্র করে সম্বোধনা ভাষ্যম্‌। চৈতন্যদেবের শিক্ষা, তাঁর দর্শনকে পাঠক-সমাজের সামনে তুলে ধরলেন, পরিচিত করালেন তাদের মহাপ্রভুর প্রবর্তিত ধর্মতত্ত্বর সঙ্গে।

একের পর একটা মুক্তা যেন জ্ঞানবারিধি থেকে তিনি তুলে আনছেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিস্মৃতপ্রায় অমূল্য গ্রন্থ মনঃশিক্ষাকে নতুনভাবে প্রকাশিত করলেন বাংলায় তার মমার্থ নিয়ে ভজনদর্পণ ভাষ্যম্‌।

উপনিষদকেও তখনকার মানুষ ভুলতে বসেছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির এই মূল্যবান উপনিষদগুলিকেও তিনি আবার তার টীকা সহ প্রকাশিত করলেন। প্রকাশিত হল 'দশোপনিষদ কর্ণিকা'। উপনিষদ-এর পাঠন পর্বও শুরু হলো।

বিভিন্ন বৈষ্ণব আচার্যরা অনেক ভক্তিমূলক কবিতা সংস্কৃতে রচনা করেছিলেন। বিভিন্ন কালের আচার্যদের সেই সব রত্নকণিকা কালের প্রবাহে হারিয়ে গেছল। কেদারনাথ তাঁদের অনেক কবিতা উদ্ধার করে নিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত করলেন 'ভাবাবলী' নাম দিয়ে।

এসব গবেষণা এবং ভক্তিমূলক কাব্য-কবিতাদি রচনার সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ পাঠকদের মধ্যে দর্শনকে প্রচারের জন্য তিনি সেই সব কঠিন বিষয়বস্তু—তত্ত্ব প্রভৃতিকে সহজ করে তার একটি উপন্যাসও রচনা করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রেম-প্রদীপ উপন্যাস হলেও দর্শন-এব পটভূমিকায় রচিত। আর সেটিও সাধারণ পাঠক মহলে আদৃত হয়েছিল।

শ্রীবিষ্ণু-সহস্রনাম রচনা করেন সংস্কৃত কবিতার ছন্দে। লেখা এবং প্রকাশনার কাজের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে এবার বৈষ্ণব সভা সমিতির কাজও। তাঁর এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি এবার দেখেছেন সমাজের শিক্ষিত সমাজও চৈতন্যদেব এবং বৈষ্ণববধর্ম প্রসঙ্গে আরও কিছু জানতে চান। আর বৈষ্ণব সমাজ যারা এতদিন সমাজের কোণে কোনমতে তাদের অস্তিত্বটুকুই বজায় রেখেছিল মাত্র, তারাও এবার বৃহত্তর সমাজে শ্রদ্ধা সম্মান পাচ্ছেন।

এই উপযুক্ত সময়। বহু ভক্ত সুধীজনকে নিয়ে কেদারনাথ এবার একটি ধর্মসভার প্রতিষ্ঠা করতে চান যেখানে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা, ভাবের আদান প্রদান এবং প্রচারও করা যাবে।

এতকাল কলকাতার শিক্ষিত সমাজে হিন্দুধর্ম প্রচারসভা ছিল। ব্রাহ্মদের প্রবর্তিত ধর্মসভা তো ছিলই, খ্রীশ্চান মিশনারীদের ছিল চার্চ, সেখানে তাদের সভা-আলোচনা এসব হতো।

বৈষ্ণবধর্মের কোন সম্মানজনক পরিচিতি ছিল না। তাদের কোন সভা, কোন সংস্থাও সংগঠিত তেমন হয় নি। হবার ক্ষেত্র বা অবকাশই ছিল না।

কিন্তু এবার সেই ন্যাড়ানেড়ি—কর্তাভজা-সহজিয়াদের মতবাদকে নস্যাৎ করে কেদারনাথের একক সংগ্রাম-সাধনা এবং প্রচেষ্টা বৈষ্ণব ধর্মকে একটি সম্মানজনক স্থানে কিছুটা এনে দিয়েছে। নবচেতনার এই প্রত্যুষে—তাকে সার্থকতর করে তোলার জন্যই এবার অনেকেই এগিয়ে এলেন কেদারনাথের পাশে। প্রতিষ্ঠিত হলো 'শ্রী বিশ্ব বৈষ্ণব সভা'।

এই নামের মধ্যেই প্রকাশ পায় কেদারনাথের বিশ্বজনীনতা। তিনি চৈতন্যদেবের সেই বাণীকে কোনদিনই ভোলেন নি। তিনি বলেছিলেন জগতে সর্বত্র তাঁর নাম প্রচার হবে দেশকালের সীমা পার হয়ে। তাই বৈষ্ণবধর্মকে তিনি বিশ্ববাসীর সামনে বহির্বিশ্বে প্রচারের কথাই ভাবতেন। তাই এই ভাবেই নামকরণ করেন। সরকার লেনের একটা বাড়িতে এই সভায় বহু মানুষ আসতেন আলোচনা হতো।

এ ছাড়া তাঁর নিজের বাড়ি এই ভক্তিভবনেও যথারীতি সভা কৃষ্ণকথা—ভগবৎগীতা এসব পাঠও হতো। বহু ভক্ত আসতেন, সাগ্রহে শুনতেন কেদারনাথের আলোচনা।

এইসব সভায় সমাগত জনের মধ্যে প্রচারের জন্য তিনি একটি পুস্তিকাও রচনা করেন। তার নাম দেন বিশ্ব বৈষ্ণব কল্পাটবী।

এইসব আলোচনা সভায় শ্রোতাদের মধ্যে একজন বিমুগ্ধ শ্রোতা সব সময়েই থাকতেন তিনি কেদারনাথের ছেলে বিমলপ্রসাদ।

কেদারনাথের পুত্রদের সকলেই ছিলেন শিক্ষিত ভদ্র। কেদারনাথ তাঁর সন্তানদেরও যোগ্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে বিমলপ্রসাদ যেন চৈতন্যদেবের বিশেষ আশীর্বাদ-ধন্য বাবার যোগ্যতম পুত্র হয়ে ওঠেন। সুন্দর সুঠাম দেহ, দিব্যকান্তি চোখে বুদ্ধির দীপ্তি, শুদ্ধাভক্তির আধার তাঁর অন্তর।

পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে বাবার ওই কৃষ্ণতত্ত্ব শোনেন মন দিয়ে। সারা অন্তরে জাগে কি অনুরাগ। পরম ভক্তি বিনম্র চিত্তে সংস্কৃত পাঠ করেন। প্রতি সভায় উপস্থিত থেকে ওই সব তত্ত্বের ব্যাখ্যা শোনেন মন দিয়ে।

ক্রমশ বৈষ্ণব শাস্ত্র-বৈষ্ণব ধর্ম প্রসঙ্গে কিছু কিছু জানতে থাকেন আর ততই কৃষ্ণ-ভক্তিতে চিত্ত পরিপূর্ণ হতে থাকে।

কেদারনাথ সরকারী চাকরী লেখাপড়া-প্রকাশনা সভাসমিতিতে ব্যস্ত থাকেন। প্রেসে তখন একটার পর একটা গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে, সজ্জনতোষিণী পত্রিকার সম্পাদনা, ছাপার কাজও চলছে। বিমলপ্রসাদ এসব কার্য দেখতে থাকেন, সংস্কৃত সাহিত্যে প্রগাঢ় জ্ঞান আর তাঁর কর্মদক্ষতায় কেদারনাথও মুগ্ধ হন। কিছুটা নিশ্চিন্ত হন।

তাঁর মনে হয় এসবই মহাপ্রভুরই নির্দেশিত। তাঁর আরব্ধ কাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যই বিমলকে তিনিই এই পথের পথিক করে তুলবেন, সেই আশ্বাস পেয়ে তিনিও তৃপ্ত। এসব তাঁরই করুণা, তাঁরই নির্দেশ।

এবার তাঁর জীবনের বহুদিনের স্বপ্নকে রূপায়িত করার কাজে প্রবৃত্ত হন। বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম প্রামাণ্য গ্রন্থ—চৈতন্যলীলা প্রকাশের প্রধান গ্রন্থ শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত। সাধক বৈষ্ণব কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর দীর্ঘ জীবনের অক্লান্ত সাধনায় এই মহাগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর আয়ু ফুরিয়ে আসছে। তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে এই মহাগ্রন্থ প্রচারের জন্য বৃন্দাবন থেকে বাংলাদেশে পাঠান এর পাণ্ডুলিপি।

তখন পায়ে হেঁটে না হয় গরুর গাড়িতে আসা যাওয়ার রীতি ছিল। গরুরগাড়িতে আসছিল পেটিকার মধ্যে ওই পাণ্ডুলিপি। পথের মধ্যে বিষ্ণুপুর রাজার এলাকায় কোন বনে দস্যুদল সেই পেটিকায় মূল্যবান সোনা দানা আছে ভেবে সেই পেটিকা চুরি করে নেয়।

খবর যায় বৃন্দাবনে। কৃষ্ণদাস বাবাজীও ভেঙে পড়েন। তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের গোস্বামীরা তখনকার বিষ্ণুপুররাজ বীর হাম্বীরের কাছে গিয়ে সেই গ্রন্থ উদ্ধারের আয়োজন করেন। পরে রাজআগ্রহে সেই সম্পদ উদ্ধার করা হলো আর বীর হাম্বীরও সেই মহাগ্রন্থে

মহিমা বুঝতে পেরে বৈষ্ণব হয়ে ওঠেন। তাঁর রচিত কিছু বৈষ্ণব পদাবলী আজও প্রচলিত আছে।

প্রচারিত হয়েছিল চৈতন্যদেবের অপ্রকট হবার পর সেই মহাগ্রন্থ। তারপর তা কালের কবলে বিলুপ্তপ্রায় হয়ে যায়।

কেদারনাথ বহু চেষ্টায় সেই গ্রন্থের সন্ধান পান। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তাঁকে শ্রীচৈতন্যপ্রেমে—কৃষ্ণ-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করে। তাঁর জীবনে আনে এক আলোর সন্ধান। কিন্তু এই মহাগ্রন্থ মূলত ভাগবতের সংস্কৃত শ্লোক দ্বারাই অনুভাবিত। তাকে হৃদয়ঙ্গম করা সাধারণ পাঠকের সাধ্যের বাইরে। তাই অনেকেই তার রসাস্বাদন করতে পারেন না। আর গ্রন্থও তেমন সহজলভ্য নয়।

কেদারনাথ অনুভব করেন শ্রীচৈতন্যদেবকে বুঝতে গেলে এই গ্রন্থ অবশ্যই পাঠ করতে হবে। একে হৃদয়ে গ্রহণ করতে হবে।

শুরু করলেন সেই বিরাট কাজ। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের শ্লোক—তত্ত্বের সহজ অনুবাদ করেন। ব্যাখ্যা করেন সেই ধর্মতত্ত্বের সহজ সুললিত অমৃতময়ী ভাষায়। তাঁর অনুভূতি, ভক্তির পরম প্রকাশ ঘটে এই সব অমৃত ভাষ্যে।

এই কাজ চলছে, এই সময় তাঁর নাম প্রচারিত হয়েছে বাংলার দূর দূরান্তরে। সেখানের ভক্তজনও শুনেছেন তাঁর নাম ও বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রকাশের কথা। কয়াপাট বদনগঞ্জ অঞ্চলে বৈষ্ণবদের কিছু প্রাধান্য ছিল। সেখানের ভক্ত হারাধন দত্ত নামে এক ভদ্রলোক কেদারনাথের কাছে পৌঁছে দেন শ্রীকৃষ্ণ-বিনয় গ্রন্থের একটি কপি। তার তখন জীর্ণ অবস্থা। মূল্যবান এই গ্রন্থটির পুনঃপ্রকাশ করেন কেদারনাথ। কঠিন পরিশ্রম করতে হচ্ছে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের ভাষ্য রচনার কাজে। সরকারী চাকরী তো আছেই। রয়েছে প্রকাশের কাজ। দিনরাতই কঠিন পরিশ্রম করতে হয়। ফলে মাথার যন্ত্রণা শুরু হয়। কাজেও অবসাদ আসে।

এদিকে হাতে এত গুরু দায়িত্ব। অমৃত ভাষ্য শেষ করতেই হবে। মাত্র দু'খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। জনসাধারণও পরবর্তী খণ্ডগুলির জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করে আছে।

কেদারনাথকে অনেক বৈষ্ণব বলেন কপালে খাঁটি ঘি লাগাতে। এসব দ্রব্যগুণ যে আছে তা বিশ্বাস করেন।

আগেও কঠিন রক্তামাশয়ে ভুগেছিলেন। অনেক ডাক্তারি করেও ফল হয়নি। শেষে সেই পেটের অসুখের কবিরাজী ওষুধের ফর্মূলা পেয়েছিলেন এবং সেটা বিদ্যাসাগর মশায়ও দেখে ঠিক আছে জানাতে তাঁর কথামত সেই মূলতানী হিং ও অন্য লতাপাতা দিয়ে তৈরী ঔষধ ব্যবহার করে সেরে ওঠেন।

এবার ঘিও লাগাতে থাকেন।

এই ঘি মালিশ করে ষড় গোস্বামীর অন্যতম শ্রীজীব গোস্বামীও নাকি সুফল পেয়েছিলেন। কেদারনাথ তার উল্লেখ দেখে নিজেও সেই ওষুধ প্রয়োগ করেন আর সুরু হয় কাতর প্রার্থনা।

চৈতন্যদেবই বোধ হয় চান তাঁকে দিয়ে তাঁরই নির্দেশিত কর্ম আরও করিয়ে নিতে। তাই তাঁর কৃপাতেই সেরে ওঠেন কেদারনাথ।

তিনিও বোঝেন এসবই পরম করুণাময়েরই বিধান। তিনি কর্মী-সেবক মাত্র। চৈতন্যদেবের সেবক। তাঁকে রক্ষা করার ভার স্বয়ং তিনিই নিয়েছেন।

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অমৃত-প্রবাহ ভাষ্য সহকারে প্রকাশিত হতে থাকে আর জনসাধারণ এবার সেই সম্পদ পেয়ে অনুভব করেন নি রত্নসম্ভার-কে তাঁরা এতদিন অবজ্ঞায় অবহেলায় দূরে সরিয়ে রেখে নিজেদেরই বঞ্চিত করে এসেছেন কৃষ্ণ করুণাধারার অমৃত স্পর্শ থেকে।

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত স্বরূপও এবার প্রকাশিত হতে থাকে সমাজের মানুষের সামনে।

এই সময় বাংলার ধর্মচেতনার জগতে একটা সাময়িক শূন্যতা নেমে আসে। রামকৃষ্ণদেবের প্রকাশ, তাঁর পরিচিতি এবং প্রচার কলকাতার মানুষের মনে এক নতুন চেতনা জাগরিত করেছিল।

তিনি তখন দেহরক্ষা করেছেন।

তাঁর প্রিয় ভক্ত-অনুরাগীরাও তখন প্রায় ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। কিছু বিশেষ তরুণ ভক্ত তখন ও কোনমতে রামকৃষ্ণদেবের প্রচারিত পথে থেকে তাঁর নির্দেশ পালন করে চলেছেন। নরেন তাঁদের নেতা—কোনমতে বরানগরে একটা ভাঙা বাড়িতে থেকে তাঁরা অর্ধাহারে দিনাতিপাত করছেন।

তবু সেই চেতনার প্রদীপকে জ্বালিয়ে রেখেছেন নিজেদের ত্যাগ এবং সাধনার মধ্য দিয়ে।

ব্রাহ্মধর্মের সেই সোচ্চার প্রচারেও এবার ভাঁটা পড়েছে। তাদের নিজেদের মধ্যেই এবার বিদ্বেষ জেগে ওঠে। কেশব সেন নিজে ছিলেন তাঁদের নেতা। বিদ্বান—সুবক্তা এবং সুলেখকও।

প্রথমদিকে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবক্তা, ক্রমশ রামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে এসে সেই উগ্র প্রচারকও বদলে যান আর পরবর্তীকালে তাঁর ছোট মেয়ের বিয়ে দেন কুচবিহার রাজ পরিবারে।

এই নিয়ে সমাজে মতান্তর শুরু হয়, তার ফলে কেশবচন্দ্র মূল ব্রাহ্মসমাজ ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। পরে তিনিও মারা যান।

ফলে ব্রাহ্মসমাজ এখন দ্বিধাবিভক্ত আর নেতাও তেমন নেই। ফলে তাদের প্রচারেও বাধা পড়ে। একটা শূন্যতা জাগে।

এই সময় কেদারনাথের বৈষ্ণবধর্মের মহিমা প্রচার, গৌরাঙ্গদেবের প্রসঙ্গে এইসব ব্যাখ্যা—সাধারণ মানুষের মনে এক নতুন আলোর সন্ধান আনে। এ যেন সবই মহাপ্রভুর সামনে অতীতে উদ্‌ঘাটিত হয়েছিল। তাই ঠিক সময়েই আবার যোগ্য পুরুষকে দিয়ে নিজের স্বরূপকে তিনি প্রকাশ করছিলেন—সমাজের তাপ-সন্তপ্ত মানুষের কাছে।

মানুষ আবার তাঁকে বরণ করে নিয়েছিল। তবু আরও প্রমাণ চাই—চৈতন্যদেব যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের অবতার এটা পুনঃস্থাপিত করতে হবে জনমানসে।

কেদারনাথ জানতে পারেন সনাতন হিন্দুদের বেদ সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য গ্রন্থ। ঋক্-যজুর্-সাম এবং অথর্ব এই চার বেদ সর্বজন স্বীকৃত।

এই অথর্ব বেদের একটি শাখা চৈতন্যোপনিষদ। বহু প্রাচীন এই গ্রন্থ। বর্তমানে তার সন্ধান মেলে না। সেই বেদেই স্বীকৃত হয়েছে যে চৈতন্যদেবই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, তিনি যুগাবতার।

সমাজে তখনও শাক্তদের কিছু প্রতিষ্ঠা রয়েছে। তাদের কাছে কালীই পরম দেবী।

কেদারনাথ সেই অথর্ববেদ সংগ্রহের চেষ্টা করতে থাকেন। বহুজনকেও বলেছেন—যদি তাদের গোচরে আসে তেমন গ্রন্থ। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পান না। শেষে মহাপ্রভু স্বয়ং যেন এর একটি জীর্ণ খণ্ড সংগ্রহের ব্যবস্থা করে দেন।

দূর উড়িষ্যার এক প্রান্তে সম্বলপুর। সেখানে বাস করেন মধুসূদন দাস নামে এক সংস্কৃত পণ্ডিত। বংশানুক্রমে তাঁরা বৈষ্ণব। বেশ কিছু প্রাচীন পুঁথি-গ্রন্থ তাঁদের সংগ্রহশালায় ছিল। তিনিও জানেন কেদারনাথ ওই অথর্ববেদের অনুসন্ধান করছেন।

মধুসূদন দাস অবশেষে সেই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থটি কেদারবাবুকে দেন। কেদারবাবু যেন ভাবতেই পারেন না—এই সম্পদ তাঁর হাতে আসবে।

বৈষ্ণবসমাজের অনেকেই এই গ্রন্থের নাম শুনেছেন—এবার তাঁরাই অনুরোধ করেন কেদারনাথকে এই গ্রন্থ পুনঃপ্রকাশের জন্য। কেদারনাথ এত কার্যের মধ্যেও সংস্কৃত ওই গ্রন্থ প্রকাশ করেন 'চৈতন্য কারণামৃত নামে' আর বাংলাতে তা অনুবাদ করেন মধুসূদন দাস নিজে।

এই গ্রন্থখানি বৈষ্ণব সমাজ সাধারণ পাঠকদের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত পরিচয়কেই উদ্‌ঘাটিত করে। প্রকৃত সমাদর লাভ করে এই গ্রন্থ। জনসাধারণ এবার শ্রীচৈতন্যদেবকে স্বয়ং ভগবান বলেই মেনে নেন। কেদারনাথের অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁর ব্রত এবার সার্থক হয়েছে। কিন্তু কেদারনাথ এতে কণামাত্র গর্বিত নন—এসবই মহাপ্রভুই করিয়েছেন, তিনি উপলক্ষ্য মাত্র।

তখন অম্বিকা কালনা, বাঘনাপাড়া অঞ্চলে বৈষ্ণব গোস্বামীর প্রতিষ্ঠা ছিল বৈষ্ণব সমাজে। তাঁরাই বৈষ্ণব ধর্মের ক্ষীণ প্রবাহকে স্বল্প পরিসরে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। বিপিনবিহারী, কেদারনাথের দীক্ষাগুরু, ছিলেন এখানেরই লোক।

অম্বিকা কালনা—বাঘনাপাড়ার বৈষ্ণব সমাজ কেদারনাথের এই কর্মযজ্ঞের এতদিন নীরব সাক্ষী ছিলেন। তাঁরা দেখেন তাঁরা যা পারেন নি কেদারনাথ একক ভাবে তাঁর জীবনের সাধনায়—অক্লান্ত পরিশ্রম তাঁকে সফল করেছেন। আর বৈষ্ণব ধর্ম সমাজের উচ্চকোটি থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। পরম ভক্তিমান সেই অক্লান্ত সাধককে এবার তারা অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জানান। এক মহতী বৈষ্ণবজন সভায় সেই পণ্ডিত সমাজ তাঁকে অভিনন্দিত করেন 'ভক্তিবিনোদ' উপাধি দ্বারা ভূষিত করে।

উত্তরকালে বৈষ্ণব সমাজ, সাধারণ মানুষের কাছে কেদারনাথ এই নামটিই হারিয়ে যায়। তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন 'ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' এই নামেই। পরবর্তীকালে কেদারনাথও এই নামটিকে নিজেও মেনে নেন।

কারণ তাঁর বহু রচনার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এই ভক্তিবিনোদ ভনিতাই ব্যবহার করেছেন। এই স্বীকৃতি তার ভক্তিভাবকে আরও উদ্বুদ্ধ করেছিল। কোন অহঙ্কারের লেশমাত্র উদয় হয়নি তাঁর চিত্তে, ভক্তি মার্গের সাধন তাঁর চিত্তে 'অহং' ভাব—মায়াবাদকে নির্মূল করেছিল।

সেই উপাধিপত্রে পণ্ডিত সমাজ তাঁর প্রসঙ্গে লিখেছিলেন,

--যাং ভক্তিং লভিতুং শশ্বং বাঙছমিত ভগবৎপ্রিয়াঃ।
তাং ভক্তিং হৃদয়ে ধৃত্বা ধন্যোহসি প্রিয়সেবকঃ।

ঈশ্বরের পরম করুণায় তাঁর হৃদয় শুদ্ধা ভক্তিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। সেখানে ছিল নিঃশেষ আবেদনের সুর। ছিল কৃষ্ণ পাদপদ্মে নিঃশেষ আত্মসমর্পণ। তাই লিখেছেন—

—যে পদ লাগিয়া জমা তপস্যা করিলা।
যে পদ পাইয়া শিব শিবত্ব লভিলা॥
যে পদ লভিয়া ব্রহ্মা কৃতার্থ হইলা।
যে পদ নারদ মুনি হৃদয়ে ধরিলা॥
সেই সে অভয়পদ শিরেতে ধরিয়া।
পরম আনন্দে নাচি পদগুণ গাইয়া॥
সংসার-বিপদ হতে অবশ্য উদ্ধার।
ভক্তিবিনোদে ওপদ করিবে তোমার॥

এই সময় চৈতন্যদেবের জন্মবর্ষ থেকে চৈতন্য পঞ্জিকার প্রবর্তন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ আজ সেই পঞ্জিকাকে মেনে চলেন। ক্রমশ তাঁর প্রতিষ্ঠিত এই চৈতন্য পঞ্জিকারই প্রচলন ঘটে বৈষ্ণব সমাজে—তার ধারা আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

বাংলা-সংস্কৃতেই নয়, বহির্বিশ্বের মানুষের কাছে ভারতের বৃহত্তর সমাজের কাছে ইংরাজিই প্রধান ভাষা। আর বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রচারের জন্য সেই ভাষার সাহায্য অবশ্য নিতে হবে এটা তিনিই প্রথম অনুভব করে বৈষ্ণব তত্ত্ব নিয়ে মহাপ্রভুর মহাজীবন, বাণী নিয়ে ইংরাজিতে রচনা শুরু করেন।

তখনকার দিনে 'Hindu Herald' ছিল বহুলপ্রচারিত ইংরাজি পত্রিকা। ভারতের উচ্চকোটির ইংরাজি-শিক্ষিত মানুষ তখনকার দিনে ইংরাজি ভাষাতে কোন তত্ত্ব-তথ্যকে প্রকাশিত হতে না দেখলে তাকে ঠিক মেনে নিতে পারতেন না।

কেদারনাথ এবার ইংরাজিতেই লেখার মনস্থ করলেন। নিজেও ইংরাজিতে পণ্ডিত, আর ভাষাটাও ভালোই জানেন। তিনি ওই হিন্দু হেরাল্ড পত্রিকায় এবার ইংরাজিতে মহাপ্রভুর জীবন ও বাণী নিয়ে একটি মর্মগ্রাহী তথ্যসমৃদ্ধ ভাবগম্ভীর নিবন্ধ লেখেন। উচ্চকোটির পাঠক সমাজেও এবার নবদিগন্ত উন্মোচিত হল। মহাপ্রভুর মহিমা প্রচারিত হতে থাকল সেই সমাজে।

আর তারাই এবার উচ্ছ্বসিত হয়ে এক মহতী সভায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে 'সদ্‌চিদানন্দ' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আর ক্রমশ সমাজে তিনি পরিচিত হতে থাকেন সদ্‌চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামেই। কেদারনাথ নামটা সাধারণ মানুষ ও বৈষ্ণবসমাজ প্রায় ভুলেই গেল।

কেদারনাথেরও এবার নবজন্ম ঘটল যেন—নতুন নামকরণের অভিষেকও হয়ে গেল।

খ্যাতি, প্রশংসা, স্বীকৃতি এসব কিছুই ভক্তিবিনোদের মনে কোন ভাবান্তরই আনে না। এ সবকিছু করেছেন তিনি তাঁর জীবনদেবতারই নির্দেশে।

এ যেন সাধুসন্ন্যাসীর দেশ তীর্থ পরিক্রমা। জীবনের একটা অঙ্গ মাত্র। এখানে তবু মনে হয় কিছুই তাঁর করা হয় নি। অন্তর তাঁর শূন্যই থেকে গেছে।

সংসার মায়ার জালে আর সরকারি কাজের মধ্যেই আজও বন্দী হয়ে আছেন। মুক্তির পথই খোঁজেন এবার। এই মায়াবন্ধন থেকে মুক্তি পেতে হবে তাঁকে।

তিনি সব বন্ধনমুক্ত হয়ে অন্তর দিয়ে নিশ্চিন্তে শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা করতে চান, তাঁর সেবায় আত্মোৎসর্গ করতে চান।

তাঁর দীর্ঘদিনের পরিচিত বন্ধু রামসেবক ভক্তিভৃঙ্গ মহাশয়। তিনি বৃন্দাবন ধামে থেকে এখন সাধনভজন করেন।

হঠাৎ তিনি এসেছেন।

ভক্তিবিনোদেরও মনে পড়ে বৃন্দাবনের কথা। সেই শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশ, যমুনার তীরভূমি গিরিগোবর্ধন—বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণ নামের পবিত্র পরিবেশ তাঁর মনকে নাড়া দেয়। মনে হয়—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোনখানে। সেই স্থান ওই ব্রজধামেই।

বলেন তিনি—বয়স তো পঞ্চাশের কাছে হল। সরকারী চাকরিও করলাম অনেক, এবার অবসর নিয়ে ব্রজধামে গিয়ে কুটির বেঁধে সেখানেই জীবনের বাকি দিনগুলো কৃষ্ণসেবায় কাটিয়ে দেব।

এইসময় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রায় দেড়শটি শ্লোকের মাধ্যমে পরম সত্যকে উদ্‌ঘাটিত করার

প্রয়াসে লঘুভাষ্যম্ রচনা করছেন, ওই সংস্কৃত শ্লোকগুলির বাংলায় অনুবাদ ও ভাষ্যও দিয়ে চলেছেন।

সরকারী কাজও চলছে সেই সঙ্গে।

আর মন টানে বৃন্দাবনে। এমনি এক টানাপোড়েনের মধ্যে রয়েছেন ঠাকুর।

সরকারী কাজে তাঁকে তারকেশ্বরে যেতে হয়েছে। খুবই সুপরিচিত এই শৈবতীর্থ। বহু অতীতের সাক্ষী। এখানে তারকনাথ শিবের প্রতিষ্ঠিত মন্দির, জাগ্রত দেবতা। ভক্তিবিনোদ এখানের মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে সরকারী কাজকর্ম সারেন।

রাত্রি নামে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঘুমুচ্ছেন—হঠাৎ স্বপ্ন দেখেন—অত্যুজ্জ্বল এক আলোকশিখার মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে শ্রীচৈতন্যদেবের মূর্তি। তিনি যেন বলেন কেদারনাথকে—বৃন্দাবন ধামে অবশ্যই যাবে, কিন্তু তার আগে নবদ্বীপ ধামে যে তোমার বিশেষ কাজ আছে, তার সম্বন্ধে কি করবে?

ভক্তিবিনোদ জেগে ওঠেন। হতচকিত হয়ে দেখেন কোথায় কি! সব আবার অন্ধকারেই মিলিয়ে গেছে।

তবু ভুলতে পারছেন না তিনি সেই উজ্জ্বল মূর্তি—তাঁর নির্দেশ। নবদ্বীপ ধামে তাঁর কি কাজ রয়েছে তাঁর কোন সঠিক নির্দেশও নেই, তবু ভুলতে পারেন না সেই কথা। হয়তো নির্দেশ যথাসময়েই আসবে।

বন্ধুদেরও বলেন সেই স্বপ্নাদেশের কথা। বন্ধুরা পরামর্শ দেন—তুমি নবদ্বীপ ধামের কাছাকাছি বদলি হবার চেষ্টা কর। সেখানে গেলেই সবকিছু কাজ করার সুবিধা হবে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও তাই ভাবেন। তখন তিনি শ্রীরামপুরে এসেছেন। কমিশনার মিঃ পিককের কাছে বদলির আবেদন করেন। ....কৃষ্ণনগরে বদলি করা হলে ভালো হয়।

এর আগে বারাসতে ছিলেন। সেখান থেকে কিছুদিন হল এখানে আসেন, বদলির সময়ও হয় নি। তাই মিঃ পিকক জানান—এটা এখুনিই সম্ভব নয়, বদলির সময়ও হয় নি।

কেদারনাথ হতাশ হয়ে ফিরে আসেন।

তবে কি তাঁর নবদ্বীপ ধামের কাছে থাকা যাবে না, মহাপ্রভুর নির্দেশিত সেই কাজও কি অসম্পূর্ণ থাকবে? তিনি এই চাকরির মায়াবাঁধনে কলুর বলদের মত চোখবাঁধা অবস্থায় আটকে থেকে ঘুরপাকই খাবেন?

এমনি দিনে তাঁর প্রমোশন-এর খবর এল। চিফ কমিশনার অফ আসাম—তাঁর ব্যক্তিগত সেক্রেটারী, না হয় ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রীর পদ—যে কোন পদেই তাঁকে উন্নীত করা হবে।

এই দুটি পদই তখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর সম্মানেরও। এদেশীয়দের মধ্যে সাধারণত এইসব পদে উন্নীত করা হয় না কাউকে।

সকলেই কেদারনাথের এই সৌভাগ্যে আনন্দিত, অনেকে আবার ঈর্ষান্বিতও। সহকর্মীরাও অবাক। এমন সৌভাগ্য তাঁদের জীবনে কোনদিনই আসবে না।

বাড়িতেও খবরটা আসে।

স্ত্রী ভগবতী দেবী স্বামীর যোগ্য স্ত্রী। সংসারের সব ভার তাঁর উপর। সন্তানরাও যোগ্য শিক্ষায় শিক্ষিত। কেদারনাথ স্ত্রীকে শুধোন—কি করব ভাবছি!

ভগবতী দেবী স্বামীর মনের কথা জানেন। সংসারে থেকেও তিনি সংসারের ফাঁসে জড়ান

নি। অথচ সব কর্তব্য করেন। কারও কোনও ক্ষোভের কারণও ঘটান নি।

ভগবতী দেবী স্বামীর এই পদোন্নতির খবর শুনে বলেন—যা ভালো বোঝ তাই করবে। অর্থাৎ এই পদোন্নতি—সম্মান তিনি নিলেও খুশী হবেন ভগবতী দেবী, না নিলেও তাঁর কোন দুঃখ নেই, তাঁর কোন মোহ নেই।

স্ত্রীর এই কথায় ভক্তিবিনোদও মনে মনে খুশী হন। তাঁর সহকর্মীদের স্ত্রীদের কথাও শুনেছেন। তারা সমাজের মাথায় বাস করতে চায়। সরকারী সম্মান-অর্থ-বিলাসই তাদের কাছে একমাত্র কাম্য। শ্রীচৈতন্যদেবের কৃপা—তাঁর স্ত্রীও তাঁর এই ব্রতের সহকারিণী ও সমধর্মিণী।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। আর প্রলোভনে ভুলবেন না। এবার মুক্তিই পেতে হবে তাঁকে।

তিনি প্রমোশন প্রত্যাখ্যান তো করলেনই, সেই সঙ্গে এতদিনের এই সম্মানের চাকরি থেকেও পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হল না। সরকার তাঁকে ছাড়তে রাজী নন।

কেদারনাথের মন তখন নবদ্বীপ ধামে, যেখানে তাঁকে যেতেই হবে। শ্রীচৈতন্যদেবের কাছে প্রার্থনা করেন যেন সেই সুযোগ তিনিই করে দেন।

বদলি সরকারী ভাবে করা না গেলেও সরকারী কর্মচারীরা যদি বিশেষ কারণে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে পরস্পর বদলির সিদ্ধান্ত নেয়—সরকার সমপদে সমমর্যাদায় তাঁদের এই বদলি মঞ্জুর করেন।

তখন কৃষ্ণনগরে তাঁর সমমর্যাদার পদে আসীন ছিলেন রাধামাধব বসু। তিনিও সেখানের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তিনি এই বদলিতে সম্মত হলেন, শ্রীরামপুরে বদলি হলে তাঁরই সুবিধা। সকলেই চান কলকাতার কাছাকাছি থাকতে, দূরে আর কে থেকে যেতে চায়?

কেদারনাথের ব্যাপার আলাদা, তাঁকে নবদ্বীপ ধামের কাছাকাছি থাকতেই হবে।

তাই দুজনে এই মিউচ্যুয়াল ট্রান্সফারের আবেদন জানালেন, আর আশ্চর্যের কথা মিঃ পীকক তখন কিছুদিনের জন্য ছুটিতে গেছেন।

মিঃ পীককই কেদারনাথের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন নি, তাঁর মত যোগ্য কর্মচারীকে তিনি ছাড়তেও রাজী হতেন না। কিন্তু তিনি তখন ভাগ্যক্রমে নেই, তাঁর কাজ দেখছেন মিঃ এডগার নামে অন্য এক ইউরোপীয়ান।

তিনি ওঁদের এই বদলির আবেদনপত্র বিনাবাধায় মঞ্জুর করে দিলেন। কেদারনাথের মনোবাসনা চৈতন্যদেব পূর্ণ করেছেন, এ তাঁরই নির্দেশ।

কেদারনাথ রাধামাধববাবুকে শ্রীরামপুরের চার্জ বুঝিয়ে দিয়ে এবার কৃষ্ণনগরে তাঁর নতুন পদে যোগ দেবার আয়োজন করেন।

আর বৃন্দাবন নয়—তার মন পড়ে আছে নবদ্বীপে—শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি, শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমির মতই পবিত্র এক তীর্থ।

সাধারণ মানুষের কাছে অতি সাধারণ এক স্থান, কিন্তু ভক্তিবিনোদ যেন দিব্যদৃষ্টিতে দেখেন এও শ্রীকৃষ্ণের আর এক অবতারের লীলাভূমি। কলিতে নবদ্বীপ ধামও তেমনি পবিত্র, সর্বতীর্থময়, সর্বদেবময় এক পবিত্র ভূমি। এই পরম তত্ত্বকেই প্রচার করতে হবে—প্রচার করতে হবে কলির তাপসন্তপ্ত মানুষের কাছে এই তীর্থমাহাত্ম্যের কথা—সেই পবিত্র জন্মস্থলী হয়ে উঠবে উত্তরকালের মানুষের কাছে এক মহাতীর্থক্ষেত্র।

এবার সেই তীর্থভূমিতেই যাবার সুযোগ এসেছে।

খুশীমনে বাড়ি ফিরেছেন কেদারনাথ।

স্ত্রী ভগবতী দেবীও খুশী। স্বামীর আনন্দেই তাঁর আনন্দ। আর এবাড়ির অলিখিত ম্যানেজার মহেন্দ্রমামাও খুশী।

মহেন্দ্রমামা কেদারনাথের দূরসম্পর্কের মামা। এককালে শরিকান জমিদারী কিছু ছিল তাঁর। কিন্তু সেসব রক্ষা করার মত বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁর ছিল না। কেদারনাথকে স্নেহ করতেন উলায় থাকাকালীন। এই পরিবারেরই আত্মীয়। জগৎমোহিনীর সম্পর্কীয় দাদা।

আজ জগৎমোহিনীও নেই। তবু ভগবতী দেবী তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। বয়স্ক মানুষটি এখনও শিশুর মতই সহজ সরল। কোন চাহিদাই নেই। কেদারের কৃতিত্বে গৌরব বোধ হয় তাঁর।

আর ভাগ্নেদের শাসনও করেন—ভালোও বাসেন। এই পরিবারেরই একজন হয়ে গেছেন। হিসাব করে খরচ করার চেষ্টা করেন, কিন্তু বাজারে গেলে সব হিসাব তাঁর তালগোল পাকিয়ে যায়।

সব গেছে, জমিদারী-চালটুকু তবু মাঝে মাঝে মনে ঠেলে ওঠে। হঠাৎ এক হাঁড়ি রসগোল্লাই এনে বসেন। অন্য বাজার চুলোয় যাক। পরে খেয়াল হয়।

এই নিয়ে অনেক হাসাহাসিও হয়।

মহেন্দ্রমামাও শুনেছিলেন কেদার ত্রিপুরার মন্ত্রীত্ব আর কমিশনার সাহেবের খাস সহকারীর কাজও ছেড়েছে। খুশী হন মামাও। বলেন,

—বেশ করেছে। আরে ঈশ্বর কাকাও রাজা মহারাজাই ছিলেন, তাঁর নাতি যাবে রাজার মন্ত্রী হতে, আর কালামুখোদের সহকারী? না-না, এই ভালো। ডেপুটিগিরির তুল্যি চাকরি আছে? কত সম্মানের, হর্তাকর্তা!

মহেন্দ্রমামাও এবার কৃষ্ণনগরে যাবার কথায় খুশী হন। কলকাতায় আবার মানুষ থাকে! কৃষ্ণনগর অনেক ভালো—কাছাকাছি উলাতেও যাওয়া যাবে।

তিনিও যাবার উদ্যোগ আয়োজন করেন।

কিন্তু বিধি বাম। হঠাৎ জ্বরে পড়লেন কেদারনাথ। জ্বর বেড়েই চলে, চিকিৎসাও চলে। কিছুই খেতে পারেন না, কোনমতে অল্প দুধই খান।

কৃষ্ণনগরে নতুন পোস্টে যোগ দিতে পারেন নি। ওদিকে কাজের অসুবিধা হচ্ছে। ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ টোয়েনবি কেদারনাথকে জানান—এবার ওই পোস্টে জয়েন না করলে তিনি ওই বদলির আদেশ বাতিল করিয়ে তার পূর্বতন ডেপুটিকেই আবার সেখানে ফিরিয়ে নেবেন।

কেদারনাথ বিপদে পড়েন। কিন্তু তিনি বার বার দেখেছেন তাঁর জীবনদেবতা তাঁকে বিপদে ফেলেছেন, আবার তিনিই সব বিপদমুক্ত করে দিয়েছেন। তাই তাঁকেই প্রার্থনা জানান।

তাঁর মনেও দৃঢ়তা আসে—বাঁচি মরি ক্ষতি নাই—তাঁর কাজের জন্য যাচ্ছি, তাই কৃষ্ণনগর যাবোই, তারপর চৈতন্যদেব যা করেন তাই হবে।

এই অসুস্থ শরীর নিয়েই অদম্য মনোবল নিয়ে কেদারনাথ কৃষ্ণনগরে গিয়ে নতুন পদে যোগ দিলেন। কোনমতে আদালতে যান, কিছু কাজকর্ম করেন।

এখানে এসে অসুখ কমল না, এবার সিভিলসার্জন ডাঃ রাসেল তাঁর চিকিৎসার ভার নিলেন। তিনি কুইনাইনসহ আরও কিছু ওষুধপত্র দেন। আর কেদারনাথের পথ্যের কথা শুনে অবাক হন।

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ দিন তিনি অন্নপথ্য গ্রহণ করেন নি, শুধুমাত্র দুধ খেয়েই বেঁচে আছেন। সব শুনে ডাক্তার রাসেল বলেন—বাবু, ভাত না খাও, চাপাটি তোমাকে খেতেই হবে। ইউ মাস্ট টেক সাম সলিড ফুড। শুধু দুধে হবে না।

ডাক্তারের কথামত ওষুধপত্র খান—দু'একখানা রুটিও খেতে হয়। তাঁর সুপারিশেই কেদারনাথের বেশ কিছুদিন 'সিকলিভ'ও মঞ্জুর হয়ে যায়।

এবার নবদ্বীপ ধামে যেতেই হবে। কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ ধামে যাবার উপায় বলতে ছিল কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ ধাম এর পথ। ওই পথ গিয়ে থামতো নবদ্বীপ ধামের এপারে প্রাচীন জনপদ স্বরূপগঞ্জে। খেয়ানৌকায় গঙ্গা পার হয়ে পৌঁছতে হত শ্রীধাম নবদ্বীপে।

তখন শীতের দিন। শস্যরিক্ত প্রান্তর—ঝরাপাতার গালা। এমনি দিনে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাত্রা করলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই শ্রীধাম নবদ্বীপের উদ্দেশে। মনে কি অপূর্ব আনন্দের আবেশ। তাঁর রোগব্যাধিও যেন আজ নেই।

নবদ্বীপ ক্ষেত্রে পা দিতে সারা শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। এক তীব্র অনুভূতির আবেশ তাঁর অন্তরমনকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

এই সেই পবিত্র ভূমি নবদ্বীপ—যেখানে নিমাই পণ্ডিত একদিন জন্মেছিলেন, চব্বিশ বৎসর ধরে তাঁর লীলা প্রকাশ করেছিলেন।

নবদ্বীপে এসে শ্রীচৈতন্যমন্দিরে ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ পেলেন। চল্লিশ দিন ধরে শুধু দুধ, দু'একখানা মাত্র রুটি খেয়ে রয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন—এ যেন অমৃত বলেই বোধ হয়।

আর দেখা যায় তাতে শরীরের কোন গোলমালই হয় না। বরং শরীর মন সুস্থ পবিত্র হয়ে ওঠে।

নবদ্বীপ ধামের বহু মন্দির—নিমাই জন্মস্থান ইত্যাদি দেখেন। পুরাতন শহর হলেও খুব বেশী প্রাচীন বলে তাঁর মনে হল না। আরও দেখেন তীর্থস্থানকে কেন্দ্র করে যেসব ধান্দাবাজ পাণ্ডা পুরোহিতের দল ব্যবসা ফাঁদেন—তারাও এখানে রয়েছে।

বৃন্দাবন-কাশীতেও দেখেছেন। নবদ্বীপেও দেখেন কোন পুরোনো গাছতলা দেখিয়ে কেউ বলে—নিমাইপণ্ডিতের টোল ছিল এইখানে। কেউ বলে—এখানে নিমাই নিজে পড়তেন, প্রণামী দাও।

অর্থাৎ এর কোন্‌টা সত্য—কোন্‌টা প্রকৃত তা জানারও কোন উপায় নেই। সব কেমন বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে।

শ্রীবাসঅঙ্গনও দেখেন। সব যেন দীর্ঘ চারশো বছর পরও ঠিক ঠিক থাকবে এটাও কেমন সন্দেহ জাগে।

তাহলে নিমাই-এর প্রকৃত জন্মস্থান কোথায়? কোথায় সেই সব পুণ্য লীলাভূমি, কোথায় ছিল জগন্নাথ মিশ্রের বাসভূমি?

এই প্রশ্নই ভক্তিবিনোদের অন্তরে জাগে। তবে কি চৈতন্যদেব স্বপ্নাদেশে তাকে জানাতে চেয়েছিলেন সেই পবিত্রতম তীর্থস্থানকে আবিষ্কার করে জনসমাজে প্রচার করতে হবে তাঁকেই?

এতদিন জীবনপাত করে তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মকে জনসাধারণের সামনে তুলে ধরার অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে এসেছেন। যা করেছেন যেটুকু সমর্থ হয়েছেন তা চৈতন্যদেবের কৃপাতেই। তাঁর কৃপাতে সবই সম্ভব হয়।

তবে এই তীর্থমাহাত্ম্যকে পরিচিত করার কাজে তিনিই সাহায্য করবেন, তিনিই সন্ধান দেবেন সেই প্রকৃত পুণ্যভূমির। কেদারনাথ তাই অন্তরমন দিয়ে ব্যাকুলভাবেই ডাকতে থাকেন তাঁর জীবনদেবতাকে।

নবদ্বীপের চারিদিকে ঘোরেন, অন্বেষণ করেন ভূপ্রকৃতিকে, এখানের গঙ্গার ধারাপ্রবাহকেও।

কৃষ্ণনগরে ফিরে আসেন। এখন চৈতন্যদেবের কৃপায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠে কাজে যোগ দেন। পড়াশুনোর কাজ—গ্রন্থ প্রকাশনার কাজও চলেছে। বিমলপ্রসাদ কলকাতায় সেসব দেখেন, তিনি নিজেও সুপণ্ডিত আর যোগ্য পিতার যোগ্য সন্তান। দেবতার আশীর্বাদধন্য, তাই তাঁর অন্তরেও নিরন্তর ভক্তিপ্রবাহ বিদ্যমান।

পিতার পাশে এসে দাঁড়ান বিমলপ্রসাদ, বৈষ্ণব শাস্ত্র দর্শনের একনিষ্ঠ ছাত্র।

ভক্তিবিনোদ কৃষ্ণনগরে রয়েছেন, অন্যসব কাজ ছাড়াও তাঁর মাথায় চেপেছে আর একটা গুরুদায়িত্ব। নবদ্বীপ ধামে চৈতন্যদেবের জন্মস্থানকে খুঁজে বের করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে নবদ্বীপধামকে স্বমহিমায়, যে ঐতিহ্য—ইতিহাস—ধর্মভাবনার কথা আজও সাধারণ মানুষের গোচরের বাইরে রয়েছে।

প্রতি শনিবার কাজ-শেষে তিনি কৃষ্ণনগর থেকে নবদ্বীপ ধামে আসেন আর ঘোরেন, এখানের প্রাচীন বয়স্ক সাধারণ মানুষের কাছেও খোঁজখবর নেন।

তাঁর এই ঘোরাঘুরির ফলে মনে হয়েছে চৈতন্যদেব অপ্রকট হবার পর কয়েকশো বৎসর কেটে গেছে, গঙ্গাও এর মধ্যে বেশ কয়েকবার তার ধারাপ্রবাহ বদলেছে, আজকের নবদ্বীপ ধামের চারদিক দেখলে সেই সব পরিত্যক্ত গতিপথকে দেখা যায়।

আসল তীর্থভূমি হয়তো গঙ্গার প্রবাহে ঢাকা পড়ে গেছে! তাহলে কোথায় রয়েছে সেই পুণ্যভূমি?

গঙ্গার ঘাটে কিছু প্রাচীন লোককেও দেখা যায়। বয়স হয়েছে অনেক। তাঁদেরকেই প্রশ্ন করেন। কেউ কেউ বলেন—বাবা, আমাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন গঙ্গার ওপারে। ওখানেই তখন ছিল আসল বসতি। ক্রমে ওদিক পরিত্যক্ত হয়ে যায়। তখন আমি খুব ছোট, আসার বাবা ওপার থেকে এপারের নতুন বসতিতে বাড়ি করেন। অনেকেই চলে আসেন ওপার থেকে এপারে। ওপার শূন্য হয়ে যায়, জমে ওঠে এপারের শহর।

ভক্তিবিনোদ দেখেন গঙ্গার ওপারে এখন জনবসত নেই। পরিত্যক্ত মাঠ কাশবন দু'চারটে তাল খেজুর গাছ এই পরিত্যক্ত বনপ্রান্তরে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত।

কোথাও কোন সন্ধান প্রমাণও পান না। তাঁর আসা-যাওয়া তবু চলতে থাকে। ব্যাকুল হয়ে খোঁজেন যত্রতত্র।

সেদিন শনিবারের রাত্রে নবদ্বীপে গেছেন। এতদিন যাতায়াত করছেন—সরকারের পদস্থ কর্মচারী, তাই রাণীর ধর্মশালার কর্তৃপক্ষ তাঁর থাকার জন্য ঘরের ব্যবস্থাও রাখেন।

এছাড়া এই নবদ্বীপে বেশ কিছু যাত্রীও আসে, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও যান। সেদিন রাত্রে ধর্মশালার ছাদে বসে আছেন। গঙ্গার তীরেই বাড়িটা। সঙ্গে রয়েছে তাঁর ছেলে কমলপ্রসাদ আর তাঁরই অফিসের এক করণিক ভদ্রলোক।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হঠাৎ দেখেন গঙ্গার ওপারে আলোকমালায় সুসজ্জিত এক বিশাল প্রাসাদ, তিনি অবাক হন। আবার দেখতে থাকেন, চোখের ভুল নয় তো? ওখানে প্রাসাদ এল কি করে? এত আলোতেই বা কে সাজালো সেই প্রাসাদ?

ছেলে কমলকে শুধোন—কিছু দেখছ ওপারে?

কমলও বলে—হ্যাঁ বাবা। আলোয় সাজানো এক প্রাসাদ!—তুমি দেখছো?

ভক্তিবিনোদ তাঁর অফিসার কেরানীকেও প্রশ্ন করেন। ছেলেটি এদিক-ওদিক ক্ষণিক চেয়ে ওপারেও নিরীক্ষণ করে বলে—কই কিছুই দেখছি না তো! চারিদিকে তো অন্ধকার!

ভক্তিবিনোদ চমকিত হন। একি দেখলেন তিনি! বারবার সেই আলোকোজ্জ্বল প্রাসাদের

কথাই মনে পড়ে।

পরদিন আর ওদিকে যাবার সময় হয় না। সকালেই নবদ্বীপ থেকে ফিরতে হবে, অফিস আদালতের কাজ আছে। সারা সপ্তাহ ধরে সেই দৃশ্যের কথাই মনে পড়ে। অপরূপ অলৌকিক সেই দৃশ্য সকলের নয়নগোচরও হয় না, দেখেছেন তিনি।

কোনরকমে বাকী কটা দিন কাটিয়ে শনিবার আবার সন্ধ্যায় গিয়ে হাজির হলেন ধর্মশালায়। পরদিন সকালেই খেয়া পার হয়ে গঙ্গার ওপারে সেই জায়গাটার সন্ধানে গেলেন। ওদিকে গেলেন এই প্রথম।

কোথায় প্রাসাদ! সেখানে ঝোপঝাড় আর একটা তালগাছ নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে একটা ঢিবিকে দেখা যায়। বেশ খানিকটা উঁচু আর সেখানে রয়েছে প্রচুর তুলসীবন।

ওদিকে বেশ খানিকটা বিস্তীর্ণ গভীর খাদ—তার ওপাশে দু-চারটে বাড়িঘর আছে, সাধারণ চাষীবাষীদেরই বসত।

তাদের মধ্যে একজন বলে—এই জায়গাটার নাম মায়াপুর। আর ওদিকে দেখছেন খালমত—ওটাকে বলে বল্লাল দিঘী, আরও ওদিকে রয়েছে বল্লাল ঢিবি। ওখানেই রাজা বল্লাল সেনের রাজবাড়ি ছিল।

কেদারনাথ শুনছেন এই বৃদ্ধ চাষীর কথা। সে-ই বলে—এই যে ঢিবি দেখছেন তুলসীগাছে ঢাকা, ওই নিমাই-এর জন্মস্থান।

বল্লাল সেন! তাঁর প্রাচীন রাজধানী তো নবদ্বীপ শহরে! তাহলে আজকের নবদ্বীপ শহর ওপারে কেন?

রাজা বল্লাল সেন তাঁর পরিচিত নাম, বাংলার ইতিহাসের এত অতীত অধ্যায়। আরও মনে পড়ে নিমাই যখন কণ্টক নগরে অর্থাৎ কাটোয়ায় যান তখন গঙ্গা পার হয়েই গেছিলেন।

এবার মনে পড়ে ওপারে শহর নবদ্বীপের প্রাচীন কিছু মানুষের কথা। তাদেব মুখেই শুনেছেন তাদের আদিবাস ছিল এখানেই, তারা ছেলেবেলায় তাদের বাপপিতামহের সঙ্গে ওপারে গিয়ে বাস করছে।

কেদারনাথ নবদ্বীপ শহরও দেখেন। তাঁর মনে হয় ওদের কথাই সত্য। এই নবদ্বীপ শহর শ'খানেক বৎসরের পুরনো। তার আগে এই শহরের তেমন অস্তিত্ব ছিল না।

এই ঘটনা ঘটেছিল ভক্তিবিনোদের জীবনে অনুমান ১৮৮৭ সালে। সেই সময় ওই ব্যাপার তাঁর মনে হয়েছিল।

তাহলে প্রকৃত নবদ্বীপ কোথায়?

বৈষ্ণবগ্রন্থে দেখেছেন, শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থেও পড়েছেন ভক্তিবিনোদ নবদ্বীপ মাহাত্ম্যের কথা। অন্তদ্বীপ, সীমন্তদ্বীপ, গোদ্রুমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ, জহ্নুদ্বীপ, মোদ্রুম দ্বীপ, রুদ্রদ্বীপ—এই নয় দ্বীপের সমাহারকে বলা হয় নবদ্বীপ।

শ্রীচৈতন্যদেব অপ্রকট হবার পর শ্রীনিত্যানন্দ তখন নবদ্বীপে ধর্মপ্রচারে রত, তখন পরম-ভক্ত জীব গোস্বামী এসেছিলেন এই মহাতীর্থ পরিক্রমায়। শ্রীনিত্যানন্দ তাঁকে নিয়ে এই নবদ্বীপ পরিক্রমা করেছিলেন। দিব্যমাহাত্ম্যময় সেই সব দ্বীপ। বৃন্দাবনে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রত্যক্ষ করার জন্য যেমন সব দেবদেবীই সেখানে এসেছিলেন, নবদ্বীপেও শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা প্রত্যক্ষ করার জন্যও সব দেবদেবীই এখানে এসেছিলেন, এসেছিলেন বহু তীর্থদেবতাও। এই পুণ্যভূমিকে সেদিন জীব গোস্বামীও পরিক্রমা করে গেছেন।

আজ সেই ভূমি কোথায় অবলুপ্ত!

বল্লালদিঘীর সেই বৃদ্ধ চাষী এক ভদ্রলোককে এসব কথা জিজ্ঞাসা করতে বলে।

—এইসব জায়গাও বাপঠাকুর্দার মুখে শুনেছি গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গেছল, পরে আবার জেগে ওঠে। লোকজন তাই সব ওদিকেই চলে যায়। এসব চরে জেগে থাকে কাশবন—পরে চাষবাস হচ্ছে এখন।

ভক্তিবিনোদের মনে হয় সেই ইতিহাস।

—প্রভু যবে অপ্রকট হইবে তখন,
তাঁহার ইচ্ছায় গঙ্গা হইবে বর্ধন,
মায়াপুর প্রায় গঙ্গা আচ্ছাদিবে জলে,
শতবর্ষ রাখি পুনঃ ছাড়িবেক বলে॥

তাহলে এই কি সেই স্থান—যার অন্বেষণ করছেন তিনি? এই মায়াপুরই নিমাই-এর প্রকৃত জন্মভূমি?

কিন্তু কিছু শোনা কথা ছাড়া আর কোনও প্রমাণ নেই তাঁর কাছে।

এবার শুরু হল অনুসন্ধান। পুরোনো গ্রন্থাদিও দেখেন যদি কোথায় উল্লেখ থাকে। কিন্তু তেমন কোন উল্লেখও পান না।

কৃষ্ণনগরের সরকারী মহাফেজখানাতে পুরানো রেকর্ডপত্রের অনুসন্ধান করতে থাকেন। শ্রীচৈতন্যভাগবত—ভক্তিরত্নাকর, নরহরি সরকারের প্রামাণ্য গ্রন্থ নবদ্বীপ পরিক্রমণ পদ্ধতি এসব গ্রন্থে তেমন কোন উল্লেখ পান না।

একদিন খুঁজতে খুঁজতে মহাফেজখানায় লর্ড ক্লাইভের আমলে দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের একটা প্রাচীন ম্যাপ দেখতে পান এই অঞ্চলের, সেখানে এই বল্লালদিঘীর কাছে 'শ্রীমায়াপুর'-এর উল্লেখ পেতে কিছুটা আশান্বিত হন কেদারনাথ।

তবু এই প্রমাণ যথেষ্ট নয়। বৈষ্ণব মহাজনদের গ্রন্থে নিশ্চয়ই এর উল্লেখ, স্বীকৃতি থাকার প্রয়োজন, তৎকালীন কোন মহাজন-এর রচনাতে এর উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকতে পারে। তাই গ্রন্থাদি খুঁজতে থাকেন।

সেই সঙ্গে নিরন্তর প্রার্থনাও চলল। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর বহু প্রশ্নেরই মীমাংসা করে দিয়েছেন। দিনাজপুরে থাকাকালীন সেই চৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা তিনিই করেছিলেন, সব দ্বিধা তাঁর মুছে গেছল।

এবার একি পরীক্ষায় ফেলেছেন তাঁকে চৈতন্যদেব? তাই নিরন্তর প্রার্থনাই করেন ভক্তিবিনোদ—তুমিই আলোকসন্ধান দাও ঠাকুর!

এই প্রার্থনা যেন পূর্ণ করেছেন তিনিই। সেদিন কিছু গ্রন্থের সন্ধান করতে করতে তাঁর হাতে আসে ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থ। প্রামাণ্য বৈষ্ণবশাস্ত্রের গ্রন্থ। এতদিন খুঁজছেন নজর আসে নি, আজ স্পষ্ট শ্লোকটির দিকে দৃষ্টি যায়। তিনিই যেন দেখিয়ে দেন ভক্তিবিনোদকে

—নবদ্বীপমধ্যে মায়াপুর নাম স্থান।
যেথায় জন্ম নিলেন গৌরচন্দ্র ভগবান॥

বিস্মিত হন ভক্তিবিনোদ—এই গ্রন্থ বহুপঠিত, তবু কারও মনে গৌরাঙ্গজন্মস্থান নিয়ে এই প্রশ্ন ওঠে নি! তাঁরাও ওই পরে গড়ে ওঠা নবদ্বীপকেই মেনে নিয়েছিলেন—এ নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলেন নি। গৌরাঙ্গদেবই তাঁকে দিয়ে এই ভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে প্রকৃত সত্যকে উন্মোচন করাতে চান। তারকেশ্বরে সেই রাতে স্বপ্নাদেশের কথা মনে পড়ে। আজ তিনি সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন।

ইতিহাস, তথ্যের দিক থেকে কিছু প্রমাণ পেলেও এই যে পবিত্র নিমাইজন্মস্থান তার স্বীকৃতি চাই বৈষ্ণবসমাজে ভক্তগণের অন্তরেও।

আধ্যাত্মিক পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক যে এই পুণ্যমৃত্তিকা তার স্বীকৃতির প্রয়োজন।

মনে পড়ে তাঁর শিক্ষাগুরু জগন্নাথ দাস বাবাজীর কথা। তিনিই তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মধ্যমণি। পরমহংস—মহাসিদ্ধপুরুষ। তাঁর তখন বয়সও হয়েছে প্রায় ১২০ বছর। ফুলিয়াতে আশ্রমে থাকেন। সেই বৃদ্ধ সিদ্ধপুরুষকেই আনার ব্যবস্থা করেন ভক্তিবিনোদ এইখানে।

তাঁকে ডুলিতে করে আনা হয়, সেই তুলসীবন সমাবৃত ঢিবির কাছে এসে ১২০ বছরের স্থবির বৃদ্ধ কি আবেগে উৎফুল্ল হয়ে লাফ দিয়ে ডুলি থেকে নেমে গিয়ে সেই পুণ্য মৃত্তিকায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে গড়াগড়ি দিয়ে আকুলভাবে বলতে থাকেন—

এই তো—এই তো সেই নিমাইজন্মভূমি! এই তো—

পুণ্যতীর্থে সমবেত বহু ভক্ত বৈষ্ণবও কি আবেগে সেই পুণ্যভূমিতে গড়াগড়ি দিয়ে প্রণতি জানান।

ভক্তিবিনোদেরও আর তিলমাত্র সন্দেহ নেই এই সে পুণ্যভূমি। তাঁর মনে পড়ে বৈষ্ণবগ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামীর লুপ্তপ্রায় বৃন্দাবন আবিষ্কারের কথা।

বৃন্দাবন মহাতীর্থও লুপ্ত হয়ে গেছল। কলিযুগে শ্রীচৈতন্যদেব অবতারের পর তিনিই রূপ সনাতন গোস্বামীদের নির্দেশ দিয়ে পাঠান যমুনাতীরের নির্জন বনভূমিতে সেই লুপ্ততীর্থ পুনরুদ্ধার করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে।

নির্জন যমুনাতীরে কুঠিয়া করে পড়ে আছেন। আরাধ্য দেবতাকে ভোগ নিবেদন করেন, ভিক্ষান্নের অগ্রভাগ সামান্য অন্ন বনের শাক, তাতে নুনও জোটে না।

একদিন দেবতা স্বপ্নে বলেন—আর কিছু না পারো শাকে একটু নুন দিও। আলুনি শাক খাই কি করে?

সংসারবিরত গোস্বামী বলেন,—ভালো তোমার আবদার ঠাকুর! ওই কোন রকমে জোটে, তার উপর আজ নুন চাইছ, এরপর আরও কি চাইবে কে জানে! সাধ থাকে নিজেই জুটিয়ে নাও, এর বেশি সাধ্য তো নেই আমার।

শোনা যায়, ক'দিন পরই এক শ্রেষ্ঠী নদীতীরে সন্ন্যাসী রূপ গোস্বামীকে দেখে কাতর অনুনয় করেন, আমার লাখ টাকার মালসমেত নৌকা চড়ায় আটকে গেছে ঠাকুর—উদ্ধার করো!

গোস্বামী বোঝেন এ ঠাকুরের লীলা।

সেই গোস্বামীদের সাধনায় তৃপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণই তাদের উৎসাহ শক্তি যুগিয়েছিলেন লুপ্ত বৃন্দাবন তীর্থকে জাগ্রত করতে, প্রকাশ করতে। চৈতন্যদেবই ছিলেন তাঁদের সহায়।

আজ তিনি ধন্য। নবদ্বীপ ধামে মহাতীর্থকে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সেই পুণ্যভূমির আবিষ্কারে চৈতন্যদেবই তাঁকে সাহস, শক্তি যোগাবেন।

এবার তিনি জীব গোস্বামীকে নিয়ে অতীতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ ধাম-এর বিভিন্ন নয়টি দ্বীপে যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন—তিনিও সেইভাবে সীমন্ত দ্বীপ, বল্লাল ঢিপি, মধ্যদ্বীপ—এদিক জলঙ্গী নদী পার হয়ে গোদ্রুম দ্বীপে আসেন। চৈতন্যদেব অতীতে কীর্তন পরিক্রমায় বের হয়ে ভক্তদের নিয়ে বসেছেন। অসময়ে কোন ভক্ত বলেন—এখন পাকা আম হলে ভালো হত!

চৈতন্যদেব অসময়ে আমের আঁটি থেকে গাছ তৈরি করে তাতে আম ফলিয়ে সুপক্ক করে ভক্তদের বাসনা পূর্ণ করেন। সেই আমের আঁটি থেকেই আজও সেখানে বিস্তীর্ণ আমের বাগান হয়ে গেছে। সেই আম্রহট্ট আজও ছায়াস্নিগ্ধ পরিবেশ নিয়ে বিরাজমান।

দেখেছেন ভক্তিবিনোদ সীমন্ত দ্বীপ, যেখানে পার্বতী গৌরাঙ্গদেবের পদধূলি সীমন্তে নিয়ে ধন্য হয়েছিলেন, ওদিকে জয়দেব কবির গীতগোবিন্দের সুর-ঝঙ্কৃত বল্লালঢিবি—তার এপাশেই কাজির অবলুপ্ত প্রাসাদ—তাঁর সমাধিভূমি, সেখানে প্রাচীন গুলঞ্চ গাছ থেকে আজও তার সমাধিতে ফুল ঝরে পড়ে।

মায়াপুর থেকে নিমাই সেদিন শতসহস্র ভক্তদের নিয়ে এখানে এসেছিলেন কাজীদর্শনে, তাঁদের গঙ্গা পার হবার কোন উল্লেখ নাই। তাহলে মায়াপুর ছিল এদিকেই, তাও প্রমাণিত।

খড়ে নদীর তীরে ছায়াস্নিগ্ধ গোদ্রুম দ্বীপে এসে ভক্তিবিনোদ ধন্য। এখানেই ছিল রাজা সুবর্ণ সেনের প্রাসাদ—পরবর্তীকালে চৈতন্যদেবের পরম অনুরক্ত বুদ্ধিমন্ত খান-এর জন্মস্থান, এখানেই সুরভি কামধেনু এসেছিলেন চৈতন্য ভজনার্থে, এসেছিল তীর্থরাজ পুষ্কর, এদিকে চম্পকহট্ট—পরে জয়দেব ওখানেই বাস করতেন—রয়েছেন জয়দেবের অবাধ্য দেবতা, ওপাশে বিদ্যানগর। এখানে জন্মেছিলেন মহাপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম যিনি পরে নীলাচলে চৈতন্যদেবেরও ভক্ত য়েছিলেন, ওদিকে সিদ্ধ বকুল পরমভক্ত শারঙ্গ মুরারীর পীঠ।

বৃদ্ধ শারঙ্গদেবকে নিমাই প্রায়ই বলতেন—তুমি শিষ্য নাও, না হলে দেবসেবা কে চালাবে! তোমার বয়স হয়েছে।

শারঙ্গদেব বলেন—নিজে যোগ্য শিষ্যই হতে পারলাম না, গুরু হবো কি করে?

তবু নিমাই বলেন—আমার আদেশ।

শারঙ্গদেব বলেন—তোমার আদেশ শিরোধার্য করলাম। কথা দিচ্ছি, কাল সকালে প্রথম যার মুখ দেখব তাকেই দীক্ষা দেব।

ব্রাহ্মমুহূর্তে উঠে বৃদ্ধ গঙ্গাস্নানে গেছেন।

তখনও সূর্যোদয় হয়নি। গঙ্গায় ডুব দিয়ে উঠে দেখেন সামনে কলার মান্দাসে ভেসে এসেছে একটি সদ্য ব্রহ্মচারীর বেশে এক মৃত বালক।

সর্পদংশনে বোধহয় মারা গেছে—তাকে আত্মীয়স্বজন এই ভাবে কলার মান্দাসে চাপিয়ে ভাসিয়ে দিয়েছে, আর প্রথমে তিনিই তার মুখ দেখেছেন। নিমাইয়ের কাছে কথা দিয়েছেন প্রথম যার মুখ দেখবেন তাকেই মন্ত্র দেবেন, শারঙ্গদেব মৃত বালকের কানেই মহামন্ত্র দেন—আর ঘাটের লোকজন দেখছে দৃশ্যটা। তারাও অবাক হয়, মৃত ব্রহ্মচারী বালক প্রাণ ফিরে পায়।

উপনয়নের দিন সর্পাঘাতে তার মৃত্যু হয়। তার বেঁচে ওঠার সংবাদ পেয়ে আত্মীয়স্বজন ফিরে আসে তাকে নিতে। কিন্তু বালক মুরারী আর ঘরে ফেরে না। শারঙ্গদেবের শিষ্যত্ব নিয়ে চৈতন্যদেবের ভজনাতেই জীবন কাটিয়ে দেয় সে। সেই থেকে এইখানে সিদ্ধবকুল ঘেরা এই তীর্থের নাম হয় শারঙ্গ মুরারীর পীঠ। সেই স্মৃতিমন্থন করে টিকে আছে প্রাচীন বকুল গাছ।

কেদারনাথ এই পরিক্রমা পর্বের কথাও বিশেষ ভাবে ভক্তসাধারণের গোচরে আনার জন্য এবার লিখতে শুরু করেন।

ফুলিয়া গ্রামে জগন্নাথ দাস বাবাজীর আশ্রমেও প্রায় যান, সেখানে বহু বৈষ্ণব ভক্ত আসা যাওয়া করেন। তাদের থাকার—আলাপ-আলোচনা করার তেমন জায়গাও নেই। কেদারনাথ তাই নিজের উদ্যোগে সেখানে নাটমন্দির করার কাজে হাত দেন এবং তাঁরই উদ্যোগে সেখানে সুন্দর একটি নাটমন্দির গড়ে ওঠে। এবার সেখানে ধর্মসভা ইত্যাদি করার সুব্যবস্থাও হয়ে যায়।

ভক্তিবিনোদ তখন কৃষ্ণনগরে। নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য প্রচার করার জন্য তিনি এবার বিভিন্ন পুরাণ ধর্মগ্রন্থাদি পাঠ করতে শুরু করেন। ক্রমশ সেই সব গ্রন্থ পড়ে তাঁর মনে দৃঢ় বিশ্বাস হয় এই নবদ্বীপ ধাম বৃন্দাবনের মতই পবিত্র। এতদিন এই তত্ত্ব প্রচারিত হয় নি, সেই তীর্থকে জাগ্রত

করার সাধনাই করেন এবার। সব ছেড়ে বৃন্দাবনে যাবার যে ব্যাকুলতা এসেছিল মনে তা আ
নেই। এখন তিনি নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য জেনে এখানেই তাঁর শেষ আশ্রয় করতে আগ্রহী।

তাই নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য জনমানসে প্রচার করার জন্যই বহু প্রামাণ্য শাস্ত্র পুরাণ ঘেঁটে তি রচনা করেন নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা, দুটি খণ্ডে এটি রচিত হয়। নবদ্বীপের অতীত ইতিহাস— এখানের ধর্মচেতনা আধ্যাত্ম্য জগতে এর স্থিতি ইত্যাদি প্রসঙ্গে এর আগে কোনও আলোচনা হ নি।

তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হতে নবদ্বীপ ধাম, শ্রীমায়াপুর—বিভি দ্বীপগুলির অতীত ইতিহাস এসব জানতে পারে দেশবিদেশের মানুষ। ফলে নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপু সম্বন্ধে তাদের আগ্রহও বাড়তে থাকে।

—নবদ্বীপঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপুরমহো গৌড়পরিধে।
শচীপুত্রঃ সাক্ষাদ্‌ব্রজপতিসুতো নাগজবরঃ॥
স বৈ রাধাভাবদ্যুতিসুবন্দিতঃ কাঞ্চনছটো।
নবদ্বীপে সীমাং ব্রজপুর-দুরাপাং বিতনুতে॥

ভক্তিবিনোদ লেখেন—আহা, এই গৌড়মণ্ডলে নবদ্বীপধাম সাক্ষাৎ ব্রজপুর অর্থাৎ বৃন্দাবন; আর শচীনন্দন শ্রীগৌরাঙ্গ সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন নাগরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ। সেই (শচী সুত) শ্রীরাধার ভাবকান্তিতে সুবর্ণচ্ছটা যুক্ত হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে ব্রজপুর অপেক্ষাও দুষ্প্রাপ্যসীমা (ঔদার্যশীলা) বিস্তার করিতেছেন।

নবদ্বীপ ধাম মায়াপুরে আসেন ভক্তিবিনোদ। এরই ওপাশে খড়েনদীর তীরে শ্যামছায়াঘন অঞ্চল স্বরূপগঞ্জ, অতীতের গৌদ্রুম দ্বীপ। কুঞ্জবনের প্রশান্তি এখানে। ভক্তিবিনোদ এইখানে এসে অপূর্ব প্রশান্তি অনুভব করেন। সিদ্ধান্ত নেন আর বৃন্দাবন নয়, এই তীর্থেই জীবনের শেষ ক'দিন সাধন-ভজন আর লেখাপড়া প্রচারাদির মধ্যেই গৌরাঙ্গদেবের সেবা করে কাটিয়ে দেবেন।

তাই এখানেই একটু জমি সংগ্রহ করলেন। এখানে গড়ে তুলবেন তাঁর 'সাধনকুঞ্জ'।

গোদ্রুম ধাম প্রসঙ্গে বলা হয়

—মিলন্তু চিন্তামণিকোটি-কোটয়ঃ
স্বয়ং বহির্দৃষ্টিমুপৈতু বা হরিঃ।
তত্রাপি তদ্‌গোদ্রুমধূলি ধূসরং
ন দেহমন্যত্র কদাপি যাতু মে॥

তিনি বলেন—অপরে কোটি কোটি চিন্তামণি লাভ করুক আর যাহাই করুক, অথবা বহির্দৃষ্টিযুক্ত ব্যক্তির নিকট স্বয়ং শ্রীহরির আগমন হউক আর যাহাই হউক (অর্থাৎ বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত অক্ষর-জ্ঞানী স্বয়ং শ্রীহরিকে পাইয়াছে বলিয়া মনে করুক আর যাহাই করুক), কিন্তু তথাপি শ্রীগোদ্রুম ধাম ধূলিধূসরিত আমার দেহ যেন কখনও সেই শ্রীধাম ছাড়িয়া আর কোথাও না যায়।

এইসব লেখা তাঁর শুধু আক্ষরিক লেখাই ছিল না, এতে ছিল বিশ্বাস শ্রদ্ধা আর পরমজীবনসত্যতারই প্রকাশ। তাই বৃন্দাবনকে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন নবদ্বীপ ধামেই। সেই মাহাত্ম্যকেই বৃহত্তর জনসাধারণের সামনে প্রকাশিত করেছেন।

এ তাঁর জীবনদেবতা গৌরাঙ্গদেবেরই নির্দেশ। তাঁরই নির্বাচিত পুরুষ তিনি। তাই তাঁর লেখায় প্রচারে একটি সত্যের প্রদীপ্ত শিখার সদা প্রকাশ হত—যা সাধারণ মানুষের সামনে

গ্রহণীয় হত।

আমরা সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃত কথাতে দেখি তিনিও বলেন 'চাপরাসের কথা' অর্থাৎ লোকে যার-তার কথা, নিষেধ মানে না, যেই সরকারী 'চাপরাস' ধারী কেউ এসে বলল—তখুনি তার নিষেধ সবাই মানে ও বিশ্বাস করে তার কথা।

তেমনি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রেও ভক্তিবিনোদ যেন স্বয়ং চৈতন্যদেবের চাপরাসই পেয়েছেন। তাই তাঁর প্রচারের মাঝে সত্যের প্রকাশ থাকে, থাকে দৈবীশক্তির আবেশ—তাই তা সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে ওঠে।

লেখার কাজও চলেছে, অমৃতসূত্রম্ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর রচিত গ্রন্থগুলি এখন সমাদৃত, নবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য পরিক্রমা খণ্ডও খুবই সমাদৃত।

চুরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমার মতই অতীতে শ্রীজীব গোস্বামী নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা করেন।

তাঁর সেই পরিক্রমা বিভিন্ন তীর্থমাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে এই রচনা ভক্তজনকেও বৃন্দাবন ধাম পরিক্রমা করার অনুপ্রেরণা জোগায়। সেই পরিক্রমা আজও চলেছে। এখন শুধু এদেশের হাজারো ভক্তই নন—দেশবিদেশের বহু ভক্ত এসে যোগ দিয়ে ধন্য হন।

এর সূচনা হয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচনার অনুপ্রেরণাতেই।

ভক্তিবিনোদের চাকরির বন্ধন তখনও খসে নি। তবু তাঁর চিত্ত সব বন্ধনের ঊর্ধ্বে, তাঁর মুক্তি বৈরাগ্যসাধনে নয়।

—বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।

* * *

প্রদীপের মত
সমস্ত সংসার মোর লক্ষ বর্তিকায়
জ্বালায়ে তুলিবে আমা তোমারি শিখায়
তোমার মন্দির মাঝে॥

* * *

মোহ মোর মুক্তিরূপে উঠিবে জ্বলিয়া।
প্রেম মোর ভক্তিরূপে রহিবে ফলিয়া॥

সেই মহাজীবন পথের সার্থক পথিক তিনি। তাই সব চাকরি—সংসার—সব বন্ধনের ঊর্ধ্বে থেকে তিনি জীবনদেবতার সার্থক সাধনা করেছিলেন।

কৃষ্ণনগর থেকে তিনি বর্ধমান নেত্রকোণা টাঙ্গাইল দিনাজপুর রাণীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বদলি হয়েছিলেন। তার বর্ধমানে।

তখন বর্ধমানে রয়েছেন ভক্তিবিনোদ। তাঁর বৈষ্ণবখ্যাতি তখন বহুদূরবিস্তৃত।

বর্ধমানের সন্নিকট আমলাজোড়া গ্রাম। এখানের বৈষ্ণব সমাজের পরিচিতি আছে। এই গ্রামে রয়েছেন বহু গৃহী বৈষ্ণব। ক্ষেত্রবাবু, বিপিনবাবুরা এখানের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি আর পরম বৈষ্ণব। তাঁরাও আসেন ভক্তিবিনোদের সান্নিধ্যে। তাঁরাও যেন উৎসাহ অনুপ্রেরণা পান।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও কথাটা বারবার ভেবেছেন। শুধু বৈষ্ণব সাহিত্যের পুনরুদ্ধার, বৈষ্ণবধর্মের প্রচার লেখার মাধ্যমে ঘটানো যাবে না, নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য প্রচার করে তা আংশিক করা যাবে মাত্র। ওসব গ্রন্থ পড়ে উচ্চকোটির কিছু মানুষ ও-নিয়ে ভাবনাচিন্তা করবেন। তর্ক করে নিজেদের জ্ঞান, মায়াবাদী পাণ্ডিত্যের পশরা সাজাবেন আর কিছু ব্যক্তি গ্রহণ করবেন প্রকৃত তত্ত্ব। তাদের সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

কিন্তু জনমানসে বৈষ্ণববাদ-ভক্তি এসবের প্রবাহ সহজেই ঘটানো যায় নামকীর্তনের মধ্যে। কলিতে এক এক যুগে শ্রীকৃষ্ণ এক এক রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, সেই সেই যুগে কৃষ্ণভজনা, জীব উদ্ধারের পথও ছিল স্বতন্ত্র, কলিযুগে নামকীর্তনই উদ্ধারের সহজ পথ। হরিনাম ছাড়া জীবউদ্ধারের আর কোন পথই নাই এই যুগে।

তাই শ্রীচৈতন্যদেব এত বড় পণ্ডিত, এত গ্রন্থ রচনা করেছেন—ভগবানের মূর্তপ্রকাশ তিনি, তবু জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য নামকীর্তনকেই বেছে নিয়েছিলেন ঈশ্বর চেতনাকে জাগরিত করার প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবেই। প্রথমে মুষ্টিমেয় অন্তরঙ্গ পারিষদ নিয়ে নামকীর্তনে বের হতেন মহাপ্রভু, লোকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতো দূর থেকে, ক্রমশ নামের মাহাত্ম্যে দুর্বার আকর্ষণে তাঁরা এসে জুটতেন দলে দলে। শত থেকে সহস্র—তার থেকে শত সহস্রে পরিণত হয়েছে সেই নাম কীর্তনীয়াদের সংখ্যা।

শুধু এদেশেই নয়, পরবর্তীকালেও দেখা যায় দূর প্রবাসে নিউইয়র্ক শহরের নিগ্রো—অতি সাধারণ আমেরিকার মানুষের অধ্যুষিত হার্লেম অঞ্চলের পথে এক ভারতীয় বৈষ্ণব একক কণ্ঠে নামকীর্তন করে চলেছেন। পরবর্তীকালে শ্রীচৈতন্যদেবের করুণায় আর নামগানের আকর্ষণে সেই দূর প্রবাসে ভাষা না জানা বিদেশীরাও এসে দলে দলে যোগ দিয়েছে নামকীর্তনে, শ্রীচৈতন্যদেবকে হৃদয়ে বরণ করে নেয়। এ ঘটনা ঘটেছে পরবর্তীকালে প্রভুপাদ এ সি ভক্তিবেদান্তস্বামীর জীবনেও। নামেরই এমনি মাহাত্ম্য।

সেই মাহাত্ম্য অবগত ছিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। কিন্তু সর্বজনসমাজে প্রকাশ্য নামকীর্তন করে গ্রাম পরিক্রমা চৈতন্যদেব অপ্রকট হবার বেশ কয়েক বৎসর পর নিত্যানন্দ প্রভু অপ্রকট হবার পর থেকেই লুপ্তপ্রায় হয়ে গেছল।

আবার সেই নামপ্রবাহকে জনচেতনায় প্রবাহিত করার কথাই ভাবছিলেন ভক্তিবিনোদ। এই মহৎ কাজ তিনি আবার শুরু করবেন।

এসময় ক্ষেত্রবাবু বিপিনবাবুরা এগিয়ে এসে ভক্তিবিনোদকে তাঁদের গ্রাম আমলাজোড়ায় নামকীর্তনের জন্য আহ্বান করেন।

ভক্তিবিনোদও এই কথা ভাবছিলেন, এবার মহাপ্রভুই যেন সেই সুযোগ এনে দিয়েছেন। ভক্তিবিনোদও এবার নামকণ্ঠে আমলাজোড়ার পথে নামলেন। অপূর্ব সেই নামগান। তাঁর উপস্থিতিতে এসে যোগ দেয় সেই গ্রামের নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা। ভক্তিবিনোদ তখন ভক্তিরসে সমাহিত, নিবেদিতপ্রাণ বৈষ্ণব। তাঁর কণ্ঠে নামগানও তাই মধুময় হয়ে ওঠে।

যে দিনাজপুরে তাঁর প্রথম বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে, সেই দিনাজপুরেই আবার যান। সেদিন দিনাজপুরের মানুষ ভক্তিবিনোদকে আবার বরণ করে নেয়।

এইসময় তিনি বলদেব বিদ্যাভূষণ-এর টীকা সম্বলিত দুষ্প্রাপ্য ভগবৎগীতার পুনঃপ্রকাশ করেন আর বাংলাটীকাসহ 'বিদ্বৎ রঞ্জন'ও প্রকাশ করেন। ভগবৎগীতার এই ভাষ্য সুধী পাঠকসমাজ সাদরে গ্রহণ করেন।

বয়স হয়ে আসছে। মনে পড়ে প্রখ্যাত বৈষ্ণব লালাবাবুর কথা। লালাবাবু ছিলেন দেওয়ান

গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের বংশধর। কান্দীর রাজা। বয়স হচ্ছে তাঁর।

একদিন পাল্কীতে চেপে মহল পরিদর্শনে যাচ্ছেন। সেখানে কি সব গোলযোগ ঘটেছে তার মীমাংসা করতে হবে। সেই চিন্তায় চিন্তিত।

পাল্কী চলেছে গ্রাম্যপথে। দিন শেষ হয়ে বৈকালের ম্লান আলোর আভা পড়ে গাছগাছালিতে, হঠাৎ নির্জন পথে পাশের রজকপল্লীর কোন রজক তার মেয়েকে ডাকছে। কাপড়চোপড় ভাটিতে দিতে হবে বাসনা দিয়ে, কলার বাসনায় ক্ষার আছে, সেই বাসনা দিয়ে কাপড় কাচা হত। সে তাই বলে—ওরে ওঠ, বেলা যে গেল, বাসনায় আগুন দে।

চমকে ওঠেন লালাবাবু, কথাটা নির্জন অপরাহ্ণে তাঁর কানে বাজে দৈববাণীর মতই। তাঁরও তো জীবনবেলা অস্তাচলের পথে, এখনও বাসনা—বিষয়-বাসনা নিয়ে মত্ত রয়েছেন। এবার বাসনায় আগুন দিয়ে ছাই করে দিতে হবে।

—ওরে থামা, পাল্কী থামা!

বেহারারা পাল্কী থামায়। রাজার আর মহলে যাওয়া হল না। তিনি বাসনা পরিত্যাগ করে চললেন কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে বৃন্দাবনে। বাকী জীবন সেই ব্রজধামেই কাটিয়েছিলেন সন্ন্যাসীর মতই সর্বস্ব ত্যাগ করে।

ভক্তিবিনোদও এবার সেই মুক্তির সন্ধান পান চাকরি থেকে। এ তাঁর মুক্তি নয়—ওই নামপ্রচার, বৈষ্ণবধর্ম প্রবাহের কাজে নিঃশেষ আত্মনিবেদন। তাই অবসর নেবার প্রাক্কালে দু'বছরের প্রাপ্য ছুটি নিয়ে এবার চৈতন্যদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করতে চান।

এখন তাঁর মনে এসেছে সেই নিঃশেষ আত্মসমর্পণ। প্রথমে ছিল বিদ্যার বৈভব। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বৈষ্ণবশাস্ত্র পাঠ করেছেন। সেই লুপ্তপ্রায় বৈষ্ণবসাহিত্যসম্ভার বৈষ্ণবধর্মকে প্রচারের জন্য নিজে লিখেছেন নানা ধর্মগ্রন্থ, পুনঃপ্রকাশ করেছেন বহু গ্রন্থের। শ্রীমদ্ ভাগবৎ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা—গীতাভাষ্য এসব রচনা করেছেন পাণ্ডিত্য আর ভক্তির আবেশে। তবু কোথায় যেন নিজের বৈশিষ্ট্য ব্যক্তিত্বের ছাপ কিছু ছিলই তাঁর অজান্তেই।

এবার নবদ্বীপ ধাম আবিষ্কার আর চৈতন্যমহিমার প্রকৃত অনুভূতিতে তাঁর চিত্তের সব কাঠিন্য আজ ভক্তির প্রবলধারায় দূর হয়ে যায়।

আর আমিত্বের লেশমাত্র নেই—এখন সর্বত্র 'তুমি'—আর সেই জীবনদেবতার চরণে ভক্তির প্রবাহধারায় অভিনিষিক্ত আত্মনিবেদন।

তাই তিনি একেবারে সহজ ভাবময় প্রেমময় ভক্তিময়। এই সময়কার তাঁর রচনা কবিতা গীতাবলীতে সেই সুরও ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এবার গোদ্রুম দ্বীপের সেই ছায়াঘন পরিবেশে তিনি একটি নিভৃত নীড় রচনা করলেন যেখানে থেকে এবার নামপ্রচারের কাজও শুরু করবেন।

নামপ্রবাহের ব্যাপক কাজ করেছিলেন নিত্যানন্দ। তারপর সেই ধারা অবলুপ্ত হয়ে যায়। এবার পুরাতন প্রথাকে আবার প্রচলিত করতে চান ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। 'নিত্যানন্দ নামহট্ট' খুলেছেন—এখানে নাম বিতরণ করা হয়। সেই আদর্শ নিয়েই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কয়েক শতাব্দী পরে আবার সেই নামহট্টের প্রচলন করলেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দদের বলেছিলেন ঃ

—শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস,
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ,
প্রতি ঘরে ঘরে গিয়ে কর এই ভিক্ষা,
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, করো কৃষ্ণশিক্ষা।

সেইমত ভক্তিবিনোদও নামপ্রচারের জন্য নামহট্টের প্রচলন করেন। তিনি নিজেকে এই নামহট্টের ঝাড়ুদার বলেই ভাবেন, ভাঁড়ারি এখানে নিত্যানন্দ। এখানের ভাণ্ডারে আছে শ্রীমৎ ভাগবত।

নামকীর্তন শুরু হল। ভক্তিবিনোদ এবার নামলেন নামপ্রচারে। তাঁর রচিত শরণাগতিতে তিনি বলেছেন জীবনের অনিত্যতা—কৃষ্ণই পরম সত্য। সেখানেই আত্মনিবেদন আনে পরম সার্থকতা। অহং আর নেই।

—বস্তুতঃ সকলি তব, জীব কেহ নয়।
অহং মম ভ্রমে ভ্রমি ভোগে শোকভয়॥
অহং মায়া অভিমান এই মাত্র ধন।
বদ্ধজীব নিজ বলি জানে মনে মন॥
সেই অভিমানে আমি সংসারে পড়িয়া।
হাবুডুবু খাই ভবসিন্ধু সাঁতারিয়া॥
তোমার অভয়পদে লইয়া শরণ।
আজি আমি করিলাম আত্মনিবেদন॥

*   *   *

ভকতিবিনোদ প্রভু নিত্যানন্দ পায়।
মাগে পরসাদ, যাহে অভিমান যায়॥

এইসময়কার রচিত শরণাগতি, উপদেশ, গীতমালা, গীতাবলি, শোকপাতন সব রচনার মধ্যে আত্মনিবেদন আর ভক্তিরসের প্রবাহই দেখতে পাই।

তাঁর লেখনীতে তখন অমৃতধারা প্রবাহিত। অতীতের 'বিজন গ্রামের' কবি এখন কৃষ্ণচেতনায় ধন্য আত্মসমর্পিত এক নতুন পদকর্তা—যার সেইসব পদগুলি শ্রেষ্ঠ মহাজনী পদাবলীর সমপর্যায়েরই বলে গণ্য করা যেতে পারে।

মনঃশিক্ষা কবিতাগ্রন্থে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ভক্তিরস-এর সংমিশ্রণে অমৃতধারায় সঞ্জীবিত করে পাঠকসমাজকে। আবার তাঁর রচিত (চাঁদ বাউল কৃত) বাউল সঙ্গীত, দালালের গীত কবিতাও কাব্যগুণ এবং তত্ত্বব্যাখ্যায় সমৃদ্ধ।

সেখানেও ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার ঃ

—কেন ভেকের প্রয়াস
হয় অকাল ভেকের সর্বনাশ।
হলে চিত্তশুদ্ধি তত্ত্ববুদ্ধি, ভেক আপনি এসে হয় প্রকাশ॥
ভেক ধরি চেষ্টা করে   ভেকের জ্বালায় শেযে মরে,
নেড়ানেড়ী ছড়াছড়ি, আখড়া বেঁধে বাস,
অকাল কুষ্মাণ্ড যত ভণ্ড,   করছে জীবের সর্বনাশ॥

তথাকথিত ভেকধারীর বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হয়েছেন।

আবার দেখি দালালের গীতে নামহট্টের কথা।

বড় সুখের খবর গাই।
সুরভিকুঞ্জেতে নামের হাট খুলেছে খোদ নিতাই॥
বড় মজার কথা তায়।
শ্রদ্ধামূল্যে শুদ্ধনাম সেই হাটেতে বিকায়॥

আবার 'শোকপাতন' কবিতাপালায় দেখি তাঁর ভক্তিরসের প্রবাহ।

শ্রীবাসঅঙ্গনে কীর্তনের রাত্রে শ্রীবাসের শিশুপুত্র অকালে মারা যেতে চৈতন্যদেব সান্ত্বনা দেন শ্রীবাসকে

—ধন, জন, দেহ, গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ
করিয়াছ শুদ্ধচিত্তে করহ স্মরণ॥
তবে কেন মমসুত বলি কর দুঃখ।
কৃষ্ণ নিল নিজ জন তাহে তার সুখ॥

*　　*　　*

দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ সবে
রাখে কৃষ্ণ, মারে কৃষ্ণ, ইচ্ছা করে যবে॥

আবার ভক্তের কাছে ভগবান ঋণী সেই কথাও বর্ণনা করেন চৈতন্যদেবের বাণীতে

—তব প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ।
আমা দোঁহে সুত জানি ভুঞ্জহ আনন্দ॥

*　　*　　*

ভজিব তোমার ঋণী আমি চিরদিন।
তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর ঋণ॥
শ্রীবাসের পায় ভক্তিবিনোদ কুজন।
কাকুতি করিয়া মাগে গৌরাঙ্গচরণ॥

সেই প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য যা দিয়ে শ্রীমৎভাগবৎ, চৈতন্যচরিতামৃত ভগবৎগীতা উপনিষদ্ আর গীতার গভীর গম্ভীর তত্ত্বের বিশ্লেষণ করেছেন নানা রচনায়, সেই ভক্তিবিনোদ-এর শেষ পর্বের এই কবিতায় দেখা যায় প্রকৃত পরিবর্তন।

শোকপাতন-এর শেষে দেখা যায় তাঁর আত্মনিবেদনের সুর। নিজের দৈন্যের কথাই বলেছেন বারবার।

—বিদ্যাবুদ্ধিহীন দীন অকিঞ্চন ছার।
কর্ম্মজ্ঞানশূন্য আমি, শূন্য সদাচার॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব মোরে দিলেন উপাধি।
ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি॥
যতন করিয়া সেই ব্যাধি নিবারণ।
শরণ লইনু আমি বৈষ্ণবচরণ॥
বৈষ্ণবের পদরজ মস্তকে ধরিয়া।
এ শোকপাতন গায় ভক্তিবিনোদিয়া॥

॥ ২৬ ॥

তখন চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের প্রাক্কালের ছুটিতে রয়েছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। কোথায় তাঁর ছুটি! তিনি তো শ্রীচৈতন্যদেবের দাস—তিনি তো এখনও ছুটি মঞ্জুর করেন নি। তাই তাঁর কর্তব্য নিয়েই মত্ত রয়েছেন ভক্তিবিনোদ।

তখন আশ্বিন মাস।

শরতের ছোঁয়া লেগেছে মেঘমুক্ত আকাশে। কাশফুলের উত্তরী কাঁপে দিগন্তে। ভাদরের পরও তখন ভরা নদী।

এই ভরা গঙ্গার বুক চিরে—রূপনারায়ণ ধরে একটি স্টীমার চলেছে রামজীবনপুর-ঘাটালের দিকে। সেই স্টীমারে চলেছেন ভক্তিবিনোদ। সঙ্গে তাঁর বন্ধু রামসেবক চট্টোপাধ্যায়, তাঁর পুরোনো বন্ধু সীতানাথ দাশ মহাপাত্র আর কাজের লোক তাঁর বহুদিনের সঙ্গী শীতল।

এবার বাংলার দূরদূরান্তরেই চলেছেন নামপ্রচারের কাজে। এখন লেখাপড়া ছাড়া এই নামপ্রচারের কাজও অন্যতম প্রধান কাজ হয়ে উঠেছে।

দিকে দিকে—দূরদূরান্তরে নামহট্ট গড়তে হবে, যেখান থেকে নিয়মিত নামপ্রচারের কাজও চলবে, চলবে বৈষ্ণব সমাগম। বৈষ্ণম ধর্মকে সমাজের বেশ কিছু মানুষের কাছে তিনি পুনঃস্থাপিত করতে পেরেছেন।

এবার তাই আরও ব্যাপক প্রচারের কাজ চালাতে হবে।

রামজীবনপুর মেদিনীপুরের গ্রাম অঞ্চলের দূরদূরান্তে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনপদ। সেই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই নামপ্রচারে অভিভূত হয়ে আবালবৃদ্ধবনিতা সেই সংকীর্তনে যোগ দেন।

এ যেন নতুন এক অনুভূতি। সমাজের বুকে নতুন জাগরণ আনে, আনে ঈশ্বরচেতনার দিব্যভাব। ধনী দরিদ্র বিচার নেই, বিচার নেই জাতপাতের, সকলেরই অধিকার এই নামগানে। দলে দলে যোগ দেয় সকলেই, আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে কীর্তনে।

সেখান থেকে গেলেন কয়াপাট বদনগঞ্জ। সেখানেও কিছু ধর্মপ্রাণ পণ্ডিতদের সঙ্গে ভক্তিবিনোদের যোগাযোগ ছিল আগে থেকেই। তাঁরাও সাদরে ভক্তিবিনোদকে আমন্ত্রণ জানান।

সেখানেও ধর্মসভায় ভক্তিবিনোদ শ্রীমদ্‌ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত প্রসঙ্গে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ দেন। চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মতত্ত্বকে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরেন সেখানের মানুষের সামনে। তাঁরাও চৈতন্যপ্রেমের পরম আস্বাদন লাভ করে ধন্য হন।

সেখান থেকে এলেন ঘাটালে।

এই অঞ্চলে তাদের ধর্মপ্রচার, ধর্মালোচনা সভার কথা এর মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছে।

ঘাটাল আরও বড় জনপদ, বড় গঞ্জ।

সেখানে রয়েছে অনেক মানুষ। সেখানেও সুসজ্জিত মণ্ডপে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর অমৃতময় ভাষণ দেন। সমগ্র মানুষ ভক্তিভরে সেই অমৃতবাণী শোনেন—সেখানে চলে নামকীর্তন।

শতসহস্র মানুষ নামপ্রবাহের পুণ্যধারায় অভিনিষিক্ত হয়।

ভক্তিবিনোদ একটানা প্রায় তেরোদিন ধরে ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের অন্তরে নামকীর্তনের প্রভাবে ভক্তিরসের অনুভূতি এনে দেন।

সাধারণ মানুষ ধন্য হয়। তাদের কাছে প্রত্যহের কাজ, সংসারের কাজ এর পর সমবেতভাবে এই নামকীর্তন মনে কি আশ্বাস আনে। এই চেতনার উন্মেষ তাদের ইতিপূর্বে হয় নি।

এই অঞ্চলের বেশ কিছু গ্রাম-গঞ্জে ভক্তরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথামত নামহট্ট গড়ে তুললেন। সেখানে নিয়মিত ধর্মসভা আলোচনা আর নামকীর্তন হতে থাকে। বহু মানুষও সমবেত হয় নিয়মিত ভাবে।

এরূপ নামহট্ট তিনি বিভিন্ন স্থানে বাংলার বহু দূরদূরান্তরে স্থাপন করেন। এদের সংখ্যা পরবর্তীকালে প্রায় পাঁচশো ছাড়িয়ে গেছল। তাদের কেন্দ্রস্থল ছিল সুরভিকুঞ্জ। এই নামহট্টের পরিকল্পনা প্রসঙ্গে এবং তার কার্যাবলী প্রসঙ্গে তিনি একটি নিবন্ধও লেখেন—শ্রীশ্রীগোদ্রুম

কল্মাটবী। এতে তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, সাংগঠনিক দিক ছাড়া তত্ত্বগত দিক নিয়েও বিশদ আলোচনা করেন।

তখনও সরকারী কাজে শেষবারের মত যোগ দেন নি। ছুটিতেই রয়েছেন। চলেছে লেখার কাজ—সজ্জতোষিণী পত্রিকার কাজ, সেখানেও বহু মূল্যবান নিবন্ধ লেখেন তিনি আর এইসঙ্গে নামপ্রচার সভায় সাধারণ মানুষের জন্য কিছু ভক্তিগীতি রচনা করতে থাকেন।

এই ভক্তিগীতিগুলি গীতমালা-গীতাবলি কবিতাগ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়। এগুলিতে উচ্চ স্তরের বৈষ্ণব তত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্বকে তিনি সহজ মর্মগ্রাহী ভাষায়, সুললিত ছন্দে রচনা করেন। এগুলি গীত হতে থাকে—সাধারণ মানুষও এই গানে আকৃষ্ট হন।

নামহট্ট পরিচালনার কাজও চলেছে। পরবর্তীকালে আবার ঘাটাল অঞ্চলের মানুষের আমন্ত্রণে সেখানে গেলেন ভক্তিবিনোদ।

আগে এখানে এসে ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বীজ রোপণ করে যান। কৃষ্ণপ্রেমের সেই বীজ এখন অঙ্কুরিত হয়েছে। ওই অঞ্চলের বহু বিদগ্ধ প্রাজ্ঞ পণ্ডিতবর্গও এখন নামহট্টে যোগ দিয়ে নামপ্রচারের কাজে ব্রতী হয়েছেন। শ্রীকুঞ্জবিহারী পাইন, পণ্ডিত উমাচরণ বিদ্যাধরের মত মানুষরাও এই নামহট্টে সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছেন।

এবার ভক্তিবিনোদের সঙ্গী হয়েছেন সীতানাথ। এঁরা পৌঁছতে সেখানে সাড়া পড়ে যায়। ভোরবেলাতেই প্রায় সহস্র নরনারী কীর্তন করে তাঁদের অভ্যর্থনা করে নামমণ্ডপে নিয়ে যান।

ধর্মসভার পর শুরু হয় নামকীর্তন। ওইসব সভায় ভক্তিবিনোদ রচিত পদাবলী গান ছিল অন্যতম প্রধান আকর্ষণ।

সেখান থেকে গেলেন রামজীবনপুর। সেখানেও মহতী জনসভার আয়োজন করেন সেখানের নামহট্টের ভক্তরা।

বিরাট ধর্মসভায় ভক্তিবিনোদ রচিত ভক্তিগীতি পরিবেশিত হবার পর তাঁর ভাষণ মুগ্ধ হয়ে শোনে মানুষ। যুগাবতার চৈতন্যদেবের বাণী, শিক্ষাকে এযুগের মানুষের সামনে তুলে ধরেন।

সন্ধ্যা নামে। দূরদূরান্তর থেকে এসেছে মানুষজন, তাদেরও ফেরার ইচ্ছা যেন নেই। শুরু হয় নামসংকীর্তন। ভক্তিপ্রেমে মাতোয়ারা জনতা রাত্রি অবধি নামকীর্তন করে ঘরে ফেরেন।

পরদিন আবার এসে নগর-সংকীর্তনে যোগ দেন। রামজীবনপুরের এই নামসংকীর্তনের দিন সারা জনপদ পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে মানুষের ভিড়ে। তোরণ মণ্ডপ করা হয়েছে পথের ধারে।

গ্রামাঞ্চলের হাজার হাজার নর-নারী এসে সংকীর্তনে যোগ দেন। হরিধ্বনিতে ভরে ওঠে আকাশ বাতাস এখানের একটি মণ্ডপে। এই মণ্ডপে রামদাস বাবাজী—দ্বারকেন্দ্র তর্কালঙ্কার ভাষণ দেবার পর এবার ভক্তিবিনোদ 'নাম' প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেন।

হাজারো কণ্ঠের উলুধ্বনি-শঙ্খধ্বনির পর শুরু হয় আবার নামকীর্তনসহকারে নগরপরিক্রমা। নামপ্রভাবে সব মানুষ যেন কি আনন্দ মেতে ওঠেন। স্কুল থেকেও ছাত্রছাত্রীরা বের হয়ে এসে হরিধ্বনি দিয়ে সেদিন নগর-সংকীর্তনে যোগ দেয়।

রামজীবনপুরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ এই উৎসবকে সর্বতোভাবে সাহায্য এবং সহযোগিতা করে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলেন।

সেখানের পার্বতীনাথ মহাদেবের নাট্যমঞ্চে প্রায় তিনহাজার ভক্তের সামনে সেদিন ভক্তিবিনোদ বেদপুরাণ থেকে উদ্ধৃত কবে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত স্বরূপ, তাঁর ধর্মতত্ত্বের অপরূপ ব্যাখ্যা করেন। আরও স্থানীয় অনেকেই ভাষণ দেন।

সেখান থেকে এবারে এলেন হাতিপুর দেবখণ্ড গ্রামে। সেখানে জগৎজননী ভদ্রকালী মন্দিরের নাটমঞ্চে বিশাল জনসভার আয়োজন করা হয়। সেখানের নামহট্টের প্রধান কেশবচন্দ্র

চক্রবর্তীর উদ্যোগে বিশাল জনতা তাদের নদীতীর থেকে নামকীর্তন শঙ্খধ্বনি করে নিয়ে যান সুসজ্জিত মণ্ডপে।

সারা অঞ্চল তখন কৃষ্ণনামে মুখর হয়ে ওঠে। 'দালালের গীত' থেকে বেশ কিছু ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশনের পর শুরু হল ভক্তিবিনোদের ভাষণ—তারপর ভক্তরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নামকীর্তন শুরু করে।

পুনরায় এলেন কয়াপাট বদনগঞ্জে—সেখানেও নামগানের জোয়ার নামে।

মনে পড়ে কয়েকশো বছর আগেকার দিনগুলোর কথা। চৈতন্যদেব—নিত্যানন্দ প্রভুর সেই ভাষণ, নামপ্রচারের কথা। যেখানেই যেতেন যেন নামগানের জোয়ার নামতো। আবার সেই দিনই যেন ফিরে এসেছে, দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর অন্ধকার তমসার পর আবার নামগানের জোয়ার এসেছে বাংলার গ্রামগ্রামান্তরে আর ভগীরথের মত সেই পুণ্যপ্রবাহকে পুনরায় স্বখাতে প্রবাহিত করেছেন শ্রীচৈতন্যদেবই তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত এই ভক্তিবিনোদের মাধ্যমে। গ্রাম-গ্রামান্তরে নামপ্রচার করে ফিরে এলেন কলকাতায়। সেখানে লেখা গ্রন্থাদি প্রকাশনার কাজ চলেছে অবিরাম। কখনও আসেন সুরভিকুঞ্জে—কখনও কলকাতায়।

মাঝে মাঝে মনে হয় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এখনও তাঁর অন্যতম প্রধান কাজ সম্পন্ন করা হয়ে ওঠে নি।

শ্রীমায়াপুর চৈতন্যজন্মস্থান এসবের অস্তিত্ব তিনি বের করেছেন, কিন্তু এর প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্য এখনও তেমন কাজের কাজ কিছুই হয় নি, যা করার খুবই প্রয়োজন, কিছু স্থায়ী চিহ্ন—মন্দির প্রতিষ্ঠান এসব গড়ে না তুললে এই আবিষ্কারের কথাও ক্রমশ মানুষ ভুলে যাবেন।

তাঁর গ্রন্থপ্রকাশ নামপ্রচার বৈষ্ণবতত্ত্বের প্রচারের মতই এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজ। এ নিয়ে ভাবেন কেদারনাথ।

সেবার কৃষ্ণনগরের নাগরিকবৃন্দের আয়োজিত বিশাল সভায় তাঁকে কিছু বলার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল। তখন ভক্তিবিনোদ বাংলার সুধীজন ধর্মপিপাসু মানুষের কাজে খুবই পরিচিত একটি নাম।

এই মহতী জনসভায় ছিলেন ত্রিপুরার মহারাজা নিজে, আর কৃষ্ণনগরের কিছু বিশিষ্ট ইংরেজ কর্মচারী মিঃ মনরো, মিঃ ওয়ালেস, মিঃ বাটলার আর ছিলেন কৃষ্ণনগরের বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ।

ভক্তিবিনোদ এই মহতী সভায় এবার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন তাঁর নিমাই জন্মস্থান আবিষ্কারের কথা, নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্যের কথা। বিভিন্ন উপনিষদ-পুরাণ—বিভিন্ন গোস্বামীদের রচনাবলী থেকে প্রমাণ উপস্থাপন করে তিনি তাঁর আবিষ্কারের গুরুত্ব এবং সত্যতাকে প্রতিষ্ঠা করেন। ঐতিহাসিক নথীপত্রে যে এই তথ্য পেয়েছেন তারও বিশদ উল্লেখ করে তথ্যপূর্ণ ভাষণ দিয়ে এই জন্মস্থানকে রক্ষা এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানান। শ্রোতৃবৃন্দ তাঁর ভাষণে মুগ্ধ, চমৎকৃত। এই তথ্য তাঁদের অজানা ছিল। ভক্তিবিনোদ তাঁর দীর্ঘদিনের সাধনায় অতীতের তমসার বুক থেকে এক পরম সত্যকে আবিষ্কার করে সারা জাতির কাছে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

সেই সভাতেই এই কর্তব্য পালনের জন্য একটি সমিতিও গড়ে উঠলো—নামকরণ করা হল 'নবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা'।

ত্রিপুরার মহারাজাও এতদিন ভক্তিবিনোদের নাম শুনেছেন, বেশ কিছু তাঁর রচিত গ্রন্থাদিও পাঠ করেছেন। কিছুদিন আগেও ওই ভদ্রলোকের সেখানে মন্ত্রী হয়ে যাবার কথা ছিল, মহারাজ তা জানতেন, আরও জেনেছিলেন যে কেদারনাথবাবু সেই লোভনীয় পদ গ্রহণ করেন নি, হেলায়

প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেদিন থেকেই মহারাজার ওই ব্যক্তিটির সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহ ছিল। তাঁর ধারণা হয়েছিল এই পদ যিনি হেলায় প্রত্যাখ্যান করতে পারেন তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন।

আজ তাঁকে দেখেছেন, তাঁর ভাষণ শুনেছেন। মহারাজের মনে হয় তাঁর অনুমান সত্যই। ইনি অসাধারণ এক ব্যক্তিত্ব, দেবতার আশীর্বাদধন্য এক মহাপুরুষ। আজ তাই মহারাজ স্বেচ্ছায় তাঁর আরদ্ধ কাজে সহযোগিতার হাত বাড়ান। তিনিই এই সমিতির সভাপতি হন আর বিশিষ্ট নাগরিকদের নিয়ে কার্যকরী সমিতি গড়ে ওঠে। সকলেই সচেষ্ট হন যাতে এই জন্মস্থান শ্রীমায়াপুরেই গড়ে ওঠে।

মহারাজা ভক্তিবিনোদকে ত্রিপুরায় যাবার জন্য আমন্ত্রণও জানান। নামপ্রচারে এবার সাড়া আসছে চারিদিক থেকে। এবার ভক্তিবিনোদও এই কাজে আত্মনিয়োগ করবেন।

এই সময় নবদ্বীপ ধামের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ এই সব আবিষ্কারের বিরুদ্ধে বেশ সোচ্চার হয়ে ওঠে। এতদিন ধরে তারা নবদ্বীপ শহরকেই প্রকৃত জন্মভূমি বলে প্রতিষ্ঠিত করে নিজেরা নানাভাবে অর্থোপার্জন করেছে, এবার তাদের এতদিনের গড়া সেই সব মন্দিরে আর হয়তো ভক্তজন আসবে না। তারা যাবে নিমাই-এর প্রকৃত জন্মস্থানে।

তাদের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে, তাই তারাও এবার ভক্তিবিনোদের আবিষ্কৃত ওই তথ্য যে প্রমাণহীন, অসত্য—এই কথাই প্রচার করতে থাকে।

আরও দলবদ্ধভাবে এই আবিষ্কার যে অসত্য তা প্রমাণ করার জন্য তৈরী হতে থাকে।

ভক্তিবিনোদের কাছেও এসব খবর পৌঁছে যায়। কিন্তু তিনি দ্বিধাহীন চিত্তে বলেন—চৈতন্যদেবই এসব সত্য উদ্‌ঘাটন করার শক্তি দিয়েছেন—তাই হয়েছে। এখন যা সত্য তা তিনিই নির্ধারিত করবেন।

তাঁর লেখা আর প্রচারের কাজও চলছে সমানে। এবার নামপ্রচারে গেলেন বসিরহাটে। সেখানেও জনতা তাঁকে সাদরে বরণ করে নেয়।

নগরের পথে পথে ধ্বনিত হয় নামগানের সুর। মানুষ যেন নামকীর্তনে এক নতুন অনুভূতির স্পর্শ পায়, পায় দুঃখ-শোকসন্তপ্ত সংসারে শান্তির আশ্বাস।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবার দিকে দিকে নামপ্রচারের কেন্দ্র গড়ে তুলছেন। বহুস্থানে গড়ে উঠেছে নামহট্ট, সেখানে ধর্মসভা নামকীর্তন হয়।

আবার বৃন্দাবনের ডাক শোনেন তিনি। ভক্তিভৃঙ্গ মশায়কে সঙ্গে নিয়ে গেলেন বৃন্দাবনে। তখন চুরাশি ক্রোশ বৃন্দাবন পরিক্রমা শুরু হয়েছে। তীর্থযাত্রীরা মথুরা বৃন্দাবন থেকে দলবেঁধে যাত্রা করেন—ষোলদিন ধরে চলে এই পরিক্রমা। দিনভোর পথ চলে যাত্রী নামকীর্তন করে, রাতে কোনদিন শ্যামকুণ্ড, কোনদিন গিরিগোবর্ধন—এমনি করে রাধাকুঞ্জ, বর্ষান মধুবন তালবন প্রভৃতি সব লীলাস্থল পরিভ্রমণ করেন। বৃন্দাবনের পুণ্য মৃত্তিকার আকাশ বাতাসে ধ্বনিত হয় এক দৈবী সুর, সেই সুর তাঁর অন্তরে কি তীব্র অনুরাগ-ভক্তির স্পর্শ আনে, মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ আজও যেন এই জগতে বিদ্যমান। তাঁর অস্তিত্বের অনুভূতি পায় সেই সব মানুষ যাদের চিত্তশুদ্ধি ঘটেছে—ঘটেছে সব পাপের পাশ থেকে মুক্তি।

বিচিত্র সেই অনুভূতি নিয়ে ফিরলেন ভক্তিবিনোদ বৃন্দাবন থেকে কলকাতায় তাঁর কর্মস্থলে। সেখান থেকে গেলেন সুরভিকুঞ্জে।

তাঁর লেখার কাজও সমানে চলেছে।

প্রচারের কাজে জনসাধারণের মধ্যে সহজবোধ্য ভাষায় তিনি লিখলেন 'বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত মালা'।

এই সব লেখায় তিনি নামমাহাত্ম্য, নামপ্রচার, নামতত্ত্ব—এইসব বিষয়েও বিশদ আলোচনা করেন। নামপ্রচারের সময় এইসব পুস্তিকা ভক্তদের মধ্যে প্রচার করা হতো।

এই সময় তিনি শ্রীমন মহাপ্রভুর শিক্ষা নামে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শনের উপর প্রসঙ্গত এই গ্রন্থটি এগারোটি অধ্যায়ে রচিত হয়। প্রচুর সংস্কৃত শ্লোক তিনি বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে তাঁর এই দর্শন বিচারের স্বপক্ষে যুক্তি দিয়ে সেই মূল্যবান গ্রন্থটি রচনা করেন।

তাঁর রচনাশক্তি ছিল অপরিসীম। যেন শ্রীচৈতন্যদেবের আশীর্বাদেই এটা সম্ভব হয়েছিল। নাহলে একটি জীবনে এত সব কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে এত পড়াশোনা করে তা অন্তরে গ্রহণ করে এত মূল্যবান রচনার সৃষ্টি করা কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের অপার শক্তির মূর্ত প্রতীক। তিনিই ভক্তিবিনোদের অন্তরে মনে এই দুর্জয় শক্তি যুগিয়েছিলেন, তাঁর সেবাতেই তাই ভক্তিবিনোদ এইভাবে আত্মনিবেদন করে ধন্য হয়েছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের কৃপাতেই এই বিস্তৃত কর্মযজ্ঞে তিনি নিজেকে আহুতি দিতে পেরেছিলেন। তাঁর যোগাযোগ বজায় ছিল জগন্নাথদাস বাবাজীর সঙ্গেও। অবকাশ পেলেই ভক্তিবিনোদ তাঁর কাছে আসতেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে নিজেও অশেষ তৃপ্তি পেতেন ভক্তিবিনোদ এই দেবদুর্লভ সাধুসঙ্গে।

এবার অবসর গ্রহণের আগে শেষবারের মত চাকরিতে যোগ দিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। যোগ দিতে খুব আগ্রহী ছিলেন না তিনি। তিনি এখন অন্য পথের পথিক।

কৃষ্ণসেবাতেই দিন কাটাতে চান, কিন্তু চীফ সেক্রেটারী স্যার হেনরি কটন এমন একজন যোগ্য অফিসারকে ছাড়তে চান না। তাই তিনি বার বার অনুরোধ করেন ভক্তিবিনোদকে চাকরিতে যোগ দেবার জন্য। তাঁর অনুরোধে শেষ অবধি ১৮৯৩ সালের মাঝামাঝি তিনি যোগ দিলেন আবার চাকরিতে।

তিনি চেয়েছিলেন কৃষ্ণনগরেই যোগ দিতে, যাতে সুরভিকুঞ্জ আর শ্রীমায়াপুর, নবদ্বীপ ধামের কাছাকাছিই থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁকে দরকার আরও বড় কাজের জন্য, তাই সরকার তাঁকে সাসারামেই পাঠালেন।

ওখানে বেশ কিছুদিন ধরে নানা অশান্তি গোলমাল চলেছে হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাই ওই সব গোলমালের সুষ্ঠু নিষ্পত্তির জন্য একজন যোগ্য অফিসার সেখানে পাঠানো দরকার যিনি এসব সমস্যার সমাধান করতে পারবেন।

স্যার হেনরী কটন তাই কেদারনাথকে সাসারামে পাঠালেন।

বিহারের সাসারাম প্রাচীন শহর। শেরশার সমাধি এখানেই রয়েছে। এই শহরে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই দীর্ঘদিন ধরে পাশাপাশি বেশ সদ্ভাবের সঙ্গেই বাস করে এসেছে।

পুরোনো শহর। বহু ঘিঞ্জি জনবহুল এর পথ। এইসব অলিগলিতেই ঘন বসতি আর সর্বত্রই রয়েছে উভয় সম্প্রদায়েরই লোক। একত্রে মানুষ রয়েছে—কোন বিদ্বেষ ছিল না।

ইদানীং গোবধ নিয়ে হঠাৎ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বেশ কিছু মনোমালিন্য, ভুল-বোঝাবুঝি ঘটেছে আর তারই ফলশ্রুতি হিসাবে এখান ওখানে বিভিন্ন মহল্লায় পরস্পরের মধ্যে বেশ কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে।

দু'পক্ষই এখন যুধ্যমান। সারা শহরের দুই সম্প্রদায়ের মানুষই যেন বড় ধরনের কোন

সংঘাতের জন্য তৈরী হয়ে আছে। শহর এখন অগ্নিগর্ভ।

সেই পরিবেশ এসে নতুন পদে সাসারামে যোগ দিলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তাঁর মনে হয়, এ যেন আবার আর এক পরীক্ষার মধ্যেই তাঁকে ফেলেছেন চৈতন্যদেব। তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা জানান যেন এই পরিস্থিতি তিনি কিছুটা বদলাতে পারেন।

তাঁর কাছে খবর আসছে কোন্ কোন্ মহল্লায় গোলমাল বাধছে। তিনিও সেই সব পরিস্থিতির সামাল দেবার চেষ্টা করেন। প্রশাসনের দায়িত্ব তাঁর উপরই। তাই এসব তাঁকেই করতে হবে।

তিনিও যথাসাধ্য চেষ্টা করে চলেছেন যাতে এই দাঙ্গা আর না ঘটে।

এই সময় সাসারামের এক সন্ন্যাসী আদালত বিল্ডিং-এর সামনে একটা জমি কিনে সেখানে মন্দির তৈরীর কাজ শুরু করে।

এবার ওই অঞ্চলের অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন আপত্তি তোলে—ওটা কবরস্থান ছিল, ওখানে মন্দির তৈরী করা যাবে না।

তারা সরকারকেও তাদের আপত্তির কথা জানাতে ভক্তিবিনোদ তখনই সন্ন্যাসীকে কাজ আপাতত স্থগিত রাখতে বলেন আর এই বিষয়ে প্রকৃত ঘটনা কি সেটা জানার জন্য তদন্ত শুরু করেন।

ওখানের মুসলমান সেরেস্তাদারকে বলেন এই বিষয়ে পূর্ণ তদন্ত করে তাঁকে জানাতে। এছাড়াও তিনি স্থানীয় বাসিন্দা—ওই অঞ্চলের অন্য সম্প্রদায়ের লোকদের কাছেও খোঁজখবর নিতে থাকেন।

তখন শুধু সাসারাম শহরেই নয়, তার আশপাশের গ্রাম অঞ্চলেও দুই সম্প্রদায়ের এই সংঘাত ছড়িয়ে পড়েছে। এই সময় একটা সরকারী কাজে ভক্তিবিনোদকে নাসিরগঞ্জ শহরে যেতে হয়।

ভক্তিবিনোদ তখন সাসারামে নেই—তদন্ত চলছে, কিন্তু সেই সন্ন্যাসী আর তার চ্যালারা এবার আর অপেক্ষা না করেই মন্দির তৈরির কাজ শুরু করে দেয় তোড়জোড় করে।

এবার অন্য সম্প্রদায়ের লোক বাধা দিয়েও থামাতে পারে না। এদের দলবলও কম নেই। মন্দিরের কাজ এগিয়ে চলে। এবার স্থানীয় অন্য সম্প্রদায়ের লোকজন সদরে কমিশনার সাহেবের কাছে নালিশ জানায় যে এখানের হিন্দুদের নানা অন্যায় বেআইনী কাজে হিন্দু অফিসাররাও মদত দিচ্ছেন।

ভক্তিবিনোদ তখন সাসারামের বাইরে, কিন্তু দুই পক্ষের অন্যায় জিদ কার্যকলাপের জন্য তাঁকেও কিছু পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ শুনতে হয়।

এইসব কারণে তাঁর ওখানের কাজকর্ম ভালো লাগে না। এই জায়গা থেকে বদলি নেবার চেষ্টা করতে থাকেন।

এই সময় আর একটা ঘটনাও ঘটে যায়। তাতে তাঁর প্রশাসনিক দৃঢ়তার পরিচয়ই ফুটে ওঠে।

শুধু সাসারামই নয়, তার আশপাশের অঞ্চলেও তখন দুই সম্প্রদায়ের বিদ্বেষের আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। সাসারাম থেকে কিছু দূরে 'কায়থ' একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ। সেখানেও এই সব গোলমাল শুরু হয়েছে।

সেখানের এক ব্রাহ্মণের একটা সুন্দর ষাঁড় ছিল। ধর্মের ষাঁড় যত্রতত্র ঘোরে। ব্রাহ্মণ তাকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছিল। সেই ভদ্রলোক কিছুদিনের জন্য পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে যায়।

তীর্থ থেকে ফিরে দেখে তার ষাঁড়টার আর পাত্তাই নেই। খোঁজাখুঁজি করতে শেষে জানতে পারে যে ওখানের এক কশাই সেই ষাঁড়টাকে কেটে ফেলেছে।

এতেই চটে ওঠে সেই ভদ্রলোক, আর সেখানে তারও প্রতিষ্ঠা কিছু আছে, তাই সে সহজে

থামতে চায় না।

কশাইকে শাসায়। আর কশাইও বলে—বেশ করেছি, দরকার হলে আবার করবো।

এতবড় ঔদ্ধত্যে চটে ওঠে সেই ভদ্রলোক। সেও গ্রামের লোকদের তাতিয়ে তোলে। ফলে হাটবারের দিন ওই এলাকার বহু হিন্দুরা জমায়েত হয় লাঠিসোটা নিয়ে, সেই কশাইকে উচিত শিক্ষা দিতে যায়। কিন্তু ওই গোলমালের খবর পেয়েই সেও কোথায় পালিয়ে গেছে, তাই কশাইকে আর পাওয়া যায় না। সেই জনতা ওই অঞ্চলে সামান্য ভাঙচুর করে বীরত্ব দেখিয়ে ফিরে আসে।

এবার প্রতিপক্ষও এই আক্রমণের জবাব দেবার জন্য তৈরী হয়। তারাও অন্য কারও হুমকির সামনে মাথা নীচু করবে না।

তারাও এবার তৈরী হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে এদের আক্রমণ করে। দুই পক্ষের লড়াই হয়ে যায়, বেশ কিছু লোকজন আহত হয়—হাসপাতালেও পাঠাতে হয় অনেককে।

এবার সরকারও এক্ষেত্রে নীরব থাকতে পারে না। পুলিশ দুই পক্ষের লোকজনকেই অ্যারেস্ট করে।

কেদারনাথের এজলাসে বিচার হয়। হিন্দুরাই প্রথমে আক্রমণ করে, তাই কেদারনাথও বিনা দ্বিধায় এবার তাদের কয়েজনকে শাস্তি দেন আর ওই পক্ষেরও কয়েজনকে বেআইনী অস্ত্র নিয়ে হামলা করা, শান্তিভঙ্গ করার দায়ে শাস্তি দেন।

ফলে ওই অঞ্চলে উভয় পক্ষই এবার কিছুটা সংযত হয়। সেই অঞ্চলে দাঙ্গাহাঙ্গামাও থেমে যায় তাঁর এই নির্দেশের ফলে।

এরপরই তাঁর বদলির দরখাস্ত মঞ্জুর করা হল, তিনি আবার এলেন কৃষ্ণনগরে।

কৃষ্ণনগরে ফিরে এসে আবার নবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার কাজ শুরু করলেন নতুন উদ্যমে।

সভায় কৃষ্ণনগরের বহু মানুষ এবার পরিকল্পনা নেন। যোগপীঠে মন্দির প্রতিষ্ঠা করে মূর্তিস্থাপনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতদিন ওই স্থানে কিছু তেমন করাও যায় নি, তেমনিই ঝোপঝাড়ে ভর্তি হয়ে রয়েছে। এবার সেখানে মন্দির তৈরী করার পরিকল্পনা নেওয়া হল—অনেক টাকার দরকার।

ভক্তিবিনোদ তবু দমে যান না। চৈতন্যদেবই তাঁকে সেই শক্তি সাহস দেন। নবরূপে তিমির অন্ধকারের বুক থেকে বৈষ্ণবধর্ম—শ্রীচৈতন্যদেবকে জনমানসে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা তাঁর জীবনের ব্রত। তাই তিনি যেভাবেই হোক এই ব্রত উদ্‌যাপন করবেনই, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস এই কাজে সামর্থ্য যোগাবেন স্বয়ং চৈতন্যদেবই।

মন আর চায় না চাকরির বাঁধনে বদ্ধ থেকে মূল্যবান সময় নষ্ট করতে। তখন তাঁর বয়স ছাপ্পান্ন বৎসর। তখনও বেশ কয়েক বৎসর চাকরি তাঁর রয়েছে। তখনকার দিনে এই সম্মান—অনেক বেশী টাকা মাইনের চাকরিও তাঁর কাছে অর্থহীন বলেই মনে হয়।

সরকারের গোলামী না করে এবার সারাসময় বাধাবন্ধনহীন হয়ে চৈতন্যদেবের সেবায়, নামকীর্তন ধর্মপ্রচার আর মায়াপুরে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার কাজেই ব্যাপৃত হবেন। তাই এই চাকরি আর নয়, এবার স্বেচ্ছায় অবসর নেবেন এই বন্ধন থেকে।

বাধা হয় সরকারই। তখনকার দিনে কিছু ইংরেজ সরকারী কর্মচারী ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। তাঁরা কেদারনাথের মত পণ্ডিত, সুলেখক, সুবক্তা, সৎ-নিষ্ঠাবান অফিসারকে যথেষ্ট সম্মান দিতেন। প্রশাসনের পক্ষে তিনি ছিলেন অপরিহার্য। বহু সমস্যা থেকে সরকারকে বার বার মুক্ত করেছেন।

সরকারও তাঁকে এই স্বেচ্ছা অবসর নেবার কথায় আপত্তি তোলে, সামনে পদোন্নতিও হবে।

ওদিকে সংসারী লোক কেদারনাথ। সংসারে সন্তানসন্ততি, পোষ্যবর্গ, আশ্রিতের সংখ্যাও কম নয়। ভগবতী দেবীও স্বামীর এই স্বেচ্ছা অবসর নেবার সিদ্ধান্তে চিন্তিত হন। অবশ্য ছেলেরাও যোগ্য হয়েছে।

কিন্তু সংসারে প্রতিমাসে একটা মোটা টাকা আসতো, সেটাও বন্ধ হয়ে যাবে। তাই স্বামীকে বোঝাবার চেষ্টা করেন ভগবতী দেবী—দেবসেবা, অতিথিসেবা, সংসারের নানা খরচা আছে—নিয়মিত টাকা না এলে এসব চলবে কি করে?

ভক্তিবিনোদ হাসেন। তাঁর এতদিনের সাধনায় এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়েছে যে তিনি নিমিত্ত মাত্র, শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশেই চলেছেন। সবকিছু চলেছে তাঁরই ইচ্ছায়। তাই স্ত্রীব কথায় বলেন—তাঁর কাজেই পূর্ণ সময় দেব, এবার আমার ভাবনা তাঁর। এ নিয়ে তুমি ভেবো না। কিছু সঞ্চয় তো আছে। দিন ঠিক তিনিই চালিয়ে দেবেন। আর এই স্বেচ্ছা অবসর নিচ্ছি—এ তো তাঁরই নির্দেশ।

স্বামীর এত বড় বিশ্বাসে ভগবতী দেবীও এবার নিরস্ত হন। স্বামীর সাধনপথে তিনি কোনদিন বাধা হন নি, আজও তাই হন না। শ্রীকৃষ্ণে নিঃশেষ আত্মসমর্পণ করার শক্তি তাঁর নেই। তবু স্বামীর কথায় আর বাধা দেন না, তাঁর নির্দেশই মেনে নেন ভগবতী দেবীও। কেদারনাথ এবার নিঃসঙ্কোচে এতদিনের সরকারী চাকরি থেকে কর্তৃপক্ষের অনুরোধ না মেনে মুক্তির পথই খুঁজে নিলেন। অবসর নিলেন তিনি স্বেচ্ছায়—এবার পূর্ণ আত্মনিবেদন করবেন তাঁরই চরণে।

মায়াপুরস্থ যোগপীঠে মন্দির তৈরী করতে হলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে চৈতন্যদেবকে, তার জন্য চাই অর্থ।

৬ই ডিসেম্বর ১৮৯৪ সালের অমৃতবাজার পত্রিকার একটি সংবাদের মাধ্যমে ভক্তিবিনোদের এই কাজে আত্মনিয়োগের সংবাদ দেখা যায় ঃ

—Babu Kedarnath Dutt, the distinguished Deputy Magistrate, who has just retired from the service, is one of the most active members. Indeed, Babu Kedarnath has been deputed by the committee to raise subscription in Calcutta and elsewhere and is determined to go from house to house, if necessary, and beg a rupee from each Hindu gentleman for the noble purpose.

সেকালের সমাজের একটি বিশিষ্ট স্থানে থেকেও ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মায়াপুরের মন্দির নির্মাণকার্যে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলকাতার পথে পথে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে বের হয়েছিলেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য যোগপীঠে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দির তৈরী করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা। তার জন্য পথে নেমেছিলেন তিনি।

ভক্তিবিনোদ এইভাবে দ্বারে দ্বারে ঘুরে অর্থ সংগ্রহ করেন আর অন্যদের সহযোগিতায় এবার মায়াপুরে নিমাইজন্মভূমিতে শুরু হল মন্দির তৈরীর কাজ।

সেই তুলসীবনঢাকা টিবি কেটে মন্দিরের ভিত গড়ার কাজ চলেছে, মাটির তলা থেকে বের হয় এক বিষ্ণুমূর্তি। প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত জগন্নাথ মিশ্র পূজিত বিষ্ণুমূর্তির বর্ণনার সঙ্গে এটির সবিশেষ মিল খুঁজে পান পণ্ডিতরা। আর তাঁদের ধারণা আরও বদ্ধমূল হয় এটিই প্রকৃত জগন্নাথ মিশ্রের পূজিত দেবতা—এতদিন যা মাটির অতলে প্রোথিত হয়ে ছিল। আর সন্দেহের কোন অবকাশই নেই—তাঁরাও এবার এই বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্তিতে মেনে নেন যে এইস্থানই প্রকৃত নিমাই-এর জন্মস্থান, জগন্নাথ মিশ্রের আবাসস্থল।

পূর্ণোদ্যমে মন্দির তৈরীর কাজ চলেছে, অর্থও এসে যায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ঐকান্তিক চেষ্টায় নানা স্থান থেকেই, সবই যেন চৈতন্যদেবেরই ইচ্ছায় ঘটে চলেছে।

ওদিকে গঙ্গার ওপারের নবদ্বীপ শহরের বেশ কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ এই নবপ্রচারেব বিরোধিতা শুরু করে। আন্দোলন শুরু হয় সেখানে। তারা জেনেছে যোগপীঠ মায়াপুর ধামেব প্রকৃত পরিচয়, মহিমা প্রচার হলে তাদের এই সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবে। তাদের এখানে যাত্রীসমাগম, ব্যবসাপত্র—নানা ধান্দার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

তাই তারাও প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। প্রকাশ্যে বলে—সব বাবাজীদের ধাপ্পা, আসল তীর্থ এখানেই।

পরোক্ষভাবে এই কাজের উদ্যোক্তাদের এমনকি ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকেও হুমকি দেওয়া হয়—এসব নিয়ে আর যেন অগ্রসর না হন।

কিন্তু কেদারনাথকে তারা ঠিক চেনে নি। ধর্মের স্বার্থপরতা গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তিনি সর্বদাই সোচ্চার। তথাকথিত তৎকালীন অনেক বৈষ্ণব প্রধানের ব্যবহার তাঁর ভালো লাগে নি, তার প্রতিবাদও করেছেন তাঁর পত্রিকায়।

"আজকাল যারা বৈষ্ণব ধর্মের আচার্য, তাহারা কোন প্রকার অসম্মান সহিতে পারেন না। প্রথমেই সকলের মস্তকে পদ উত্তোলন করিয়া স্বীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন। আচার্য বলিয়া অপরে সম্মান করে তাহা অন্যায় নয়, কিন্তু নিজে সেই সম্মান হস্তগত করিবার যিনি যত্ন করেন, তাহার শ্রেয় কোথায়? কোন ব্যক্তি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করে নাই, বা আচার্যদিগেব আসনে অন্য কেহ বসিলে তাঁহাদের যে ক্রোধোৎপত্তি হয় তাহা নিতান্ত দুঃখের বিষয়। এই সকল কার্য কেবল প্রতিষ্ঠার আশা হইতে উদিত হয়।

...হায়, প্রতিষ্ঠার আশা আমাদিগকে ছাড়িতে চাহে না।"

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ধর্মের এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে চিরকাল মুখর, প্রতিবাদে সাহসী—তৎপর। এর পরিচয় আমরা আগেও পেয়েছি। বিষকিষণের অগ্নিবাণেও তিনি ভয় পান নাই, পুরীর রাজাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধেও তিনি ব্যবস্থা নিতে ভয় পান নাই।

এক্ষেত্রেও ওই প্রতিপক্ষের শাসানিতে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে মন্দির তৈরীর কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। বহু ভক্ত সৎ বৈষ্ণব তাঁর পাশে এসে সমবেত হন, নানা ভাবে সাহায্যের জন্যও এগিয়ে আসেন অনেকেই।

অবশেষে সেই শুভদিন সমাগত হয়। গৌরপূর্ণিমা ১৮৯৫ সাল, মন্দির প্রতিষ্ঠার শুভ মুহূর্ত সমাগত। অতীতে খেতুরি ধামে নরোত্তম দাস ঠাকুরের পুণ্যভূমিতে সমবেত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেবের অনুগামীরা এক মহোৎসবে, তেমনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন মায়াপুরে এসে সমবেত হন বহু ভক্ত বৈষ্ণব, সাধারণ গৃহী অনেকেই।

বিশাল আয়োজন। সুসজ্জিত মণ্ডপে চলে বৈষ্ণব কীর্তনধারার একটি শাখা—মনোহরশাহী কীর্তনের আসর। সেখানে শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্তন চলেছে, চলেছে নামগান।

যেদিন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করা হলো শ্রীচৈতন্যদেব আর বিষ্ণুপ্রিয়ার মূর্তি, ভক্তগণের নামকীর্তনে মায়াপুরের আকাশ বাতাস আবার কয়েক শতাব্দী আগেকার কালের মতই মুখর হয়ে ওঠে।

ক্রমশ আরও অনেক বৈষ্ণব পণ্ডিত আচার্যগণ এখানে আসতে থাকেন। আর প্রতিপক্ষ অবশ্য তেমন কোন জোরদার প্রমাণ উপস্থাপনা করতে পারে না যা দিয়ে নবদ্বীপ শহরের প্রাচীনতা, সত্যতাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তারা। ফলে তাদের সেই আন্দোলনেও ভাঁটা পড়ে।

নামকরা পণ্ডিতরাও মায়াপুরকেই মেনে নেন প্রকৃত জন্মস্থান হিসাবে। এবার ভক্তিবিনোদের চেষ্টায় লুপ্ততীর্থ আবিষ্কৃত হলো—তার নবদ্বীপ ধাম মাহাত্ম্য গ্রন্থও ঘরে ঘরে ভক্তজনের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হলো।

॥ ২৯ ॥

ত্রিপুরার মহারাজার আমন্ত্রণ আসে।

বাংলার শেষপ্রান্তে বনপর্বত সমাকীর্ণ ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা। এখানের রাজবংশ ধর্ম-সাহিত্য-সংস্কৃতির অন্যতম ধারকবাহক।

মহারাজা বীরচন্দ্র দেববর্মণ নিজেও বিষ্ণুর ভক্ত, বৈষ্ণব।

মণিপুর ত্রিপুরা দূরস্থান হলেও সেখানে বৈষ্ণবধর্মের প্রতিষ্ঠা দীর্ঘকালের। মণিপুরের মাটিতেই কৃষ্ণপ্রেমধর্ম প্রবাহিত। তাদের সংস্কৃতিতেও কৃষ্ণ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছেন। ত্রিপুরাতেও তার প্রভাব পড়েছে।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাই দূর এই রাজ্যেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নাম প্রচারের জন্যই গেলেন। ত্রিপুরার মহারাজা, সাধারণ মানুষ তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। সকলেই তাঁকে সাদরে বরণ করে নেন।

সেখানে মহতী জনসভায় ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নামমাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বেদ উপনিষদ পুরাণ শ্রীমৎভাগবৎ প্রভৃতি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রাঞ্জল ভাষণ দেন।

তাঁর এই ভাষণে পণ্ডিতসমাজ অভিভূত হন, জনসাধারণ তাঁর ভক্তিনম্র এই ভাষণে নিজেদের অন্তরেও এক অপূর্ব অনুভূতির স্পর্শ পায়।

চারদিন ধরে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিভিন্ন স্থানে ভাষণ দেন—নামকীর্তনও শুরু হয়। ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ এক নতুন চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে।

এই অনুভূতির আবেগ তাদের ইতিপূর্বে হয় নি, এই মহাপুরুষের বাণী—তাঁর নামগান সমবেত জনতাকেই এক ভক্তিরসের প্লাবনে আপ্লুত করে।

রাজপরিবার, সাধারণ মানুষ ক'দিনেই যেন এক আনন্দ অনুভূতির স্বাদ পান এই নামগানে। ত্রিপুরায় নামপ্রচার শুরু হলো।

মুগ্ধ হলেন মহারাজা স্বয়ং। তাঁর ছেলে পরবর্তীকালে মহারাজা রাধাকিশোর দেববর্মাও ভক্তিবিনোদের পরম অনুরক্ত ভক্ত হয়ে ওঠেন।

আজ তাঁদের মনে হয় অতীতে এই মহাপুরুষকেই তাঁরা পেতেন তাঁদের রাজ্যের মন্ত্রী হিসাবে। কিন্তু তা পান নি, সেই দুঃখ আজ তাঁদের দূর হয়ে যায়। আরও আপনজন হিসাবেই পেয়েছেন তাঁরা ভক্তিবিনোদকে।

ত্রিপুরা রাজপরিবারের কাছে তিনি এক পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। পরবর্তীকালেও ত্রিপুরার মহারাজা কোন পরামর্শের প্রয়োজন হলে ভক্তিবিনোদের কাছেও আসতেন। তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব কৃষ্ণে অনুরাগ তাঁকে এক বিশিষ্ট নবদেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ত্রিপুরার মানুষের মনে নবচেতনার আভাস রেখে এলেন।

সেই চাপরাশের কথাই আসে আবার। সাধারণের কেউ মানে না, যেই 'চাপরাশধারী' কেউ এলে সকলেই মানে।

তেমনি কৃষ্ণপ্রেমের 'চাপরাশ'ই পেয়েছেন ভক্তিবিনোদ, তাই তার ভাষণে নামগানে বিশেষ

শক্তি সঞ্চারিত হয় যা মানুষের মনে একটা স্থায়ী প্রভাব রাখে।

সেইজন্যই এবার প্রচারের কাজে নেমেছেন তিনি। কলকাতার শহরতলি অঞ্চলে এবার শুরু হল তাঁর নামপ্রচার। শহর, শহরতলি অঞ্চলের মানুষ এবার ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম প্রচারে সাড়া দেন অভূতপূর্ব উৎসাহ নিয়ে। তাঁর নাম তখন বহুজন জেনেছে, সেই পরম পণ্ডিত বৈষ্ণবকে দর্শন করার জন্যও বহু মানুষ ভিড় করে। তাঁর নামগানে তাই আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এসে যোগ দেয়। নামগানে মুখর হয়ে ওঠে আকাশ বাতাস।

তখনকার দিনে বৃটিশ সরকারের খেতাব দেওয়ার পদ্ধতি ছিল। আর সমাজে সেই সব খেতাব পাওয়া লোকদের প্রতিষ্ঠা-সম্মানও হতো প্রচুর। সরকারও কেদারনাথকে তাঁর অক্লান্ত সেবা এবং কর্মদক্ষতার জন্য পুরস্কার দিতে চাইলেন। কিন্তু কোন খ্যাতি স্বীকৃতির মোহ তাঁর ছিল না। মায়াবাদকে তিনি জয় করেছেন ব্যবহারিক জীবনেও। তাই সেই সম্মানও তিনি বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে নিজের কাজেই আত্মনিয়োগ করলেন।

এইসময় তাঁর লেখায় যেন জোয়ার এসেছিল। সর্বভারতীয় ক্ষেত্র থেকে বিভিন্ন মনীষী পণ্ডিত বৈষ্ণবধর্মের বিভিন্ন শাখার লুপ্তপ্রায় ধর্মগ্রন্থগুলিকে উদ্ধার করে পুনঃপ্রকাশিত করলেন

তাঁর অমৃত ভাষ্য সম্বলিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাংলার চিন্তামানসে তখন সাড়া এনেছে। তিনি হরিভক্তি কল্পলতিকা, কোন এক অজ্ঞাত পণ্ডিতের রচনা, তাকেও যোগ্য মর্যাদা সহকারে প্রকাশ করেন। মাধবাচার্যও এক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু—তাঁর রচিত তত্ত্ব মুক্তাবলী, ঈষোপনিষদকে ব্যাখ্যা করে নিজের রচনা বেদার্ক দীধিতি, বল্লভাচার্যের ষোলটি মূল্যবান নিবন্ধকে একত্রিত করে নিজে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন 'ষোড়শগ্রন্থ', রঘুনাথদাস বাবাজী কৃত গৌরাঙ্গ স্তব কল্পতরু। পণ্ডিত প্রদ্যুম্ন মিশ্র রচিত মনসন্তোষিনী, দক্ষিণ ভারতের শ্রদ্ধেয় বৈষ্ণব পণ্ডিত রাজা কুলকেশ্বর রচিত মুকুন্দমালা স্তোত্রম্, 'কৃষ্ণবিজয়' কাব্যের রচয়িতা গুণরাজ খান-এর শ্রীলক্ষ্মীকারিতা, অজ্ঞাত জ্ঞান কবির রচিত নারদপঞ্চকারিতা থেকে সংগৃহীত নামস্তোত্র এবং অন্যান্য রচনাও নিজের সম্পাদনায় প্রকাশ করেন।

তখন তিনি নামপ্রচার আর গ্রন্থরচনা-প্রকাশনা-সম্পাদনার কাজে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেছেন।

বিরাট একটা কর্মকাণ্ডের পিছনে থেকে দীর্ঘদিনের অক্লান্ত পরিশ্রম, দুস্তর সাধনা। বিশাল মহীরুহের নীচে মাটির অতলে থাকে শিকড়ের বিস্তার। দীর্ঘদিন ধরে মৃত্তিকার অতল থেকে রস আহরণ করে সে যুগযুগের পরিশ্রম মহীরুহে পরিণত হয়। আর এর জন্য কাল অর্থাৎ সময়েরও একটা বিশেষ ভূমিকা আছে।

ভক্তিবিনোদের এই দীর্ঘদিনের অক্লান্ত সাধনা চৈতন্যদেবের কৃপায় তাঁরই নির্দেশে এবার এক বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে চলেছে।

কেদারনাথ যখন যুবক—তখন থেকেই তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন। তাঁর উদার মানসিকতা সব কিছু থেকেই সৎশিক্ষা নিতেই সাহায্য করেছে। তাই পাশ্চাত্যের যা ভালো সেগুলোকেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

তখনই তাঁর মনে হয়েছিল ওদের ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস ওরা ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে এদেশে এনে নিজেদের ধর্ম-সংস্কৃতির জয়রথ চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আমাদেরও যা শ্রেষ্ঠ—সেই ধর্মদর্শনকে আমরাও তাদের গোচরে আনবো। আমাদেরও প্রকৃত সমাজের সংবাদ তাদেরও জানা প্রয়োজন। তাই যৌবনকাল থেকেই ইংরাজীতে কাব্য-কবিতা-প্রবন্ধ এসব রচনা করেছেন।

এতদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমে ভক্তিবিনোদ আজ যা কিছু জেনেছেন সেই মুক্তারাজির খবর বিদেশের মানুষকেও জানানো দরকার। চৈতন্যদেবের যুগোপযোগী এই উদার ধর্মদর্শনের কথা

পশ্চিমের মানুষকে জানাতে হবে।

শ্রীচৈতন্যদেব নিজেই সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাই বলেছেন দৃঢ়কণ্ঠে যে পৃথিবীর সর্বত্র নগর গ্রামে তাঁর নামবাণীর প্রচার ঘটবে। চৈতন্যদেব শুধুমাত্র বাংলা-ভারতের মানুষের মুক্তিপথের সন্ধানই দেন নি—তিনি পৃথিবীর যেখানে যত মানুষ আছে তাদের তাপসন্তপ্ত জীবনে মুক্তিপথের সন্ধানই রেখে গেছেন।

তাই কেদারনাথ ভাবেন সারা পৃথিবীর কোণে কোণে—বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষও একত্রিত হয়ে নামকীর্তন করবে। দেশদেশান্তরে তাঁর মহিমা প্রচারিত হবে।

এইসময় ভারতের আর এক সর্বত্যাগী বীর সন্ন্যাসী ভারতের সনাতন ধর্মকে আমেরিকার শিকাগো শহরের বিশ্বধর্মসভায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্মের বিজয় পতাকা উড্ডীন করেছেন। ভারতের ধর্মচেতনায় যে বিশ্বজনীনতা, প্রেম নিহিত আছে আর তার দ্বারা জগৎ জয় করা যায় তা স্বামীজীই দেখিয়েছেন গুরুর কৃপায়।

এবার ভক্তিবিনোদের কাছে এই সংবাদও তাঁর হৃদয়ে আশার আলো আনে। এই সাফল্যের মধ্যেই ভক্তিবিনোদও ভাবেন তাঁর স্বপ্ন একদিন সত্য হবেই। মহাপ্রভুর নির্দেশ ব্যর্থ হবে না।

জন্মাষ্টমীর দিন।

কলকাতার আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বৃষ্টির ধারা নামে। এমনি এক দুর্যোগের রাত্রেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে উদ্ধার করতে।

ভক্তিবিনোদ এই শুভলগ্নে প্রার্থনা জানান সেই শ্রীকৃষ্ণের চরণে—তাঁর নাম প্রচারিত হোক দেশে-দেশান্তরে। ভক্তিবিনোদ তা পারেন নি, সেই কাজের জন্য নিশ্চয়ই শ্রীকৃষ্ণই কাউকে পাঠাবেন।

ভক্তিবিনোদ এর মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গলীলা স্মরণ স্তোত্রম্ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে মোট ১০৪টি সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যভাগবত এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যদেবকে তাঁর দর্শনকে যেভাবে বর্ণিত করা হয়েছে সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করেন আর এই গ্রন্থটি সর্বভারতে বহুল প্রচারের জন্য সংস্কৃত অক্ষরে ছাপা হয়েছিল এবং এর মুখবন্ধে ভক্তিবিনোদকৃত ইংরাজীতে চৈতন্যদেবের জীবনী-ধর্ম-দর্শনকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

ভক্তিবিনোদের বহু রচনার ভিড়ে এটি হারিয়ে যায় নি। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে প্রভূত সমাদর লাভ করে এবং এই ইংরাজী নিবন্ধটি থাকার জন্য বিদেশী পাঠকের কাছেও শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসঙ্গে অনেক কিছুই গোচরে আসে। বিদেশী পাঠকরা এই গ্রন্থে এক নতুন ধর্মচেতনার সঙ্গে নিবিড়ভাবে পরিচিত হন।

এর আগে 'কৃষ্ণসংহিতা' রচনা করে বিদেশের অনেক চিন্তাবিদকে পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু ভাষার ব্যবধান থাকায় অনেকেই তা পড়তে পারেন নি। এবার আর তা হয় না। বিদেশের বহু পণ্ডিত-মনীষীদের কাছে এই গ্রন্থ এবার পঠিত হয়। তাঁরা সাদরে এই গ্রন্থকে গ্রহণ করেন, পড়েন।

এদেশের বহু বিদেশীও ভক্তিবিনোদের এই গ্রন্থ পড়ে মুগ্ধ হন। তাঁর কাছে অনেকেই জানান সেই কথা।

ভক্তিবিনোদের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জাগে যে এই ধর্ম বিদেশেও প্রচারিত হবে। এ যেন তাঁর জীবনদেবতারই নির্দেশ শোনেন তিনি। এই সময় তিনি লিখেছিলেন—

"A personality will soon appear to preach the teachings of Lord Chaityana to the fullest extent."

তাঁর এই বিশ্বাস হয়েছিল যে এই ভারতে—বহির্ভারতে, বিশ্বের সর্বত্র কৃষ্ণনাম প্রচারের

জন্য নিশ্চয়ই কাউকে নির্বাচিত করে পাঠাবেন সেই দেবতা।

আরও বিচিত্র লাগে ভাবতে যে এই বৎসরই—এই কলকাতার বুকেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন প্রভুপাদ এ-সি-বেদান্ত স্বামী জন্মাষ্টমীর দিন। আর ভক্তিবিনোদের যোগ্য সন্তান বিমলপ্রসাদ পরবর্তীকালে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীও তাঁর সাধনপথে এগিয়ে চলেছেন।

তাঁর পিতা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তার জীবনে এই বহির্বিশ্বে প্রচারের স্বপ্নই দেখেছিলেন। পিতার সেই অসমাপ্ত মহৎ কার্যকে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ভোলেন নি। তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তরুণ অভয়চরণ। তখন থেকেই ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী তাঁকে অনুপ্রেরণা-উৎসাহ যোগান। পরবর্তীকালে অভয়চরণ বিদেশে সেই কৃষ্ণভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করেন বহু দেশে নগরে বহু বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মনে। তাঁরা সব বিভেদ ভুলে কৃষ্ণভাবনাস্রোতে ভাবিত হন। কৃষ্ণনাম ধ্বনিত হতে থাকে তাঁদের কণ্ঠে। মৃদঙ্গ-করতাল নিয়ে তাঁরা দেশে দেশে সেই নাম গেয়ে চলেছেন।

মহাপ্রভুর সেই নির্দেশ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। যার সূচনা করেছিলেন ভক্তিবিনোদ—তাঁর সন্তান-শিষ্যদের মধ্য দিয়ে শ্রীচৈতন্যদেব সেই কাজই করিয়ে নিয়েছেন।

ভক্তিবিনোদ তাঁর 'Teachings of Lord Chaityana' গ্রন্থে চৈতন্যদেবের শিক্ষার কয়েকটি মূল সূত্রকে তুলে ধরেন।

1. Hari (the Almighty) is one without a second.
2. He is always vested with infinite Power.
3. He is (the) Ocean of Rasa.
4. The soul is His Vibhinnagstha or Separated Part.
5. Certain Souls are engrossed by Prakriti or His illusory energy.
6. Certain Souls are released from the grasp of Prakriti.
7. All spiritual and material phenomena are 'Vedaved' Prakash of Hari, the Almighty.
8. Bhakti is the only means of attaining the final object of spiritual existence.
9. 'Prem' in Krishna is alone the final object of spiritual existence.

এই তত্ত্বগুলিকে ভক্তিবিনোদ পাশ্চাত্ত্য দর্শন বাইবেল প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় শাস্ত্রমতে ব্যাখ্যা করেন—যা পাশ্চাত্যের কাছে এক নবচেতনার উন্মেষ আনে।

তিনি বলেন—"A servant of Chaitanya, it was our duty to propagate his supreme teaching and in doing a duty we are entitled to pardon for any trouble we have given you. In conclusion, we beg to say that we should be glad to reply to any question which our breathren would like to address us on these important subject. We feel great interest in trying to help our friends to seek in the way to spiritual love."

এই গ্রন্থটি দেশ-বিদেশেও সমাদৃত হয়েছিল। ইতিপূর্বে ভক্তিবিনোদ তাঁর 'Maths of Orissa' গ্রন্থের জন্য রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটি অব লণ্ডন কর্তৃক সম্মানিত হয়েছিলেন। এবারও তাঁর এই চৈতন্যদেবের উপর ইংরাজী গ্রন্থটির জন্য ভূয়সী প্রশংসা পান। তাঁদের পত্রিকায়ও এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তাঁরা স্বীকার করেন—

—The little volume will add to our knowledge, of this remarkable reformer and we express our thanks to Bhaktivinode for giving it to us in English and Sanskrit, rather in Bengali, in which language it must necessarily have

remained a closed book to European students of the religious life of India.

আরও একজন ইংরেজী পণ্ডিত এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে লেখেন—

"Five hundred years have passed away since the time Chaitanya spread a faith in saving grace of Krishna throughout the land. Nevertheless, down to the present day, the same spirit that inspired Chaitanya continues still to dwell among his followers.

... ...

The spirit that is to animate the new Church is to be founded on the principle that 'Spiritual Cultivation' is the main object of life. Do every thing that keeps it and abstain from doing anything which thwarts the cultivation of spirit. A devoted love of Krishna is to be the guiding light, as preached by Chaitanya. Have a strong faith that Krishna alone protects you and none else. Admit him as your only guardian. Do everything which you know 'Krishna' wishes you to do and never think that you do a thing independent of the holy wish of 'Krishna'.

... ...

Always remember that you are a Sojourner in the world and you must be prepared for your own home."

(A Literary History of India)

বিদেশীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ ভারতীয় ধর্ম দর্শন এবং চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে এমনি বিশদ আলোচনা শুরু হল। বিদেশীরাও এবার কৃষ্ণতত্ত্ব-চৈতন্যদেব প্রসঙ্গে কৌতূহলী হলেন। অনুভব করতে শুরু করেন ভারতীয় ধর্মের মূল সুর। তাঁরাও ভাবতে পারেন

—মন চল নিজ নিকেতনে
সংসার পথে বিদেশীর বেশে
ভ্রম কেন অকারণে॥

বহির্বিশ্বে কৃষ্ণভাবনার এই বীজ ভক্তিবিনোদ তাঁর জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে রোপণ করে গেলেন, তাঁর সুযোগ্য সন্তান ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী তাকে লালনপালন করেন—আর সেই বীজ মহীরূহে পরিণত হয় তাঁরই যোগ্য শিষ্য প্রভুপাদ এ-সি-ভক্তিবেদান্ত স্বামীর দুস্তর পরিশ্রম-আত্মত্যাগে। বৈষ্ণবধর্মকে ভগীরথের মত এই মৃত্তিকায় পুনঃআনয়ন করলেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুরই তাঁর লেখায়-প্রচারে-নামগানে।

দেশবিদেশের স্বীকৃতিতেও তৃপ্ত নন আদৌ, আগ্রহী নন ভক্তিবিনোদ। তিনি জানেন এসবই চৈতন্যদেবেরই ইচ্ছায় ঘটছে। তিনি উপলক্ষ মাত্র।

প্রচারের কাজও সমানে চলেছে।

এবার গেলেন উত্তরবঙ্গে। সেখানের পাহাড় অঞ্চল কার্সিয়াং-দার্জিলিং-এও গেলেন প্রচারে। দলেদলে সেখানের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নামকীর্তনে যোগ দেন।

সেখান থেকে এলেন আবার মেদিনীপুরে—অতীতের সেই মেদিনীপুর এখন বদলে গেছে। আজ সেখানের আবালবৃদ্ধবণিতা সাদরে তাঁকে বরণ করে নেন। মেদিনীপুরে ধর্মসভা-নামকীর্তন অব্যাহত থাকে। সেখানের মানুষ আজ শ্রীকৃষ্ণনামে বিভোর হয়।

সেখান থেকে এলেন বীরভূম অঞ্চলে। নিত্যানন্দ প্রভুর জন্মভূমি এই বীরভূম। বৈষ্ণব ধর্ম এখানে শাক্তসাধনার প্রভাবে লুপ্তপ্রায় হয়েছিল, আবার ভক্তিবিনোদ এখানের মানুষের মনে

কৃষ্ণচেতনাকে ফিরিয়ে আনেন। চৈতন্যদেবের নাম প্রচারিত হয় দিকদিগন্তরে।

দূর পল্লীপ্রান্তে চৈতন্যদেবের পদধূলিপূতঃ ভাগুিরবন ময়নাডাল প্রভৃতি অঞ্চলে বৈষ্ণবধর্মের ক্ষীণধারা প্রবাহিত হয়েছিল কালের নিষ্ঠুর ধ্বংসলীলার হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে। সেই ক্ষীণ ধারাকে আবার সঞ্জীবিত করে তোলেন।

এর অবকাশে লেখা এবং প্রকাশনার কাজও চলেছে। বিমলভূষণ এখন বাবার যোগ্য শিষ্য। তিনিও বাবার এই কার্যে যোগ দিয়েছেন।

প্রকাশিত হয় ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম খণ্ড। এতে শ্রীজীব গোস্বামীর সংস্কৃত ভাষ্যের সঙ্গে ভক্তিবিনোদকৃত বাংলা অনুবাদ ব্যাখ্যাসহ প্রকাশিত হল এই মূল্যবান গ্রন্থটিতে।

অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক প্রখ্যাত সাংবাদিক পরম বৈষ্ণব শিশিরকুমার ঘোষ ভক্তিবিনোদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। তিনিও নিজে পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণব সাহিত্যেও সুপণ্ডিত। তিনি দেখেছিলেন ভক্তিবিনোদ কিভাবে সেদিনের অবহেলিত বৈষ্ণবধর্মকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শিশিরবাবু বলেন, "আপনার নূতন গ্রন্থ পাইলাম। ভক্তগণ ক্লেশ করিয়া আহরণ করেন, আর আমরা দীনহীন তাহার দ্বারা জীবন রক্ষা করি। আপনাকে অনেকে ভক্তিবিনোদ আখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু আমি আপনাকে সপ্তম গোস্বামী ভাবি। মহাপ্রভুর প্রকট সময়ে ছয় গোস্বামী ছিলেন। অপ্রকট সময়ে আপনি সপ্তম গোস্বামী। আপনি ধন্য এবং আপনার কৃপা পাইলে আমি ধন্য হইব। আপনি প্রভু প্রেরিত, এই শুষ্ককালে আপনি সনাতন ধর্ম সজীব করিতেছেন।"

শিশির কুমার ঘোষের এই স্বীকৃতি তাঁকে সমাজে পরবর্তীকালে বিশিষ্ট মহলে সপ্তম গোস্বামী নামেই অভিহিত করেছিল।

কিন্তু ভক্তিবিনোদ তখনও লেখা ও গ্রন্থ প্রকাশের কাজ সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন। কখনও কলকাতা কখনও গোদ্রুমদ্বীপ অর্থাৎ স্বরূপগঞ্জে তার 'সুরভিকুঞ্জে' গিয়ে বাস করেন প্রচারাদির ফাঁকে ফাঁকে।

আর একটা দায়িত্বও নিতে হয়েছে ভক্তিবিনোদকে। শিশির কুমার ঘোষ আর একটি পাক্ষিক পত্রিকা প্রকাশনার কাজ শুরু করেন—স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ও অমৃতবাজার পত্রিকা-এর সম্পাদনার দায়িত্ব দিলেন ভক্তিবিনোদকে। তাঁর কাছে মনে হয়েছিল এই কাজে ভক্তিবিনোদই একমাত্র যোগ্যতম ব্যক্তি।

সেই পত্রিকার কার্য ছাড়াও নিজের পত্রিকা সজ্জনতোষিণীর কাজ, লেখাও রয়েছে। তবু তাঁর লেখনীর বিরাম নেই।

এই সময় প্রকাশিত হল শ্রী লীলাসুখ বিল্বমঙ্গল ঠাকুর রচিত বহু প্রাচীন গ্রন্থ 'শ্রীকৃষ্ণ করুণামৃত', এর সঙ্গে ভক্তিবিনোদ বালবোধিনী টীকাও প্রকাশ করেন। প্রকাশিত করেন শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত 'উপনিষদামৃত', মাধবাচার্যের টীকা সম্বলিত শ্রীমৎভাগবৎগীতা। সনাতন গোস্বামী রচিত 'বৃহৎ ভাগবতামৃতম্'। এর সঙ্গে তাঁর রচিত বাংলা ভাষ্যও সংযোজিত হয়। এইসময় তাঁর আর একটি জনপ্রিয় গ্রন্থ রচিত এবং প্রকাশিত হয়। সেটি নবদ্বীপ-ভাব-তরঙ্গম্। ১৬৮টি শ্লোকের মাধ্যমে নবদ্বীপ-তত্ত্ব এবং ভাবকে প্রকাশিত করেন।

কবি কর্ণপুর অতীতের প্রখ্যাত বৈষ্ণব কবি এবং নাট্যকার। তাঁর কিছু রচনারও পুনর্মুদ্রণ করে পাঠক সমাজের সামনে অতীতের এক মহাকবিকেও পরিচিত করান এযুগের পাঠক সমাজে।

শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া ও অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদনা বেশ কয়েক বৎসর ধরেই করেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। পরবর্তীকালে তাঁর এই পত্রিকার মূল সুর থেকে সরে যেতে থাকে, সেটা

ভক্তিবিনোদের ঠিক মনঃপূত হয় না।

তিনি তখন ওই পত্রিকার সম্পাদনা থেকে সরে আসেন। অবশ্য তখন ওই পত্রিকা আর পাক্ষিক নেই। মাসিক হয়েই প্রকাশিত হতো। পরে তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব থেকে মুক্তি নেন।

মন টানে পুরীর দিকে। পুরীর একটা দুর্নিবার আকর্ষণ আছে। বহু স্মৃতিবিজড়িত শ্রীধামপুরী। এবার আর তাঁর ঘাড়ে সেই সরকারী কাজের গুরুদায়িত্ব নেই, তাই পুরীতে সাধন ভজন আর গ্রন্থরচনার কাজ নিয়েই থাকবেন নিভৃতে।

এখন তাঁর ছেলে বিমলপ্রসাদকেও নিজের মনোমত করে গড়ে তুলতে চান। তিনি জানেন যে কাজের ভার তিনি নিয়েছেন তা বিশাল, নিজের জীবনে একক পরিশ্রমে সেই কাজ শেষ করা সম্ভব হবে না। তাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন অন্তত তার একজন সন্তানও এই কৃষ্ণতত্ত্ব প্রচারে ব্রতী হোক, তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার নিক। বিমলপ্রসাদ যেন চৈতন্যদেবের কৃপায় সেই আশা পূর্ণ করতে পারবে বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

এই প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে শ্রীল প্রভুপাদ এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী তাঁর গ্রন্থেই লিখেছেন—

In the same order as Kardama Muni, about one hundred years ago, Thakura Bhaktivinoda also wanted to beget a child who could preach the philosophy and teachings of Lord Chaitanya to the fullest extent. By his prayers to the Lord he had as his child Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja, who at the present moment is preaching the philosophy of Lord Chaitanya throughout the entire world through his disciples.''

এই সময় বিমলপ্রসাদ (পরবর্তীকালে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ) তখন পুরীতে গৌরকিশোর দাস বাবাজীর আশ্রমে নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীর ব্রত পালন করে চলেছেন, সাধনভজনও চলেছে যথারীতি। তিনি থাকেন গন্ধর্বিকা গিরিধারী মঠে। এটি ছিল হরিদাস সমাধি মন্দিরের কাছেই।

ভক্তিবিনোদও আবার পুরীতে এলেন। এবার তিনি মুক্তপুরুষ। সরকারী বাংলো-পাহারা-ভিড়-আদালতের কাজ এসব নেই।

তিনিও সমুদ্রের কাছাকাছি ওই অঞ্চলেই একটি ভজন কুটির করে সেখানের নামকরণ করেন ভক্তিকুটির, সেখানে থাকেন নিজের লেখার কাজ আর সাধনভজন নিয়ে।

এই সময় কৃষ্ণদাস বাবাজী নামে এক বৈষ্ণব ভক্তিবিনোদের প্রতি পরম শ্রদ্ধাবান হয়ে তাঁর আশ্রয়ে আসে। ভক্তিবিনোদও এই নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব সজ্জনকে সঙ্গে রাখেন। কৃষ্ণদাস ভক্তিবিনোদের কাজে যথাসাধ্য সহযোগিতা করেন। তার দেখাশোনাও করেন সেবকের মত। নিজের সাধনভজনও চলে।

ভক্তিবিনোদ এখন প্রায় একাই। ওখানে হরিদাস সমাধি মন্দিরে যান—বহুক্ষণ কেটে যায় সেখানে ধ্যান জপ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে।

ইতিমধ্যে পুরীতে সাধনভজনের কাজ প্রায় শেষ হয়েছে বিমলপ্রসাদের। বাবার নির্দেশে তিনি মায়াপুর এলেন, এখানেই তাঁর কর্মযজ্ঞ শুরু হল নতুন করে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের আদর্শ এবং কর্মপন্থাকে আরও বিস্তৃতভাবে রূপায়িত করার জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব মঠকে আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার কাজ শুরু করলেন।

ভক্তিবিনোদ পুরীতেই রয়েছেন। কিন্তু ভক্তজন আসেন তাঁর কাছে। ধর্মালোচনা হয়—কিছু উপদেশও দেন তাঁদের ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। আর কিছু ভণ্ডও আসে, ভক্তিবিনোদকে নানা বিরক্তিকর প্রশ্ন করার চেষ্টা করে কিন্তু কৃষ্ণদাস বাবাজীই তাদের হটিয়ে দেন।

পুরীতে কিছুদিন কাটিয়ে এবার কলকাতা হয়ে মায়াপুরের সন্নিকট ওই স্বরূপগঞ্জের ছায়াস্নিগ্ধ

সুরভিকুঞ্জে ফিরে এলেন ঠাকুর। কৃষ্ণদাস বাবাজীও পুরীতে আর থাকেন না। ঠাকুরের তিনি তখন অনুরক্ত ভক্ত। তিনিও চলে আসেন পুরীধাম থেকে ঠাকুরের সঙ্গে এই সুরভিকুঞ্জে।

এই সময় প্রকাশিত হল 'শ্রীহরিনাম চিন্তামণি'। এই গ্রন্থে তিনি হরিদাস ঠাকুর-এর নামপ্রসঙ্গে শিক্ষা এবং আলোচনার বিশদ ব্যাখ্যা করেন। এই আলোচনা করেন ভক্তিবিনোদ বিভিন্ন প্রচলিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থরাজি থেকে উদ্ধৃতিসহ।

এরপরই প্রকাশ পেল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আর একটি স্মরণীয় রচনা 'শ্রীমদ্‌ভাগবতার্ক মরীচিমালা'।

এই সারগর্ভ গ্রন্থ রচনার মূল অনুপ্রেরণা প্রসঙ্গে তিনি পরবর্তীকালে উল্লেখ করেন যে একসময় শ্রীমৎভাগবৎ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করছেন এমন সময় যেন দৃষ্টিতে জেগে ওঠেন শ্রীস্বরূপ দামোদর—চৈতন্যদেবের প্রিয়জন। তিনিই আমাকে শ্রীমৎভাগবৎ-এর একটি শ্লোকের অপূর্ব ব্যাখ্যা করেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে আর নির্দেশ দেন সম্বন্ধ-অভিধেয় প্রয়োজন এরই পরিপ্রেক্ষিতে ভাগবত-এর ব্যাখ্যা করে সহজভাবে গ্রন্থ রচনা করার জন্য।

সারা দেহমনে কি শিহরণ জাগে। নতুন সেই অনুপ্রেরণা আর নির্দেশে রচিত হল তাঁর ওই গ্রন্থ।

এতে শ্রীমৎভাগবতকে তিনি সূর্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন—যার কিরণ জগৎকে রক্ষা করে, সকল অন্ধকার বিদূরিত করে। আর এর এক একটি অধ্যায় এক একটি কিরণমালা।

এই গ্রন্থ আজও সমাদৃত এবং শ্রীমৎভাগবতকে অনুধাবন করার একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ বলেই পরিগণিত হয়।

লেখার কাজ প্রচার-এর কাজও চলেছে। এবার মনে হয় চাকরির বন্ধন গেছে—সংসারেও এতদিন থেকেছেন, সকলের প্রতি সব কর্তব্যই পালন করেছেন যথাযথ।

তবে আর কেন এই সংসারবন্ধন? এবার সন্ন্যাসই নেবেন। সব বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবেন—নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করবেন শ্রীহরির পাদপদ্মে সন্ন্যাস নিয়ে।

তাঁর দীর্ঘজীবনের সেই দিনগুলো মনে পড়ে। উলার শান্ত পরিবেশে প্রাচুর্যের মাঝে মানুষ হয়েছিলেন। দেখেছেন দাদুর বৈভব।

সমাজের বুকে তান্ত্রিক-নেড়ানেড়িদের প্রতিষ্ঠা। শাক্তদের প্রাধান্য। তার মাঝে মনে পড়ে জগাদার কথা। একক সে হরিনাম করতো। মনে পড়ে শীতল তেওয়ারির রামনামগান।

ক্রমশ মৃত্যুর কালো ছায়া নেমে এলো। তাঁর ভাইরা কালিদা, হরি চলে গেল একে একে। চলে গেলেন তাঁর বাবা আনন্দমোহন, অতি প্রিয়জন জীবনের অনুপ্রেরণা কুমারমামা।

চলে গেলেন সেই সম্রাটের মত দাদু—সব বৈভব হারিয়ে গেল। হারিয়ে গেল কত প্রিয়জন, কলকাতার কথা, সময় যেন জলস্রোতের মতই বয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড়দাদা দ্বিজেন ঠাকুর—তাঁকেও পরবর্তীকালে তাঁর হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গে মন্তব্যের জন্য কঠোরভাবে সমালোচনা করেছিলেন, তারাও নেই।

জীবনের ধারা সেদিন প্রবাহিত হয়েছিল এক খাতে। তখন কবিতা লিখছেন, প্রাবন্ধিক হবার চেষ্টা করছেন পশ্চিমী শিক্ষা দর্শনের জগতের বাসিন্দা।

সেই জগৎ থেকে এলেন ভক্তিমার্গে জীবনদেবতার নির্দেশেই। কেটে গেছে বহুদিন।

সেই কেদারনাথ এখন অন্যমানুষ। ঈশ্বরচিন্তাই তাঁর মনে এখন রণিত হয়। জীবন এখানে আজ তাঁকে এনেছে এক নবরূপে।

এবার সব বাঁধন খসে পড়ার পালা। তাই মনস্থ করেন এবার সন্ন্যাস দীক্ষাই নেবেন। কিন্তু

কে দীক্ষা দেবেন তাঁকে? কে হবেন তার বেশগুরু?

নবদ্বীপ ধামে তখন পরম বৈষ্ণব গৌরকিশোর দাস বাবাজী রয়েছেন। প্রকৃত সৎ বৈষ্ণব। মাঝে মাঝে তিনি নৌকায় গঙ্গাপার হয়ে স্বরূপগঞ্জে ভক্তিবিনোদের সুরভিকুঞ্জেও আসেন।

সেদিন ভক্তিবিনোদ তাঁকেই কাতরভাবে অনুরোধ জানান—আপনি আমাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিন।

গৌরদাস বাবাজী চমকে ওঠেন। তিনি জানেন ভক্তিবিনোদের পাণ্ডিত্য, তাঁর সাধনভজন আর বৈষ্ণব সমাজের প্রতি তার নিষ্ঠা-কর্তব্যের কথা। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমে আজ বৈষ্ণব ধর্ম সমাজের উচ্চ কোটিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্বমহিমায়। তিনি দেবআশীর্বাদধন্য।

এমন শক্তিমান প্রবাদপুরুষকে দীক্ষা দেবার মত সামর্থ্য তাঁর নেই। তাই সেদিন কোন উত্তর না দিয়েই বাবাজী ফিরে আসেন।

এদিকে কেদারনাথও ছাড়বেন না। তাঁর উত্তর চাই। তিনিও পিছু নিলেন কিন্তু আর দেখা পান না।

ভক্তিবিনোদও ঐকান্তিক ভাবে এবার দীক্ষা নেবার জন্য প্রস্তুত। আর গৌরদাস বাবাজীর কাছেই দীক্ষা নেবেন। তাই সেই কথা জানাতে তিনি নিজে এবার নবদ্বীপে যাবার মনস্থ করেন। গৌরদাস বাবাজীর আশ্রমে গিয়ে তিনিই কথাটা পাড়বেন—তাঁকে রাজী করাতেই হবে। সেইজন্যই তিনি নবদ্বীপ ধামের দিকে যাত্রা করলেন গঙ্গা পার হয়ে।

আশ্রমে গৌরদাস বাবাজীও তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে পারেন ভক্তিবিনোদ আসছেন তাঁর কাছে ওই সন্ন্যাসের দীক্ষার প্রস্তাব নিয়ে। বাবাজী অসময়ে আশ্রম ছেড়ে এদিকওদিকে ঘুরতে ঘুরতে একটা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধান করেন যেখানে ভক্তিবিনোদ নিশ্চয়ই তাঁকে খুঁজতে আসবেন না। কারণ বাবাজীর যাতায়াতের সব স্থানই ভক্তিবিনোদও জানেন।

তাই বাবাজী সোজা গিয়ে বেশ্যাপল্লীর একটা বাড়ির রকে গিয়ে বসলেন।

ওদিকে ভক্তিবিনোদ আশ্রমে এসে বাবাজীকে না পেয়ে তাঁর অন্য জায়গাগুলোতেও খোঁজ করে তাঁকে পান না। বাবাজী তো তখন সেই নিষিদ্ধ পল্লীর বারান্দায় সমাসীন। ভক্তিবিনোদ ভাবেন বোধহয় তিনি এখনও অযোগ্যই রয়েছেন তাই সন্ন্যাস দেওয়া বোধহয় হবে না।

হতাশ হয়ে তিনি ফিরে যান স্বরূপগঞ্জে তার সুখদা কুঞ্জে।

এদিকে গৌরদাস বাবাজী কিছুক্ষণ পর সেই নিষিদ্ধ পল্লী থেকে বের হয়ে রাধারমণ কুঞ্জে এসে প্রাণখোলা হাসিতে ভেঙে পড়েন। একজন ভক্ত গৌরদাস বাবাজীকে এই ভাবে শিশুর মত উল্লাসে হাসতে দেখে শুধোয়,—হাসছেন কেন বাবাজী মহারাজ?

বাবাজী সহজ ভাবেই বলেন,—আজ তোমাদের কেদারবাবুকে খুব জোর ঠকিয়েছি হে। উনি আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন—আমিও ওই মায়ের পাড়ায় গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম। খুঁজুক না কত খুঁজবে।

ব্যাপারটা ওভাবে হালকা করার চেষ্টা করেও গৌরদাস বাবাজী এড়িয়ে যেতে পারেন না। তাঁরও মনে হয় ভক্তিবিনোদ সন্ন্যাস নেবার যোগ্য পাত্র।

আজ বৈষ্ণবাচার্য জগন্নাস দাস বাবাজী নেই। তিনি কয়েক বৎসর হল দেহ রেখেছেন। তিনি থাকলে ভক্তিবিনোদ তাঁর কাছেই সন্ন্যাস দীক্ষা চাইতেন। আজ তাঁর অবর্তমানে তিনি গৌরদাস বাবাজীর কাছে এসেছেন। এসময় তাঁরও কর্তব্য কিছু আছে। ভাবছেন বাবাজী।

ক'দিন পর আবার ভক্তিবিনোদ তাঁর ছেলেকে পাঠান নবদ্বীপ ধামে বাবাজীর কাছে। এবার

গৌরদাস বাবাজী আর অমত করেন না। তিনি গেলেন সুখদা কুঞ্জে।

অতীতে সনাতন গোস্বামীও সংসার ত্যাগ করে চৈতন্যদেবের অনুমতি নিয়ে তাঁর সামনেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন বৈষ্ণবপ্রধান তপন মিশ্রের ব্যবহৃত বহির্বাস পরে। সংসারী সনাতন গোস্বামী সংসারবিরক্ত সন্ন্যাসী হয়ে গৌরাঙ্গদেবের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কয়েক শতাব্দী পর আবার যেন তেমনি একটি দৃশ্যেরই অবতারণা হল সুখদা কুঞ্জে।

সংসারী ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবার বেশগুরু গৌরদাস বাবাজীর কাছ থেকে সন্ন্যাস বেশ নিলেন। মুণ্ডিত মস্তক—পরণে তাঁর বৈষ্ণবাচার্য জগন্নাথদাস বাবাজীর ব্যবহৃত বহির্বাস। আজ সংসারপরিক্রমা ছেড়ে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করলেন শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীচরণে।

কয়েক বৎসর জপধ্যান সমাধিতে কাটিয়ে তিনি মহাসমাধি লাভ করেন ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন কলকাতায় তাঁর বাড়ি ভক্তিভবনে। ওই পুণ্যতিথিতে পরম বৈষ্ণব শ্রীগৌরাঙ্গ-পার্ষদ গদাধর পণ্ডিত প্রায় সাড়ে চারশো বৎসর আগে দেহত্যাগ করেন।

পরম বৈষ্ণব ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও ওই তিথিতে মহাপ্রয়াণ করেন। গঙ্গাতীরে শেষকৃত্য সমাপণ করা হলো।

তাঁর দেহাবশেষ পরে নিয়ে আসা হয় তাঁর প্রিয় মায়াপুরের সন্নিকট গোদ্রুমদ্বীপের সুখদা কুঞ্জে। সেখানে চিতাভস্মের রৌপ্যকলস সমাধিস্থ করা হল নামকীর্তনের মধ্যে।

দীর্ঘ কর্মময় জীবনপথে ভক্তিমার্গের এক পথিক আজ পথপ্রান্তে তাঁর পরম প্রিয়ের শ্রীচরণে এসে যেন অক্ষয় শান্তির স্পর্শ পেয়েছেন। তাঁর কথায় বলা যেতে পারে—

There rests my soul from matter free
Upon my Lover's arms.
Eternal peace and Spirit's love
Are all my Chaitinaya Charms.

কিন্তু তাঁর আরব্ধ কাজ-এর অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন যোগ্য সন্তানকে। সেই দীপশিখা যা তিনি প্রজ্বলিত করেছিলেন—সেই শিখা প্রদীপ্ত করেছিল তাঁর পুত্র বিমলপ্রসাদকে—তিনিই তাঁর যোগ্য শিষ্যের অন্তরেও সেই শিখাকে প্রদীপ্ত করেছিলেন। সেই প্রদীপ্ত শিখা আজ শ্রীচৈতন্যদেবের চেতনার আলোয় বর্তিকা জ্বেলেছে বিশ্বের দেশেদেশান্তরে—যার সূচনা করেছিলেন শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুর।